মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

প্রথম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বেলাল

মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

[প্রথম খন্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশকে নিয়ে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে দেশী-বিদেশী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। বাংলাদেশকে হাজার বছর পিছনে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। দেশী ষড়যন্ত্র-কারীদের নামের তালিকা হাতে পড়ল এক সাংবাদিকের, কাবুলে সস্ত্রীক গ্রেফতার হলো সে। তাকে উদ্ধার করতে বারো সদস্যের কমান্ডো মিশন নিয়ে ছুটে গেল মাসুদ রানা। উদ্ধার করলও, কিন্তু তারপরই ফেঁসে গেল। থান্ডারবোল্ট মিশনকে পিক-আপ করতে না পেরে পালিয়ে এল প্লেন। গোটা আফগানিস্তান জুড়ে ওদের তাড়া করে বেড়াতে লাগলো কর্নেল নাজাফ মুরাদ।

পালাবার পথ নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

বেলাল

মাসুদ রানা ২৮৬

শকুনের ছায়া

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

BUY 29 6 01
ISBN 984 16 7286-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-286
SHOKUNER CHHAYA
[Part I]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

উনত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা। সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরু *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র।

এক

কাবুল, আফগানিস্তান।

'ডন! কি হলো, কিসের শব্দ?' গভীর ঘুমজড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল যুথি। পাশ ফিরে টেনে চোখ মেলল ডন উঠে বসেছে টের পেয়ে। 'কি...?'

'কেউ নক্ করছে দরজায়,' ফিসফিস করে বলল ডন। পা স্লিপারে গলিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি শুয়ে থাকো, আমি দেখছি।'

যতই আস্তে বলুক, গভীর রাতে প্রায় অন্ধকার হোটেলরুমে বেশ জোরে শোনাল ওর কথার আওয়াজ। 'এত রাতে!' চট্ করে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটি। 'রাত তিনটে বাজে! এখন কে...' থেমে গেল, সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল মনের মধ্যে। চট্ করে হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাত টেনে ধরল। 'যেয়ো না!'

এটা ঢাকা নয়, ওদের বাড়ি নয়, কথাটা খেয়াল হওয়ামাত্র আতঙ্কিত হয়ে উঠল যুথি। এটা কাবুল, আফগান রাজধানী। বড় অস্থির, বড় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এখন এখানে। তালেবান নামে গোঁড়া এক ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ক্ষমতায় জেঁকে বসেছে, ইসলামী বিপ্লবের নামে...আবার টোকার শব্দে কেঁপে উঠল মেয়েটি। কে? তালেবান বিপ্লবী কাউন্সিলের ওরা নয় তো?

ঘুমের রেশ উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই। উঠে বসল সে,

তাড়াতাড়ি ম্যাক্সি পরে নিল। 'ডন, যেয়ো না। নিশ্চয়ই তালেবান...'

'না। ওরা হলে এত আস্তে টোকা দিত না।' বেডরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল সে, 'অন্য কেউ হবে। ঘাবড়িয়ো না, আমি দেখছি।' খুদে ড্রইংরুমের আলো জ্বেলে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, 'কে?'

'মিস্টার ডন! দরজাটা খুলুন,' তেমনি চাপা জবাব এল।

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর খুলে দিল দরজা। মন বলছে লোকটা যেই হোক, ভয়ের কিছু নেই। আচমকা দরজা খুলে যেতে উল্টে আগন্তুকই ঘাবড়ে গেল, প্রায় লাফিয়ে উঠল ছোটখাট, বয়স্ক মানুষটা। আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তার পুরু কাঁচের চশমা। হাতে একটা ছোট পোর্টফোলিও আছে তার।

অপ্রস্তুত হয়ে বোকার হাসি হাসল সে। 'সরি, এতরাতে বিরক্ত করতে হলো,' হড়বড় করে বলল। 'কিন্তু ব্যাপারটা এত জরুরী যে না এসে পারলাম না।'

'কি ব্যাপার? কে আপনি?' তাকে চেনা চেনা লাগল ওর।

ঢোক গিলল লোকটা। 'প্লীজ, ভেতরে ঢুকতে দিন আমাকে, মিস্টার ডন! খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে এসেছি আমি আপনাকে দেয়ার জন্যে। নইলে এত রাতে নিশ্চই আপনাকে...'

'আপনাকে চেনা মনে হচ্ছে!'

সন্তুষ্টি ফুটল মানুষটার চেহারায়। মাথা দোলাল। 'তালেবান কমান্ড কাউন্সিলে দু'বার দেখা হয়েছে আমাদের। আমার নাম কারেমি। রাশিদ কারেমি। বিপ্লবী কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার।

অবাক না হয়ে পারল না ডন। 'আরে, তাই তো! আসুন, কি ব্যাপার?' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। কারেমি ঢুকতে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। 'বসুন।'

'ডিসটার্ব করতে হলো বলে সত্যি দুঃখিত, মিস্টার ডন,' রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বলল আগন্তুক। 'আসলে এ ছাড়া...' পিছনে মৃদু পায়ের আওয়াজ উঠতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মাঝারি উচ্চতার বব ছাঁট্ সুন্দরীকে দেখে চেহারা বিব্রত হয়ে উঠল। 'ইয়ে...মানে...'

'ও যুথি। আমার স্ত্রী,' বলল ডন। 'সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, বসুন। যুথি, ইনি মিস্টার...'

'আমি বলছি,' বাধা দিল লোকটা। 'আমি রাশিদ কারেমি, মিসেস ডন। তালেবান বিপ্লবী কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার। এতরাতে আপনাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে আমি খুব লজ্জিত। আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন।'

স্বামী-স্ত্রীর চোখাচোখি হলো। 'আপনি বসুন,' ডন বলল। 'আমার মত আমার স্ত্রীও সাংবাদিক। এ ধরনের ব্যাঘাতে আমরা একেবারে অনভ্যস্ত নই।'

'ধন্যবাদ, স্যার! অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ আপনাকে ধৈর্যের পুরস্কার দিন। আমি খুব অল্প সময় নেব।'

মুচকে হাসল ডন। পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমনই হোক, আফগানরা প্রত্যেক কথায় অন্তত একবার করে আল্লাহ্কে স্মরণ করবেই। এর আগেও কয়েকবার এ দেশে ঘুরে গেছে সে, তাই ভালই জানে এদের এই সমস্ত ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে। যত গরীবই হোক, কোন আগন্তুককে নিজের বাড়িতে অতিথি হিসেবে পেলে সাধারণ আফগানরা কতভাবে তার সেবা করা সম্ভব, তাই নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে। আজও সেই রীতি চলে এ দেশে, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি যতই হোক।

ইসলামের একটা নীতির ব্যাপারে এরা হিমালয়ের মত অটল, তা হলো অতিথি সৎকার। তার ওপর প্রতিবেশী ও মুসাফিরের

সমান অধিকার আছে, এই বিশ্বাস এদের অস্থিমজ্জাগত। গৃহস্থ গরীব হোক কি পয়সাওয়ালা, কোন তফাৎ নেই।

বাংলাদেশের ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ডন সিদ্দিক পেশার খাতিরে শেষবার এদেশ ঘুরে গেছে এক বছর আগে। এখানকার রাজনীতি নিয়ে তার এক ডকুমেন্টারি প্রচার করে সেবার বিবিসি। ওই অনুষ্ঠানের বদৌলতে বর্তমান সরকারী মহলের উঁচু পদের প্রায় সবাই যথেষ্ট খাতির করে ওকে। ডকুমেন্টারিটা ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাই। অন্য কোন সাংবাদিক তেমন পাত্তা পায় না ওখানে।

এবারও বিবিসির তরফ থেকে এসেছে ডন। সঙ্গে নিয়ে এসেছে সদ্য বিয়ে করা বউ যুথিকে। সেও সাংবাদিক, ঢাকার এক নামকরা দৈনিকের ফটোগ্রাফার।

'শুনলাম আপনারা সকালের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন,' বলে উঠল কারেমি। 'সত্যি নাকি?'

'কোথায় শুনলেন?'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল লোকটা। হাসল নার্ভাস ভঙ্গিতে। 'নেভার মাইন্ড। আমিও আজই দেশ ছাড়ছি বউ-মেয়ে নিয়ে। তাই এতরাতে আসতে হলো। ডকুমেন্টসগুলো আপনাকে দিয়েই...'

'কিসের ডকুমেন্টস? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। খুলে বলুন,' লোকটার মুখোমুখি বসল ডন। যুথিও বসল এসে ওর পাশে।

'বলছি, একটু গুছিয়ে নিতে দিন।' ঝুঁকে দু'হাতের ওপর মুখের ভর রেখে কার্পেট পরীক্ষায় মন দিল রাশিদ কারেমি। 'এ দেশে সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় আমি ছিলাম ফরেন সার্ভিসে। বিদেশের আধডজন এম্ব্যাসিতে কাজ করেছি। আপনাদের দেশেও

থেকেছি তিন বছর।' চুপ মেরে গেল লোকটা। আনমনা হয়ে পড়ল।

আবার চোখাচোখি হলো ডন-যুথির। আলোচনা কোনদিকে গড়াচ্ছে বুঝতে না পেরে অসহায় বোধ করছে। একটু পর আচমকা চোখ তুলল সে।

'আমরা, আফগানরা, এতই স্বাধীনচেতা যে আজ পর্যন্ত বাইরের কোন শক্তি আমাদের বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি। সে যত বড় শক্তিধরই হোক। চেঙ্গিস খান পারেনি, ইংরেজরা পারেনি, সোভিয়েতরাও পারেনি। বাইরের কেউ যা পারেনি, এখন আমরা নিজেরাই তাই করতে লেগেছি। নির্দ্বিধায় ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাচ্ছি আমরা, সাফ করে দিচ্ছি লোকালয়ের পর লোকালয়। ক্ষমতার চেয়ারে বসার জন্যে কী না করছি?

'আফগানিস্তানের ধন-সম্পদ বলতে কোনকালেই কিছু ছিল না, আজ তো মোটেও নেই। ভেড়া আর উট ছাড়া কিছুই নেই আমাদের।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কারেমি। 'যাক্‌গে, শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে নিশ্চয়ই এক বুড়োর দেশপ্রেমের ভাষণ শুনতে পছন্দ হবে না কারও।'

'বরং আসল প্রসঙ্গে এলে ভাল হয়,' ডন বলল। 'সাড়ে তিনটে বাজে। তৈরি হতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আমাকেও তো···। আপনার দেশের ওপর ভয়ঙ্কর এক বিপদ ঘনিয়ে আসছে, মিস্টার ডন। আমি আপনাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করতে এসেছি।'

'আমার দেশের ওপর!' অবিশ্বাস ফুটল সাংবাদিকের চেহারায়।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল আত্মগত কারেমি। 'তিন বছর থেকে এসেছি আমি ওই দেশে। ওরকম সবুজ শ্যামল দেশ আর কোথাও

আমার চোখে পড়েনি। এখানকার গোঁড়া, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর মত গোষ্ঠী আপনাদের ওখানেও আছে। সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপ্‌টি মেরে আছে ওরা। সুযোগ পেলেই...'

'খুলে বলুন, প্লীজ!'

যূথীর দিকে ফিরল লোকটা। 'গলা একদম শুকিয়ে গেছে। একটু পানি দেবেন দয়া করে?'

'নিশ্চয়ই!' চট্ করে উঠে পড়ল সে। পানি নয়, খুদে রেফ্রিজারেটর থেকে সবার জন্যে কোক ঢেলে নিয়ে এল। এক টানে অর্ধেক গ্লাস শেষ করে সুস্থির হলো লোকটা।

'শুকরিয়া! আল্লাহ্ আপনার হায়াত দরাজ করুন।' ডনের দিকে ফিরল সে। 'সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় এ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পড়েছিল, সে তো বোধহয় আমার থেকে আপনিই বেশি ভাল জানেন। বিপুল অস্ত্র। হাল্‌কা-ভারী। ওসব কোত্থেকে আসত তাও নিশ্চই জানেন আপনি। রুশরা ভেগে যাওয়ার পর ওসবের রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগারে জমা পড়ার কথা ছিল, কিন্তু আহমেদ শাহ্ মাসুদ আর গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের জন্যে তা হয়নি। বরং আরও নতুন নতুন চালান এসেছে অস্ত্রের। বর্তমানে আমাদের খেতে যত গম আছে, তারচেয়ে বেশি আছে বোধহয় অস্ত্র।

'যা হোক, এই অস্ত্রের বড় একটা অংশ পাচার হয়ে যাচ্ছে আপনাদের দেশে।'

খুব একটা অবাক হলো না ডন বা যূথী। দেশে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু অস্ত্র ঢোকে নানান পথে, ব্যাপারটা ওপেন সিক্রেট। তবে এ দেশ থেকেও যে যায়, সেটা অবশ্য এই প্রথম শুনল। 'কোন্ পথে যায়?' প্রশ্ন করল যূথী।

ডন যোগ করল, 'ক্রেতা কে বা কারা?'

'সাগরপথে টেকনাফ হয়ে যায়। ক্রেতা নেই, ফ্রী যায় সব।'

'মানে!' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'আমাদের তালেবান সরকার পাকিস্তান-বাংলাদেশসহ অন্য সমস্ত মুসলিম প্রধান দেশে আফগানিস্তান মার্কা বিপ্লব ঘটানোর এক সুদূর প্রসারী নীল-নকশা করেছে। এক সৌদী ধর্মান্ধ ধনকুবের টাকা জোগাচ্ছে এর পিছনে।'

'কি বলছেন এসব?'

পোর্ট ফোলিও থেকে পুরু একটা খাম বের করল কারেমি। 'ঠিকই বলছি আমি, মিস্টার ডন। এটার মধ্যে তার সমস্ত প্রমাণ আছে।'

সম্মোহিতের মত খামের দিকে তাকিয়ে থাকল স্বামী-স্ত্রী।

'আপনাদের দেশী এক ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর কাছে জমা হচ্ছে এসব অস্ত্র। সাংগঠনিক কাজ চালাবার জন্যে প্রচুর টাকাও দেয়া হচ্ছে তাদের। টাকা সৌদী ধনকুবেরের, যাচ্ছে আমাদের তালেবান প্রতিনিধিদের হাত ঘুরে।'

'ডকুমেন্টস কি করে জোগাড় করলেন?' ভুরু নাচিয়ে খামটা দেখাল ডন।

'ওহ্, আমি বিপ্লবী কাউন্সিলের সিনিয়র-মোস্ট অ্যাডভাইজার। এসব জোগাড় করা আমার জন্যে খুব কঠিন নয়। আপনার দেশে যারা এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত, খুব শিগগিরি তারা ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, ওরা ব্যর্থ হবে না। যাতে ব্যর্থ হতে না হয়, সে জন্যে আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছে।

'এই খামে বাংলাদেশী "তালেবানদের" নামের পুরো তালিকা আছে। ও দেশের ওপর আমার আলাদা এক টান আছে। আমি চাই না এদেশের মত ওখানেও রক্তের নদী বয়ে যাক্। এ দেশী তালেবানরা হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছে আফগানিস্তানকে।

ওরা সফল হলে ওখানেও তাই ঘটবে। ডকুমেন্টসগুলো ঢাকায় নিয়ে যান দয়া করে। ওদের ঠেকান যে করে হোক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ডন। 'আপনি কেন দেশ ছাড়ছেন?'

করুণ হাসি ফুটল কারেমির মুখে। 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।'

'পাপ?'

'নয়তো কি? তালেবানদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না। মানুষকে মানুষ মনে করে না এরা। মেয়েদের তো একেবারেই না। আমার স্ত্রী তুর্কী, কাবুল ভার্সিটির প্রফেসর। আজ তাকেও বোরখা পরে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয়। মেয়েটাকেও। এই পরিবেশে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না ওরা,' আপনমনে মাথা দোলাল সে।

'এ তো সবে শুরু। এরা যা করতে চাচ্ছে, তা সফল হলে একলাফে পাথর যুগে ফিরে যাবে আফগানরা। শহর ছেড়ে হিন্দুকুশের গুহায় গিয়ে থাকতে হবে তাদের। তার সাথে যোগ হয়েছে এই নতুন যন্ত্রণা,' খামটা দোলাল কারেমি।

'ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলছে, মিস্টার ডন। ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। যদি এদের নীল-নক্শা সফল হয়, এই অঞ্চলের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে পালাচ্ছি আমি সবাইকে জানাতে। আপনি এখানে আছেন জেনে এগুলো দিতে এলাম অন্তত বাংলাদেশের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হওয়া যাবে ভেবে। অনেক দিন থেকে লেগে ছিলাম এগুলো হাতাবার কাজে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে সফল হয়েছি শেষ পর্যন্ত।

'ভয় হচ্ছিল হয়তো ধরা পড়ে যাব। কিন্তু পড়িনি। কিছু টের পায়নি ওরা। স্ত্রীর দেশে বেড়াতে যাব বলে ভিসা চাইতেই দিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন, কোন প্রশ্ন করেনি।'

'বড় অসম্ভব এক কাজ করেছেন আপনি,' মন্তব্য করল ডন।

'আল্লাহ্ সাহায্য করলে এরচে' অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়, মিস্টার ডন। এ কাজ তাঁর ইচ্ছেতেই করেছি আমি, মানে, করতে পেরেছি।'

বুকে হাত বেঁধে হেলান দিয়ে বসল সাংবাদিক। চোখ খামের ওপর, কপাল কুঁচকে আছে। 'ডকুমেন্টগুলো জেনুইন?'

'হোয়াই, ইয়েস!' বিস্ময় ফুটল কারেমির চেহারায়। 'জেনুইন!'

'আপনি জানতেন আমরা আজ চলে যাচ্ছি?'

'সেই জন্যেই তো এলাম। তালেবানদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ রিপোর্টিং করে ওদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন আপনি, আমি জানি। প্লেনে খাম খুলে দেখবেন ভেতরে কি আছে, তাহলে বুঝবেন...' থেমে গেল লোকটা। ঘড়ি দেখল। 'এবার যেতে হয় আমাকে।'

কিছু বলল না ওরা। ডনের কপাল আগের মতই কুঁচকে আছে। যুথি টেবিল থেকে একটা দামী লেইকাফ্লেক্স ক্যামেরা তুলে নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছে। অনেকক্ষণ পর মাথা দোলাল সাংবাদিক। 'ঠিক আছে, মিস্টার কারেমি। ওগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমি। আর...ইয়ে, ধন্যবাদ।'

'আমি তো নিমিত্ত মাত্র, সমস্ত ধন্যবাদ-প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য,' আঙুল তুলে সিলিং দেখাল রাশিদ কারেমি। 'তিনি না চাইলে আমি সফল হতাম না।'

উঠে পড়ল সে। ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন। ফি আমানিল্লাহ্।'

হোটেলের উল্টোদিকে, বড় এক গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা খুদে ফিয়াট গাড়ি। ভেতরে চালক ছাড়া কেউ নেই।

নিজের আসনে স্থির বসে আছে লোকটা, দাড়ির মধ্যে আঙুল ভরে গাল চুলকাচ্ছে। নজর হোটেলের বন্ধ ডাবল ডোরের ওপর।

নীল স্যুট পরা খাটো লোকটাকে বের হতে দেখল সে। পাথরের চওড়া সাতটা ধাপ পেরিয়ে রাস্তায় এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল লোকটা, তারপর খুব দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে গাড়ি থেকে বের হলো চালক। দৃঢ় পায়ে এগোল হোটেলের এন্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে থাকা ফোন বুদের দিকে। স্লটে কয়েন ফেলে রিসিভার তুলল। ডায়াল করল 112 নাম্বারে।

ও প্রান্তের সাড়া পেতে পশতু ভাষায় দ্রুত বলল, 'কর্নেল নাজাফ মুরাদকে দাও, জলদি।'

কর্নেল মুরাদ তালেবান সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান। রুশরা চলে যাওয়ার পর যত সরকার এসেছে, তাদের বেলায়ও তাই ছিল সে। বুদ্ধিমান মানুষ, স্রোত যখন যেদিকে, সেদিকে ঘুরে যেতে ভারি পটু।

অল্প সময়ের মধ্যে সাড়া মিলল কর্নেলের। গলা একদম সতেজ, ঘুমের আভাসও নেই। 'কর্নেল মুরাদ!'

নিজের পরিচয় জানাল ওয়াচার। 'এইমাত্র হোটেল থেকে বেরিয়েছে সে, কর্নেল। বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছে।'

কর্নেলের কাটা কাটা নির্দেশ শুনল সে কিছুক্ষণ, তারপর সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। গলির মাথায় একটা চায়ের দোকান সবে খুলেছে। উত্তরে, গাঢ় নীল আকাশের গায়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালার আঁকাবাঁকা আউটলাইন ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু। নতুন দিনের সূচনা হতে যাচ্ছে আফগানিস্তানে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি ছোটাল সে। ফিয়াট দূরে সরে যেতে আরেক লোক এক সেকেন্ড হ্যান্ড জুতোর দোকানের পাশ থেকে বেরিয়ে এল। সেও দেখেছে রাশিদ কারেমিকে হোটেল থেকে বের হতে।

হাতে যে ফোলিওটা ছিল না, তাও নজর এড়ায়নি।

রাজপথের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে ডন ও যুথির হলুদ ট্যাক্সি। এঁকেবেঁকে, কড়া ব্রেক কষে, হর্ন বাজিয়ে এগোতে হচ্ছে। আগের মতই আছে আফগানরা, সাইড দেয় না কাউকে।

ডনের ভালই জানা আছে এদের এই স্বভাব। আগে কখনও ব্যাপারটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, কিন্তু আজ হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এয়ারপোর্ট পৌঁছতে চাইছে সে। অস্বস্তি লাগছে, বারবার নড়েচড়ে বসছে।

সামনে এক মার্সিডিজ পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ব্রেক কষল ওদের ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে কী সব বলতে লাগল। ওটার চালকের উদ্দেশে চোখা দেশী অস্ত্র ঝাড়ছে। কিন্তু সে নিরুপায়। কারণ তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে একপাল গাধা, কোনমতে ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা যেতেই আবার বাধা। জমজমাট বাজার বসেছে পথের ওপর। মলিন সালোয়ার-কুর্তা পরা চাষীরা দরদাম করছে ক্রেতার সাথে। চাদর মুড়ি দেয়া কয়েকজন বৃদ্ধা ভিক্ষুক ছাড়া আর কোন মেয়ে চোখে পড়ল না ওদের। অথচ আগে বেশিরভাগ কেনাকাটা মেয়েরাই করত।

হতচ্ছাড়া চেহারা সবার। পথের পাশের ঝুপড়ি খাবার দোকানে মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। একহাতে মাছি তাড়াচ্ছে আর অন্য হাতে রুটি খাচ্ছে মানুষ।

'তুমি খুব অস্থির হয়ে পড়েছ, ডন,' যুথি বলল মৃদু গলায়। এক হাত রাখল ওর কাঁধে।

জোর করে হাসল সে। কৌতূহলী স্ত্রীকে দেখল। এ দেশে যুথির প্রথম সফর ছিল এটা, প্রথম থেকে সবকিছুতেই গভীর

আগ্রহ ছিল। এখনও আছে। কুচকুচে কালো চুল.চমৎকার প্রিন্টের স্কার্ফ দিয়ে ঢেকেছে ও। জিনস এবং সাদা কটন ড্রিল শার্ট পরেছে। সব মিলিয়ে দারুণ মানিয়েছে।

'হ্যাঁ। আসলেই খুব টেনশনে আছি। এ দেশ না ছাড়া পর্যন্ত সুস্থির হতে পারব না।'

'অনর্থক টেনশন করছ তুমি। ওগুলো কোথায় আছে, বলে না দিলে কেউ টেরই পাবে না। তাহলে কেন শুধু শুধু ভাবছ? আমার ভয় হচ্ছে কেউ শেষ পর্যন্ত তোমার চেহারা দেখেই কিছু সন্দেহ না করে বসে।'

ঠিকই বলেছে ও, ডন ভাবল। ওর সন্দেজনক আচরণ দেখে কেউ কিছু ভেবে বসতেও পারে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তালেবান চর, কাজেই সতর্ক হওয়া উচিত। এখন একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ। আবার যুথিকে দেখল ডন। একদম শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। ওর নার্ভ বলে আছে কিছু? এ মুহূর্তে ওর মত যদি হতে পারত সে, বড় ভাল হত।

ঘড়ি দেখল—প্রায় নয়টা। আর মাত্র দেড় ঘণ্টা আছে ফ্লাইট ছাড়ার। সোয়া নয়টায় প্রকাণ্ড এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে ব্রেক কষল ট্যাক্সি। লাগেজপত্র সামলে টার্মিন্যাল ভবনের প্লেট গ্লাস ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা। চারদিকে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ। যাত্রীর চাপ নেই তেমন। যা আছে তার বেশিরভাগই বিদেশী, আফগান কতজন আছে হাতে গুনে বলা যায়।

ভেতরের পরিবেশে কেমন এক বিপদ বিপদ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হলো ডনের। নাক টানলেই বুঝি টের পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আর সব এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জে যেমন ব্যস্ত আনাগোনা, ভদ্র হৈ-চৈ থাকে, কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার কিছুই নেই। আশ্চর্যরকম নীরব সবাই। যেন কারও

সমাধিক্ষেত্র এটা, সবাই এসেছে মৃতের কাছে নীরবে শোক প্রকাশ করতে।

অবশ্য বাচ্চারা নেই ওসবের মধ্যে। ওরা ওদের জগৎ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। বিশাল টাইলড্ ফ্লোরে ছোটাছুটি করছে, চ্যাঁচাচ্ছে। ওরাই জ্যান্ত রেখেছে ভেতরের পরিবেশ।

কয়েকটা কাউন্টারের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীরা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সারি। চারদিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল ডন। আসার দিন ভেতরে স্বঘোষিত তালেবান বিপ্লবী গার্ডদের বেশ কয়েকজনকে দেখেছিল, আজ একজনকেও চোখে পড়ছে না। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, আজ বোধহয় নেই ব্যাটারা। নাকি ঘাপ্টি মেরে আছে কোথাও?

যূথীকে কিছু বলার জন্যে মুখ ঘোরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা চিৎকার শুনে কলজে লাফিয়ে উঠল ওর। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল সেদিকে। যুবক বয়সী তিন-চারজন দাড়িওয়ালা লোক নীল স্যুট পরা বয়স্ক একজনকে টেনে বের করে আনছে লাইনের মাথা থেকে। লোকটার চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

হৃৎকম্পন মুহূর্তের জন্যে থেমেই দ্বিগুণ হলো ডনের। রাশিদ কারেমি! 'ডন!' ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল যূথী। 'সেই...'

'চুপ্!' দ্রুত বলল ও। হাত-পা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। 'একদম চুপ করে থাকো।'

সত্যি তাই। টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনেছে ওরা লোকটাকে, তার তীব্র প্রতিবাদ কানেই তুলছে না। কারেমির পাশেই বোরখা পরা দু'জনকে দেখা গেল। মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলেছে তারা, আতঙ্কে ফ্যাকাসে চেহারা দেখতে পাচ্ছে ডন। বয়স্কজন নিশ্চই কারেমির তুর্কী স্ত্রী হবে। অন্যটি মেয়ে। সতেরো-আঠারো হবে হয়তো বয়স। হাউমাউ করে কাঁদছে মেয়ে।

যূথীর দিকে তাকাল ডন। ওর চেহারাও মড়ার মত ফ্যাকাসে। ঠোঁট সাদা। 'এসো,' কোনমতে বলল ও। 'জলদি!'

হই-চইয়ের দিকে এক চোখ রেখে লাইনে দাঁড়াল ওরা। এক গোমড়া অফিসার লাগেজ চেক করল দু'জনের। অহেতুক বেশি সময় লাগাল ব্যাটা। সব ওলট-পালট করে একাকার করল। ঝামেলা বাধল যূথীর সুটকেস নিয়ে। কাপড়ের নিচ থেকে কয়েক রোল কোডাক্রোম উঁকি দিচ্ছে দেখেই তার চেহারা বিগড়ে গেল। 'এগুলো...কি?' এমনভাবে তাকাল যেন বাপের জন্মে ফিলম্ দেখেনি। কর্কশ আঙুল দিয়ে ডলাডলি করতে লাগল সিল্কের মত মোলায়েম সেলুলয়েড।

চালে কাজ হয়েছে ভেবে খুশি হলো যূথী। তবু চেহারায় অসন্তোষ ফুটিয়ে তুলল। অফিসারের ঘাড়ের ওপর দিয়ে এক গাঢ় সবুজ ড্রেস পরা পাঠানকে উঁকি দিতে দেখে বলল, 'প্লীজ, ওগুলো নষ্ট করবেন না। আমি ফটোগ্রাফার, অনেক দিন ধরে ছবিগুলো তুলেছি। আপনাদের সফল বিপ্লবের দলিল ওগুলো। ওগুলো ছাপা হলে পৃথিবী জানবে...

'কি জানবে?' অফিসারকে অগ্রাহ্য করে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল পাঠান।

বুঝতে না পেরে চোখ তুলল যূথী, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'আমাদের বিপ্লব?' আবার বলল সে। 'কোন দরকার নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ফটোগ্রাফাব ছাড়া চলে গেছে আমাদের। আজও চলবে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই, মোহ্তারমা।'

অধৈর্যের মত মাথা ঝাঁকাল যূথী। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি সৌখিন ফটোগ্রাফার নই, প্রফেশনাল। ওই ফিলম্ খোয়া

গেলে আমার ম্যানেজমেন্টকে কি জবাব দেব আমি? চাকরি চলে গেলে খাব কি?'

'কেন, আপনার মরদ খাওয়াবেন!' বাঁকা চোখে ডনের দিকে তাকাল পাঠান। তারপর, যেন এইমাত্র দেখল, এমনভাবে যূথীর গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তিনটে দেখল। 'ইউ স্মার্ট লেডি, ইয়েস? একসঙ্গে তিনটা করে ছবি তোলেন?'

আশপাশে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে দেখে বিব্রত বোধ করল ওরা। বেশিরভাগই কালো ড্রেস পরা মোল্লা, কাঁধে অত্যাধুনিক অটো রাইফেল। তালেবান গার্ড। শকুনের চোখে তাকিয়ে আছে যূথীর বুকের দিকে।

'এক মেয়ের জন্যে তিন ক্যামেরা অনেক বেশি হয়ে যায়, মোহ্তারমা!' বলে হাত বাড়াল সবুজ সালোয়ার-কুর্তা। 'দেখি, একটা দিন তো আমাকে!'

অসহায়ের মত ডনের দিকে তাকাল ও, তারপর সবচেয়ে পুরানো ৩৫ এমএম লেইকাফ্লেক্সটা তুলে দিল। নিল সে। হলুদ দাঁত বের করে হেসে হ্যাসেলব্লডটা ইঙ্গিত করল, 'ওটাও দিন। একজনের জন্যে একটা ক্যামেরাই যথেষ্ট।'

খানিক ইতস্তত করে ওটার স্ট্র্যাপ ধরল যূথী। 'তাহলে আমার ফিলম্ ফেরত দিচ্ছেন তো? ওগুলো আমার...'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়! ওগুলো আমাদের কোন কাজে আসবে না। এমনিতেও মিস্টার কোডাককে একদম পছন্দ করি না আমরা।'

বলল বটে, তবে তৎপর হতে দেখা গেল না তাকে। বরং ধীরেসুস্থে রোলগুলো একটা একটা করে আলোর সামনে মেলে ধরল। সব ছবি বরবাদ হয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে আরেকবার হলুদ দাঁত দেখাল। 'ধন্যবাদ, লেডি। এই নিন্। ফিলম্গুলো দেখে মনে হয় না কোন আপত্তিকর ছবি তুলেছেন আপনি।'

অকেজো সেলুলয়েডের ফিতে দলা পাকিয়ে ফেরত দিল সে। 'দুটো ক্যামেরা গিফট্ করার জন্যে ধন্যবাদ। এবার যেতে পারেন আপনারা,' বলে নিজেই সরে গেল সে সামনে থেকে।

'হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল যূথী।

'চেপে যাও। আপদ গেছে তাইই বেশি।'

কাউন্টারের ঝামেলা সেরে সিকিউরিটি ডোরের দিকে এগোল। নীল ইউনিফর্মের ফিটফাট এক ন্যাশনাল পুলিস দাঁড়িয়ে আছে গেটে, অস্বাভাবিক সময় নিয়ে প্রতিটা পাসপোর্ট-ভিসা, টিকেট ইত্যাদি চেক্ করছে। তার একজিট স্ট্যাম্প সীল করার ধাক্কায় চারদিক কাঁপছে।

গেট অতিক্রম করতে পেরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন ওদের। 'ওফ্, বড় বাঁচা বাঁচলাম!' ফিস্‌ফিস করে বলল ডন।

'কারেমির কি হলো?' প্রশ্ন করল যূথী।

'জানি না। দেখব কখন, শালাদের যন্ত্রণায়...' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে। পিছন ফিরে লাউঞ্জের পরিস্থিতি দেখার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল। সোফার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এই সময় এল ডাকটা। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জমে গেল।

'মিস্টার ডন! মিসেস ডন!'

প্রথমে ওরা ভেবেছিল পিছন থেকে এসেছে বুঝি, কিন্তু না, সামনে থেকে এসেছে। চেক্ আউট ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ছয় ফুটের কিছু বেশি হবে দৈর্ঘ্যে, তাগড়া স্বাস্থ্য। মুখটা চৌকো। ধূসর মোহায়ের স্যুটে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে। হাসিটাও আন্তরিক। সে ডাকছে।

কিন্তু তার পিছনেই দু'হাত বুকে বেঁধে দাঁড়ানো দুই পাঠানকে দেখে আত্মা উড়ে গেল ওদের। ওদের একটার হাতেই সামান্য আগে ক্যামেরা তুলে দিয়েছে যূথী—ওর নাম আলি। অন্যজন তার

সঙ্গী, ইরাজ। পরপর কয়েকটা বিট্ মিস করল ডনের হার্ট। ওরা কখন এল? কোন্‌দিক থেকে?

'আমি কর্নেল নাজাফ মুরাদ,' হাসিমুখে বলল মোহায়ের স্যুট। 'আফগান ইন্টারনাল সিকিউরিটি চীফ। আপনাদের পাসপোর্ট আর টিকেটগুলো আমাকে দিন, প্লীজ!'

'কেন?' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল ডন। 'আমরা তো...'

'কোন প্রশ্ন নয়, স্যার। প্লীজ।'

রাগে, আশঙ্কায় অল্প অল্প কাঁপছে যূথী। ছোট এক রুমে একদম নগ্ন দাঁড়িয়ে আছে ও, শার্ট-ব্রা-জিনস পায়ের কাছে পড়ে আছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরখায় ঢাকা দুই মেয়ে গার্ড ওকে সার্চ করছে। শুধু চোখ ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখা যায় না।

আধঘণ্টা ধরে ভেতর-বার সার্চ করে সন্তুষ্ট হলো ওরা। কাজ সেরে টিস্যু পেপারে আঙুল মুছে সম্ভবত হাসল একজন, অন্তত তার চোখের কোণ দেখে তাই মনে হলো। পরক্ষণে দু'আঙুলে ওর স্তনের বোঁটা ধরে জোরে চাপ দিল সে। চেহারার প্রতিক্রিয়া অনেক কষ্টে ঠেকালেও চোখের পানি ঠেকাতে পারল না যূথী।

ওকে ছেড়ে ওর পরিধেয় নিয়ে পড়ল এবার মেয়ে দুটো। ব্লেড দিয়ে যেখানে সেখানে কেটে 'আপত্তিকর' জিনিস খুঁজল। না পেয়ে ইশারায় ওগুলো পরতে বলল। ডাক পেয়ে ইরাজ এসে রুমে ঢুকল, পথ দেখিয়ে যূথীকে বাইরে নিয়ে এল। রুমের সামনের ছোট করিডরে ডনকে দেখল ও। এলোমেলো চেহারা। শার্ট-প্যান্টের এখানে-সেখানে ব্লেডের পোচ।

চোখ কুঁচকে স্ত্রীকে দেখল সে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে এক হাতে জড়িয়ে ধরল। বাহু চাপড়ে সাহস জোগাল। 'ভয়ের কোন কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে, ধৈর্য ধরো।'

বুট জুতোর আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। বাঁক ঘুরে কর্নেল মুরাদকে আসতে দেখল। সঙ্গে আলি। কাছে এসে চোখ কুঁচকে ওদের দেখল কর্নেল, তারপর মাথা দুলিয়ে হতাশা প্রকাশ করল। 'আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও দেশদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডের গুরুতর অভিযোগে আপনাদের দু'জনকে গ্রেফতার করা হলো। এর অর্থ কি নিশ্চয় বোঝেন আপনারা। বোঝেন না?'

রেগে উঠল ডন। 'হাজারবার বলেছি আপনার অভিযোগ মিথ্যে। আমরা কোন অপরাধ করিনি।'

পাত্তা দিল না কর্নেল মুরাদ। একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চলল, 'আমাদের কাছে খবর আছে আজই খুব ভোরে আমাদের দেশী এক বেঈমান, ইসলামের শত্রু, দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একান্ত গোপনীয় কিছু দলিল নিয়ে আপনাদের হোটেল রুমে গিয়েছিল। আপনাদের ওসব দিয়েছে সে, এবং আপনারা দু'জন তা চোরাচালান করে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। আফগানিস্তানের বাইরে সেসব ছাপিয়ে তালেবান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে চাইছিলেন।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ডন। 'রাবিশ!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'রাবিশ! আমি তালেবান সরকারের স্বপক্ষে ছাড়া বিপক্ষে কিছু লিখিনি কখনও, এদেশের হাই-অফিশিয়াল সবাই তা জানে। আগেও অনেকবার এ দেশে এসেছি আমি, ভবিষ্যতেও আসার ইচ্ছে আছে। দেশে-বিদেশে আপনাদের সফল বিপ্লবের খবর বিক্রি করে যথেষ্ট টাকা আয় করি আমি, সেধে কেন সে সুযোগ নষ্ট করব?'

'তাছাড়া সার্চ করে কিছুই তো পাননি আপনারা!' যোগ করল যূথী। 'ওই দুই ডাইনী...'

'হ্যাঁ, পাইনি,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল মুরাদ। 'কিন্তু তাতে

প্রমাণ হয় না কিছুই। গার্ডদের রিপোর্ট পেয়ে পরিষ্কার বুঝেছি আমি, আপনি, মিসেস ডন, ইচ্ছে করেই সুটকেসের ওপরদিকে কিছু ফিল্‌ম রেখে দিয়েছিলেন। সহজেই যাতে ওগুলো সবার চোখে পড়ে। অল্পে ছাড়া পেয়ে যান আপনারা। অথচ আমি নিজে সার্চ করে নিচের দিকে আরও কিছু ফিল্‌ম পেয়েছি। একই সুটকেসে দুই জায়গায় কেন রেখেছেন ফিল্‌ম?'

'আমি...'

'সরি, মিসেস ডন। আমি নিশ্চিত জানি আজ ভোরে কিছু গোপন ডকুমেন্টস আপনাদের হাতে পড়েছে। অথচ ওগুলো পাইনি খুঁজে। এই অবস্থায় আপনাদের কিছুতেই যেতে দেয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা আমি রিপোর্ট করতে যাচ্ছি আমাদের সুপ্রীম কাউন্সিলের কাছে। যতদিন কোন সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন জেলে থাকতে হবে আপনাদের।' কথা শেষ করে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল, গট্‌গট্‌ করে হেঁটে চলে গেল।

ওদের দু'জনকে হাতকড়া পরিয়ে সিকিউরিটি ভ্যানে তোলা হালো। অজস্র কৌতূহলী চোখের সামনে দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ভ্যান।

দুই

বিসিআই, ঢাকা।

'নামটা চেনা চেনা লাগছে!' চিন্তিত গলায় বলল মাসুদ রানা।

'মনে হয় আমিও তার দু'একটা রিপোর্ট পড়েছি পত্রিকায়।'

মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। 'হতে পারে। প্রায়ই ছাপা হয়। বিবিসি-সিএনএন এরমধ্যে তার কয়েকটা ডকুমেন্টারি কিনে প্রচারও করেছে। ওই লাইনে বেশ পরিচিত সাংবাদিক। তার স্ত্রীও ফটোগ্রাফার হিসেবে যথেষ্ট রেপিউটেড।'

পুরো ঘটনা মনে মনে আরেকবার নেড়েচেড়ে দেখল ও। বৃদ্ধ যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে: ফাহমিদা ও হামিদা নামের দুই আফগান মেয়ে, প্রথমজন তালেবান বিপ্লবী কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার রাশিদ কারেমির ব্যক্তিগত সহকারী, অন্যজন কাবুলের বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের। কারেমি এক সময় বাংলাদেশের আফগান দূতাবাসের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার ছিল। ওদেশে মেয়েদের বাইরের কাজ নিষিদ্ধ করা হলেও দূতবাসের মেয়ে কর্মীদের ব্যাপারে এখনও সরাসরি কোন নির্দেশ দেয়নি সরকার। অন্যদিকে রাশিদ কারেমি হাই অফিশিয়াল বলে তার পি.এসও নির্বিঘ্নে কাজ করেছে এতদিন।

তালেবানদের ইদানীংকালের কিছু কিছু কাজ নাকি কারেমি মেনে নিতে পারছিল না, এসব নিয়ে বাসায় প্রায়ই স্ত্রীর সাথে আলোচনা হত তার। একদিন তাকে বারবার বাংলাদেশ শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনে সন্দেহ হয় ফাহমিদার, আড়াল থেকে তাদের আলোচনার পুরোটা শোনে সে। রাতে ছোট বোন হামিদাকে জানায় ঘটনা, সে তা জানায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ফারুখ হোসেনকে।

পরদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বিসিআইকে পুরো ঘটনা জানানো হয় তার রিপোর্টসহ। তালেবানরা কিছু ধর্মান্ধ বাংলাদেশীর সাহায্যে এ দেশে মারাত্মক কিছু ঘটাতে তৈরি হচ্ছে বলে সতর্ক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে করাচী বিসিআই এজেন্টদের

একজনকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন রাহাত খান।

তার পাঠানো খবর অনুযায়ী পাঁচদিন আগে রাশিদ কারেমি এ ব্যাপারে কিছু গোপন তথ্য সাংবাদিক ডন সিদ্দিককে দিতে তার হোটেলে যায়। দিয়েওছিল সে। পরদিন সকালে সস্ত্রীক ঢাকা ফিরে আসার কথা সাংবাদিকের, রাশিদ কারেমিও বউ-মেয়ে নিয়ে তুরস্কে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে যায় সবাই।

ওদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা চীফ কর্নেল মুরাদ গ্রেফতার করে তাদের। গোপন ডকুমেন্টসের খোঁজে সাংবাদিক যুগলকে অনেকক্ষণ ধরে সার্চ করে সে, কিন্তু পায়নি কিছু। ওদিকে কারেমি জেলখানায় আত্মহত্যা করেছে।

বিসিআই এজেন্ট ওখানকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের ওখানে ফাহমিদার সাথে কথা বলে যে তথ্য পেয়েছে, তা হচ্ছে...ইত্যাদি।

এরপর গত পরশু আরেক মেসেজ পাঠিয়েছে সে। তাতে বলেছে, ডকুমেন্টগুলো কারেমি ডনকে দিয়েছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুরাদ এখনও ওগুলো উদ্ধার করতে পারেনি। ওগুলোর খোঁজ বের করার জন্যে সাংবাদিক যুগলের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে মুরাদ।

চেয়ার ছাড়লেন রাহাত খান। ধীর পায়ে পিছনের জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন ঝাড়া পাঁচ মিনিট। চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। নিভে যাওয়া পাইপ টানছেন আনমনে। ঘুরলেন বৃদ্ধ। সরাসরি ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু রানার মনে হলো ওকে দেখছেন না, ওর খুলি ভেদ করে পিছনে চলে গেছে তাঁর নজর।

'সাতাশ বছর পুরো হলো স্বাধীন হয়েছি,' থমথমে গলায় বলে উঠলেন। 'সাতাশ বছর! অথচ কি আশ্চর্য, এক ইঞ্চিও এগোতে

পারল না দেশ। সেই একাত্তরেই রয়ে গেছি সবাই। রাজনীতিকদের হালুয়া-রুটি ভাগাভাগি আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আজও শেষ হলো না, কেউ দেশকে এগিয়ে নেয়ার কোন চেষ্টাই করল না। সবাই কেবল অতীত নিয়ে জাবর কাটে, ও অমুক করেছে, সে তমুক করেছে।

'এখন শুনি আমাদের হাজার বছর পিছিয়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।' ফিরে এসে বসলেন তিনি। 'সরকারী আর বিরোধী রাজনীতিকরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত বলেই আজ এমন সব ভয়ঙ্কর খবর শুনতে হচ্ছে। ওদের কতবড় সাহস লাখ লাখ শহীদের রক্তের সাথে এতবড় বেঈমানীর স্বপ্ন দেখে!'

'ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, স্যার,' আস্তে আস্তে বলল রানা। 'সুযোগ পেলে চোর চুরি করবেই। চোর ঠেকাতে হলে গৃহস্থকে ঘরের দরজা-জানালা নিরাপদ করতে হয়, আমরা কখনোই তা করিনি। এই জন্যেই দিনে দিনে সাহস বেড়েছে ওদের।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল। 'সেই জন্যেই তো দুঃখ হয়।'

'খবরটা কি পত্রিকাওয়ালারা জেনেছে, স্যার?'

'না, ওরা এখনও টের পায়নি কিছু।' পাইপ ধরালেন তিনি নতুন তামাক ভরে। 'আফগানরাও শুনলাম এ ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করেছে।'

'কোথায় রাখা হয়েছে ওদের?'

'কাবুলেই। তাশকুরগান জেলে।' সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালেন। 'তোমাকে যেতে হবে, রানা। যেভাবে পার ওদের দু'জনকে বের করে আনতে হবে জেল থেকে। কারেমি কি দিয়েছে ওদের, জানতে চাই আমরা।'

'কিন্তু, স্যার, ওটা আছে কি না...'

'আমার বিশ্বাস আছে,' চোখের কোণ চুলকালেন তিনি। 'আমাদের লোক বলছে সেই রাতে কারেমি যখন ডনের হোটেলে যায়, তখন তার হাতে একটা পোর্ট ফোলিও ছিল। বেরিয়ে আসার সময় ছিল না। তার মানে ওটা ডনকে দিয়েছে সে। অথচ কর্নেল মুরাদ এখনও কাগজগুলো পায়নি, কেন? এর একটাই জবাব, সাংবাদিক যুগল বিপদ টের পেয়ে কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। হয়তো ওদের সঙ্গে নেই, আর কোথাও আছে। তবে আছে যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওগুলো পেয়ে গেলে এতদিন ওদের বাঁচিয়ে রাখত না কর্নেল।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

'আমি তাশকুরগান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি। খুব একটা সুবিধের মনে হয়নি। ওখানে কিছু ঘটাতে গেলে বড় ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে।'

'জ্বি।'

'আমেরিকানদের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। ওরা ওদের স্যাটেলাইটের তোলা কাবুলের কিছু ছবি দিয়েছে। ওতে তাশকুরগানসহ চারদিকের অনেকটা এলাকা একদম পরিষ্কার দেখা যায়। তোমাদের কাজে লাগবে ওগুলো।'

তাশকুরগান, কাবুল।

অগভীর, দুঃস্বপ্নময় ঘুম ভাঙতে চোখ মেলল ডন। সেলের বাইরে হল্লা করছে রেগুলার ও তালেবান গার্ডরা। মাতৃভাষায় কয়েদীদের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছে। রাতের চার-পাঁচ ঘণ্টা বাদে এইই চলে এখানে সারাক্ষণ। আজ পাঁচদিন হলো এখানে আছে সে, কান সয়ে গেছে।

ক'টা বাজে এখন? ঘড়ি নেই, খুলে নিয়ে গেছে গার্ডরা, তাই

সঠিক সময় বোঝার উপায় নেই। তবে সিলিঙের কাছাকাছি সেলের তিন বাই এক ফোকর দিয়ে যে অ্যাঙ্গেলে সূর্যের আলো আসছে, তাতে মনে হয় তিনটের মত বাজে।

উঠে বসল ডন খড়ের বিছানার ওপর। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বিছানা। প্রথম দু'দিন অস্বস্তি লেগেছে, এখন আর লাগে না। ওকে আলাদা রেখেছে কর্নেল মুরাদ। আট বাই আট পাথরের সেলে একা আছে ডন, দেয়াল ধূসর, মেঝে ধূসর, সিলিঙ ধূসর, লোহার গেটও ধূসর। স্টীল শীট দিয়ে ঢাকা, বাইরের কিছু দেখার উপায় নেই। বিশেষ সেলের জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

তাশকুরগানে বিকেল পাঁচটা হচ্ছে বিপজ্জনক সময়। তালেবান সরকারের বিচারমন্ত্রী হোসেন শাহ বরকতী রোজ একবার করে টহলে আসে তখন। লোকটার চেহারা অনেকটা পাকিস্তানী জেনারেল টিক্কা খানের মত। সালোয়ার-কুর্তা, পাগড়ি আর গালভরা কুচকুচে দাড়িতে চট্ করে বোঝা যায় না অবশ্য। তার শূন্য দৃষ্টি দেখলে বুক কাঁপে ডনের।

এ-সেল ও-সেলে ঘোরাঘুরি করে ব্যাটা। মজা দেখার জন্যে 'তোমার ঝামেলা আজ মিটিয়ে দিলাম, বন্ধু। রায়ে সই করে দিয়ে এসেছি। কাল তুমি খতম!' অথবা 'আজ রাতে শেষ খানা খাবে তুমি।' নয়তো, 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিয়ো রাতের নামাজের সময়,' ইত্যাদি বলে কয়েদীদের ভয় দেখায়।

যাদের বলা, তাদের চেহারার পরিবর্তন দেখে মিটিমিটি হাসে বরকতী, কিন্তু চোখ পর্যন্ত পৌঁছায় না তা। দু'বার ডনের সেলেও এসেছে লোকটা, একই ধরনের ভয় দেখানো মন্তব্য করেছে হাসতে হাসতে। লোকটার কথা মনে এলে বুক কাঁপে ওর। তবে সে যে কেবল ভয়ই দেখায়, তা নয়। কাজ করেও দেখায়। তাশকুরগান জেলখানার ধারণ ক্ষমতা মাত্র আটশো, সেখানে এই

মুহূর্তে কয়েদী আছে কম করেও তিন হাজার।

তারওপর রোজই ডজন ডজন কয়েদী আসছে। পরিস্থিতি যাতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বাইরে চলে না যায়, সেজন্যে রোজ কম করেও এক-দেড় ঘণ্টা শূটিং প্র্যাকটিসও চলে ভেতরের ফায়ারিং স্কোয়াডে।

কাজেই বরকতী কারও কারও সঙ্গে ঠাট্টা করলেও তারা ব্যাপারটাকে সত্যি বলেই ধরে নেয়। কেঁদেকেটে একাকার হয়। তাই দেখে মজা পায় সে।

নাকে কেমন এক গন্ধ আসতে ঘুরে তাকাল সাংবাদিক। খড়ের গদির কাছে পড়ে আছে ওর দুপুরের বরাদ্দ এক বাটি পানির মত বাঁধাকপির সুপ। খায়নি। প্রথমদিন ওই জিনিস পেটে যাওয়ামাত্র যে ভয়ঙ্কর ডায়রিয়া শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে আর তাকিয়েও দেখেনি ও বাটির দিকে। হাত দিয়ে ঠেলে ওটা আরও সরিয়ে দিল সে। যূথীর কথা ভাবতে লাগল।

কোথায় আছে ও, কেমন আছে, কিছুই জানে না ডন। এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসা পর্যন্ত একসঙ্গে ছিল ওরা সেদিন, তারপর আলাদা করে ফেলা হয়েছে। রোজই আশা করে আজ হয়তো দেখা হবে দু'জনের, কিন্তু না। পাঁচদিন চলে গেল, কোন খবর নেই।

হাত দিয়ে বিছানার ওপর চরে বেড়ানো কয়েকটা তেলাপোকা তাড়িয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুলো ডন। ভাগ্যে কি আছে ভাবতে ভাবতে অগভীর, অস্বস্তিকর তন্দ্রার রাজ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, আচমকা ঘটাং শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। হোসেন শাহ বরকতীকে হাসিমুখে ঢুকতে দেখে ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে উঠল। বরকতীর দু'পাশে সেই দুই তালেবান গার্ড, আলি ও ইরাজ।

ধীরস্থির ভঙ্গিতে সেলের চারদিকে নজর বোলাল বিচারমন্ত্রী, নাক কোঁচকাল। হাসি গায়েব হয়ে গেছে। 'অ্যাহ্, কী বাজে দুর্গন্ধ! মনে হচ্ছে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা পছন্দ করছে না বাংলাদেশী সাংবাদিক বন্ধু। কিন্তু করা উচিত। প্রত্যেকটা সেলে আট থেকে দশজন করে আসামী রেখেছি আমরা, শুধু আপনাদের দু'জনকে আলাদা রেখেছি। সাধারণ কয়েদীর মত আচরণ করছি না আপনাদের সাথে।'

মুহূর্তে বুকের চাপ হাল্‌কা হয়ে গেল ডনের। এই প্রথমবারের মত ওর সামনে যূথীর প্রসঙ্গ তুলল কেউ। ও বেঁচে আছে, এখানেই আছে, ভেবে মনের বল বহুগুণ বেড়ে গেল।

'সে জন্যে অবশ্য অ্যাকোমোডেশনের সমস্যায় পড়েছি আমরা,' বলে উঠল বরকতী। 'তাই ঠিক করেছি খুব শিগ্‌গিরি ঝামেলা মিটিয়ে ফেলব।' হাসি ফিরে এল মুখে। তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টানার ভঙ্গি করল। 'গুড়ুম, গুড়ুম! মামলা খতম। দুটো সেল বাড়বে।'

গলা শুকিয়ে উঠল ডনের। কিন্তু মনের ভাব বরকতীকে টের পেতে দিতে রাজি নয় বলে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। 'আমরা কোন অন্যায় করিনি, কেন অনর্থক আমাদের...'

'আলবৎ করেছ!' খ্যাক খ্যাক করে হাসল মন্ত্রী। 'এবং সেটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। নইলে স্পাইদের সাথে কি আচরণ করতে হয়, আমরা তা ভালই জানি।'

'আমি স্পাই নই!'

ফের উধাও হয়ে গেল বরকতীর হাসি। 'কর্নেল মুরাদ সে ব্যাপারে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গতকালই জানিয়েছে আমাকে। কোন সন্দেহ নেই তুমি এবং তোমার স্ত্রী, দু'জনেই স্পাই। এখন আসল প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা মরতে চাও, না বাঁচতে। কোনটা?'

কিছুক্ষণ লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ডন। 'আমি কোন অন্যায় করিনি, কাজেই মরতে চাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।'

'গুড!' ঢলঢলে কুর্তার সাইড পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল সে। 'তাহলে এই স্বীকারোক্তিনামায় সই করো।'

ওটা দেখেও না দেখার ভান করল সে। 'আমার কোন অপরাধ প্রমাণ হলো না, কোন বিচার হলো না, কিসের স্বীকারোক্তিতে সই করব আমি?'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিচারমন্ত্রী, মাথা দোলাল ডানে-বাঁয়ে। 'নিজেই যখন সেধে মরতে চাইছ, আমার আর কি করার আছে, বলো?' একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'যাই, দেখি তোমার স্ত্রী কি বলে।'

এক ফ্লোর নিচে একই রকম আরেক সেলে আছে যূথী। অনেক ভাল আছে সে ডনের তুলনায়, রীতিমত গার্ডদের খাতিরযত্নে আছে। একে মেয়ে, তারওপর সুন্দরী ও অল্প বয়সী। সেই সঙ্গে আছে পুরুষ পটানোর সহজাত ক্ষমতা। সব অস্ত্র একসঙ্গে প্রয়োগ করে প্রথমদিনেই নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে যূথী।

বন্দী হয়েও মুখের হাসি মলিন হতে দেয়নি। ওর সেলের পাহারায় যারা রয়েছে; আলি আর ইরাজ, ওদের দেখলে জোর করে হলেও মিষ্টি হাসি দেয়। ভাঙা ভাঙা পশতুতে ওদের, ওদের পরিবারের অন্যদের কুশল জিজ্ঞেস করে। সুযোগ পেলে যেন খেয়াল করেনি, এমনি 'অসতর্কভাবে' কাটাছেঁড়া শার্টের তলায় ঢাকা ওর দুধসাদা বুকের খানিকটা, কি উরুর কিছু অংশ দেখতে

সাহায্য করে।

না দেখেও আলি-ইরাজের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা বা ঢোক গেলা দিব্যচোখে ঠিকই দেখতে পায় যূথী।

এসব ও করছে একটামাত্র কারণে, তা হলো এখান থেকে ফিলমটা নিয়ে বের হওয়ার কোনও উপায় করা। গার্ড দুটো যে এখন ধর্ম-কর্ম, বেহেশত্-দোজখ ভুলে কেবল ওকে পাওয়ার অলীক স্বপ্নে বিভোর, তাতে যূথীর কোন সন্দেহ নেই। এখন ওদের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা চলছে কে আগে ওকে দখল করবে, তাই নিয়ে।

এ ওকে লুকিয়ে চা-কফি দিয়ে যায়, ও একে আড়াল করে ওর প্লেটে ভাল ভাল খাবার তুলে দিয়ে যায়। ভালই আছে যূথী। আমেরিকান মাসকারা, লিপস্টিক, আয়না-চিরুনি, মোটামুটি সবই জুটে গেছে। ডন বেঁচে আছে, এই জেলেই আছে, তাও আর অজানা নেই।

কাজেই খুব একটা পরোয়া নেই ওর। মৃত্যু যদি হয়, যখন হওয়ার হবে। তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে আগেই নিজেকে মেরে ফেলতে রাজি নয়। এ মুহূর্তে দেয়ালে হেলান দিয়ে পাঁচদিন আগের কথা ভাবছে মেয়েটি।

রাশিদ কারেমি বিদেয় নেয়ার পরই ডনের সন্দেহ জেগেছিল তাকে হয়তো অনুসরণ করছে তালেবানরা। যদি তাই হয়, তাহলে ওদের পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যাটাদের মোটেই সময় লাগবে না। কাজেই পরের করণীয় ঠিক করতে দু'মিনিটও নষ্ট করেনি সে, যূথীর মিনিয়েচার মিনক্স এলএক্স ক্যামেরা দিয়ে ডকুমেন্টগুলোর ছবি তুলে নিয়েছে ঝট্‌পট্। ফ্ল্যাশের আলো যাতে বাইরে না যায়, সে জন্যে জানালাবিহীন বাথরুমে কাজ সেরেছে। কাজ শেষে আধইঞ্চি প্লাস্টিক স্পূল ক্যাসেটটা সেলোটেপ দিয়ে আটকে দিয়েছে যূথীর

ঘাড় ও খুলির সংযোগে, ঘন চুলের নিচে।

এখনও ওখানেই আছে। যূথী জানে, ও যদি আরও কিছুদিন ওর বক্তব্যে অটল থাকতে পারে, যদি মুখ না খোলে, তাহলে নিশ্চয়ই ছাড়া পাবে। এ দেশে বিদেশীদের মৃত্যুদণ্ড হয় না তা নয়, হয়, তবে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নয়। যূথী অন্তত তেমন কোন ঘটনার কথা শোনেনি। যদি তেমন কোন অঘটন না ঘটে, একদিন এই ফিলম্ নিয়ে ওরা দেশে ফিরবেই। সব হারামজাদাকে...করিডরে ব্যস্ত, ভারী পায়ের আওয়াজ উঠতে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল যূথীর।

সেলের তালা খুলল নতুন এক গার্ড। একে আগে কখনও দেখেনি ও। ভেতরে ঢুকেই একটা মেশিন পিস্তল তুলল লোকটা, চেহারা রাগে লাল। তার চোখে খুনীর চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গেল যূথী, দেয়ালের মধ্যে ঢুকে নেই হয়ে যেতে চাইল।

'তুমি মিথ্যে বলেছ আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠল গার্ড। 'অনর্থক সময় নষ্ট করেছ আমাদের, তাই মরতে হবে আজ তোমাকে!'

ওর ডান হাত মুচড়ে পিছনে নিয়ে এল লোকটা, কব্জি যথাসম্ভব ওপরে তুলে সামনে ঠেলে নিয়ে চলল। 'হাঁটো! এখনই মরবে তুমি!'

ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল যূথীর। গুঁতো খেয়ে পা বাড়াতে বাধ্য হলো। করিডরে এসে আলি বা ইরাজের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল ও–নেই কেউ। একদম ফাঁকা করিডর। পথের দুপাশের অসংখ্য সেলে মানুষ গিজগিজ করছে। ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দেখছে সবাই।

কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করল যূথী গার্ডের নির্দেশে, তারপর আচমকা বেরিয়ে এল অন্ধকার খোলা আকাশের নিচে। ঠাণ্ডা বাতাসে শিউরে উঠল। তাশকুরগানের পিছনের কোর্টইয়ার্ড

এটা–ফায়ারিঙ স্কোয়াডের নির্দিষ্ট জায়গা।

অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আধ ডজন তালেবান বিপ্লবী গার্ড দেখে আত্মা উড়ে গেল যূথীর। তবে কি সত্যিই…!? চোখ আপনাআপনি এনক্লোজারের দিকে চলে গেল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। দু'হাত পিছনে বাঁধা। তার পাশে আরেকজন আছে–হাসছে মিটিমিটি।

হোসেন শাহ্ বরকতী!

কিন্তু ওটা কে, ডন? হাতে ঢিল পড়ল যূথীর, দু'হাত এক করে বেঁধে ফেলা হলো পিছনে। পরক্ষণে কালো কাপড়ের স্যাকে ঢাকা পড়ে গেল গলা পর্যন্ত। সরু পাটের দড়ি দিয়ে ওটার মুখ বেঁধে দেয়া হলো। তীব্র আতঙ্কে ডনের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল ও, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না।

একজোড়া কঠিন হাত ঠেলে আরও খানিকটা নিয়ে গেল ওকে, দাঁড় করিয়ে দিল। খুব সম্ভব ডনের পাশে। পশতু কমান্ড শুনল যূথী, রাইফেল কক্ করার শব্দ শুনল। সব এত দ্রুত ঘটে গেল যে বিশ্বাস করতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল হঠাৎ, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, পড়ে যাচ্ছে যূথী, তখনই স্বর ফুটল।

একই সময় গুলি করার নির্দেশ দেয়া হলো। দুনিয়া কাঁপানো বজ্রপাতের মত একযোগে গর্জে উঠল ছয়টা রাইফেল। প্রায় বদ্ধ এনক্লোজারে এত জোর আওয়াজ উঠল যে ক্ষণিকের জন্যে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল যূথী, বধির হয়ে গেল।

কারাগার ভবনের এ পাশের এক জানালায় দাঁড়িয়ে নিচের দৃশ্য দেখছিল কর্নেল মুরাদ, গুলির শব্দ শুনে পর্দা ফেলে পিছিয়ে গেল সে। ধীরগতিতে ঘূর্ণায়মান সিলিঙ ফ্যানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। রেটিনায় এখনও ভাসছে বাইরের ছবি।

ওটা সত্যি নয়, মক এগজিকিউশন। ত্যাড়া কিসিমের অপরাধীদের দোষ কবুল করাবার জন্যে মাঝেমধ্যে এমন আয়োজন করতে হয়।

ফল মন্দ হয় না। এখন দেখা যাক, ভাবল সে, এরা মুখ খোলে কি না।

খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম। চারদিন পরের কথা।

দুর্গম পাহাড়ের ওপর তাড়াহুড়ো করে তৈরি এক ঘরে জরুরী বৈঠক চলছে। ঘরটা কাঠের, গোলপাতার ছাউনি। মাসুদ রানাসহ বারোজন রয়েছে ভেতরে। সবার বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। বেশিরভাগ বাংলাদেশ আর্মির অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডো, অন্যরা বিসিআই ও রানা এজেন্সির।

তিনজন বাদে আর সবাই বর্তমানে এই দুই সংস্থার হয়ে বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। আর্জেন্ট কল পেয়ে ঢাকা হয়ে গতকাল এখানে পৌঁছেছে। তিনজন দেশে ছিল, এরা বিসিআই হেড অফিসের 'রিজার্ভ'। রানা তাদের নিয়ে চলে এসেছে আগেই।

তাশকুরগান জেলে হানা দিতে যাচ্ছে ওরা সবাই মিলে। অপারেশনের নাম রাখা হয়েছে 'থান্ডারবোল্ট'।

'এই হচ্ছে পরিস্থিতি,' বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেষে বলল টীম লীডার মাসুদ রানা। দুই সারিতে বসা এগারো জোড়া অপলক চোখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। সব ক'টা মুখ যেন পাথরে তৈরি, চোখ কাঁচের। অটল অভিব্যক্তি, পলক পর্যন্ত ফেলছে না কেউ।

'কাজ কঠিন, সন্দেহ নেই। তবে অসম্ভব নয়। আমাদের যেতে হবে, তাশকুরগান জেল ভেঙে সাংবাদিক ডন ও তার স্ত্রীকে বের করে সটকে পড়তে হবে, তালেবান মোল্লার দল ব্যাপার টের

পাওয়ার আগেই।'

ঘুরে পিছনের দেয়ালে ঝোলানো আফগানিস্তানের বড় এক ম্যাপে হাতের ছড়ি দিয়ে টোকা দিল ও আস্তে করে। 'এই হচ্ছে সেই দেশ, আর এখানে কাবুল। অনেক বড় দেশ, পাঁচটা বাংলাদেশের সমান। তবে বেশিরভাগই মরুভূমি। দেশ, আবহাওয়া এবং প্রকৃতি, সবই আমাদের জন্যে বৈরী। যে সমস্ত পথ আমাদের ব্যবহার করতে হবে, তা কেবল কল্পনায় আছে, বাস্তবে নেই।' অডিয়েন্সের দিকে ফিরল ও।

'গেলাম আর ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে নিয়ে চলে এলাম, এমনটা যদি কেউ ভেবে থাকেন, দূর করে দিন মন থেকে। কারণ তা হওয়ার নয়। পাঠানরা যোদ্ধা জাতি, কথাটা সেকেন্ডের জন্যেও ভুলবেন না। আফগানরা অজেয়, কেউ আজ পর্যন্ত হার মানাতে পারেনি ওদের। চেঙ্গিস খান পারেনি, ইংরেজরা পারেনি, সোভিয়েত ইউনিয়নও পারেনি।

'রুশদের ভাগিয়েছে মোজাহেদিনরা, আর মোজাহেদিনদের ভাগিয়েছে তালেবানরা। ধর্মান্ধ হোক আর যা-ই হোক, লড়তে জানে ওরা সবাই। কাজেই ওদের আন্ডারএস্টিমেট করার কোন উপায় নেই। তবে ও দেশে একটা সুবিধে হয়তো পাব আমরা। সেটা হচ্ছে প্রায় অসামরিক তালেবান গার্ডদের সবকিছুতে সার্বক্ষণিক নাক গলানো নিয়ে রেগুলার ফোর্স বেশ বিরক্ত। দ্বন্দ্ব আছে ওদের ভেতরে। এর ফলে দ্রুত কাজ সারার হয়তো সুবিধে হবে আমাদের।

'একটা কথা মনে রাখবেন, এই মিশনে আমি কোন হিরো চাই না। কোন হারকিউলিস চাই না। আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ এক কদমও ফেলবে না ও দেশে, অন্ধের মত আমার প্রত্যেকটা নির্দেশ অনুসরণ করবে, এমন অনুগত যোদ্ধা চাই। নইলে হয়তো কেঁচে

যাবে সব, ছি ছি করবে সবাই বাংলাদেশকে।'

হাত তুলল এক কমান্ডো। 'একটা প্রশ্ন।'

'বলুন,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এই দুই সাংবাদিক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? তাদের উদ্ধার করতে এতবড় ঝুঁকি কেন নিচ্ছি আমরা?'

'এর সাথে দেশের স্বার্থ গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, তাই নিচ্ছি,' ছড়ি সামনের টেবিলে রেখে সিধে হলো ও। 'কি স্বার্থ, তা ভালয় ভালয় ফিরে আসতে পারলে জানতে পাবেন সবাই, আজ নয়। তাছাড়া মিশন শুরুর সময় ভেতরের খবর যত কম জানা থাকবে, ততই লাভ। ওখানে কেউ ধরা পড়ে গেলে নির্যাতনের মুখে হয়তো ফাঁস করে দিতে পারে সে সব কথা। অজানা থাকলে সে ভয় থাকে না।'

বলা শেষ করে অন্যদের দেখল ও পালা করে। 'আর কোন প্রশ্ন?'

'আমরা কবে যাচ্ছি, স্যার?' বলল খাটোমত একজন। পিছনের সারিতে বসা সে, সামনের দুই দশাসইর জন্যে এতক্ষণ তাকে দেখাই যাচ্ছিল না।

'পাঁচদিন পর। প্ল্যানিঙের কিছু কিছু অংশ এখনও বাকি আছে। ওগুলো শেষ হলেই যাত্রা করব।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল কমান্ডোদের মধ্যে। ওদের দু'মিনিট সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল রানা। 'এবার অন্য প্রসঙ্গ। আমরা সবাই সবাইকে মোটামুটি চিনি, জানি। কিন্তু একসঙ্গে একই মিশনে কাজ করতে যাচ্ছি এই প্রথম, কাজেই আসুন, আরেকবার নতুন করে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত হই। জাস্ট ফরমালিটি। আমি মাসুদ রানা, টীম লীডার।'

প্রথম সারির বাঁ দিকের ছয় ফুটী দানবের দিকে তাকাল ও।

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। 'করপোরাল সদরউদ্দিন, স্যার।'

'মিশন কোয়ালিফিকেশন?' কেউ একজন পিছন থেকে প্রশ্ন করল।

'ট্রুপার।'

সে বসে পড়তে পরেরজন উঠল। ছোটখাট, হাসিখুশি মানুষ। সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে মুখে। 'আলালউদ্দিন খান পাঠান। কমিউ...'

'তালেবান না তো?' কে যেন বলল চাপা গলায়। মৃদু হাসি ফুটল সবার মুখে। হাসি আড়াল করতে নাকের নিচটা চুলকাল রানা। মাথা ঝাঁকাল তার উদ্দেশে, 'কথা শেষ করুন।'

'কমিউনিকেশনস। টাইগার নামে পরিচিত ছিলাম চাকরিতে।'

'সীট ডাউন, পুসি ক্যাট,' আরেকজন মন্তব্য করল।

তার পাশেরজনকে দেখল রানা। এ আরও ছোটখাট। যা উচ্চতা, তাতে আর্মিতে ভর্তি হতে পারার কথা নয় মানুষটার। কিন্তু তবু যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার জন্যে কমান্ডো বাহিনীতে জায়গা পেয়েছে। ড্রাইভিঙে মহাওস্তাদ। আনআর্মড কমব্যাটে তুলনাহীন।

'ট্রুপার হেকমত আলি, স্যার। ড্রাইভার,' বলে বসে পড়ল সে।

পরের দু'জন দুই সার্জেন্ট। দু'জনেই এক্সপার্ট 'কপ্টার পাইলট। মো. শহীদ ও জাফর আহমদ। বিশেষ যোগ্যতা: তিন-চারটে ভাষার সাথে পশুতুতেও অনর্গল কথা বলতে পারে দু'জনেই।

পরের সারির প্রথমজন আরেক এক্সপার্ট ড্রাইভার, ফয়েজ মোহাম্মদ, করপোরাল। লোকটা বিশালদেহী, যেমন লম্বায়, তেমনি পাশে। এরপর উঠল এক লম্বা, তালপাতার সেপাই। প্রেসিডেন্টের

গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য ছিল সে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, নাম খন্দকার জাহাঙ্গীর। তার আগের চাকরি জীবনে সিনিয়র নার্স ছিল, বিভিন্ন আর্মি হসপিটালেও কাজ করেছে। মোটামুটি ডাক্তারী জানে।

এরপর ক্যাপ্টেন কামাল ও তার তিন সঙ্গী। সার্জেন্ট হুমায়ুন আহমদ, এবং দুই করপোরাল–আহসান হাবিব ও মইনুল হোসেন। এরা প্রত্যেকে গেরিলা ফাইটার। ক্যাপ্টেন আর সার্জেন্টের অতিরিক্ত যোগ্যতা, আন্ডারওয়াটার অপারেশনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তারা।

'অলরাইট, জেন্টলমেন,' পরিচিতি পর্ব শেষ হতে রানা বলল। 'পরস্পরকে চেনার সুযোগ পরে আরও পাচ্ছি আমরা। এখন থেকে মিশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রি-অপ কনফাইনমেন্টে থাকবেন আপনারা।

'আমাদের বারোজনের দলটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি আমি। আমি, পাইলট শহীদ আর জাফর, এবং আলালউদ্দিন থাকছি জেলখানায় হামলা করে সাংবাদিক যুগলকে বের করে আনার দায়িত্বে। এই দলে আমরা তিনজন পশতু জানি মোটামুটি, সময়মত ভাষাটা কাজে লাগবে ওখানে।'

আসল দলে থাকতে পারছে না জেনে অবশিষ্ট আটজনের চেহারায় খানিকটা হতাশা ফুটল। অন্য তিনজন খুশি, পরস্পরের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল তারা।

'করপোরাল সদরউদ্দিন ডাক্তার খন্দকার জাহাঙ্গীর এবং ফয়েজ ও বরকতকে নিয়ে ব্যাক-আপ টীমের নেতৃত্বে থাকবে। যদি জিম্মিরা অসুস্থ থাকে, ওরা তাদের দেখাশুনো করবে ফিরতি পথে। দুই ড্রাইভার, আলাল আর ফয়েজ মোহাম্মদের কাজ হবে মিশন শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা। আর যদি এক আধটা কপ্টার দখলের সুযোগ

পাওয়া যায়, দুই পাইলট তখন কাজে আসবে।

'ক্যাপ্টেন কামাল এবং তার দলের সদস্যদের সঙ্গে নেয়ার কারণ হচ্ছে, হয়তো শেষ সময়ে বিকল্প এস্কেপ রুট, সাগর হয়ে পালাতে হতে পারে আমাদের। তখন তাদের সাহায্য দরকার হবে।

'কাল থেকে শুরু হবে আমাদের আসল প্রস্তুতি। অস্ত্র প্রশিক্ষণ কোর্স, আন-আর্মড কমব্যাটের ব্রাশ-আপ কোর্স, ড্রাইভিং ইত্যাদি। সবশেষে মক-আপ ট্রেনিং। তাশকুরগান জেলখানার মডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা করছি পরশু কমপ্লিট হবে ওটা।'

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'ওয়েল, জেন্টলমেন, দ্যাট'স অল। কাল ভোর চারটায় প্যারেড গ্রাউন্ডে দেখা হবে। নাস্তার আগে পাঁচ মাইল ধীরগতির দৌড়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে আমাদের আসল অধ্যায়।'

'অপারেশন থান্ডারবোল্ট' টীমের প্রথম ব্রীফিং শেষ হলো।

পরের চারদিন আর্মি এঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যদের ছবি দেখে তৈরি হুবহু নকল তাশকুরগানকে ঘিরে একটানা ক্লোজ মক-আপ কমব্যাট ট্রেনিং চলল রানার নেতৃত্বে। অনেক দূর দিয়ে পুরো এলাকা কর্ডন করে রাখল আর্মি, গ্রামবাসী কাছে ঘেঁষতে পারল না। দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দলটার অনুশীলন দেখল তারা। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে-বেপথে মরুভূমির ক্যামোফ্লেজ রঙা দুটো ল্যান্ড রোভারের পাগলের মত ছোটাছুটি দেখল।

পঞ্চম দিন ভোরে আরও অবাক হলো তারা কর্ডন নেই দেখে। কেউ নেই সেখানে, কিচ্ছু নেই। সব হাওয়া হয়ে গেছে।

চিরুনি থেমে গেল হামিদা গুলিস্তানীর। সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী সে।

চমৎকার পটলচেরা চোখ। হাসিতে মুক্তো ঝরে। ঘুরে তাকাল ভাইয়ের দিকে। 'কি বললে, ওদের সরিয়ে ফেলা হবে?'

মাথা ঝাঁকাল দাউদ। সতেরোর মত বয়স তার, থুত্‌নিতে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা দাড়ি। তালেবান গার্ড বাহিনীর সদস্য। 'হ্যাঁ। তাই তো শুনছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'বাঘলান।'

ঘুরে আবার আয়নায় নজর দিল হামিদা। জিভের ডগায় আরও অসংখ্য প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু মুখ খুলতে সাহস হলো না। সন্দেহ করে বসতে পারে দাউদ। বড় ইঁচড়ে পাকা ছেলে। হামিদাকে তো পাত্তা দেয়ই না, বড়বোন ফাহমিদাকে পর্যন্ত না। দ্বিগুণ বয়সী ফাহমিদার সাথেও সুযোগ পেলেই সমানে মুখ নাড়ে।

ওই দুই সাংবাদিকের বিষয়টা নিয়েও ইদানীং খুবই বাড়াবাড়ি করছে। ও জানে হামিদা বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করে, তাই সুযোগ পেলেই তাই নিয়ে খোঁচায় ওকে। যেন দুই বাংলাদেশী অপরাধ করলে সে-ও অপরাধী হয়ে গেল, এমন ভাব করে। ওই ব্যাপারে নাকি লজ্জায় বন্ধুদের সামনে মুখ দেখাতে পারে না দাউদ।

শুনে গা জ্বলে গেছে হামিদার। জবাবে বলেছে, যে সেয়ানা ভাই বোনের রোজগারের অন্ন ধ্বংস করে, তার আবার লজ্জা আছে নাকি?

তাতেও শিক্ষা হয়নি। মুচকি মুচকি হাসে আর খোঁচাখুঁচি করে।

চুল বাঁধা শেষ করে বড় একটা চাদর গায়ে-মাথায় জড়াল হামিদা। 'কবে সরাচ্ছে ওদের?' যেন গুরুত্ব নেই, জবাব দিলে চলে, না দিলেও চলে, এমন ভাবে করল প্রশ্নটা।

'শুনেছি কাল-পরশুর মধ্যে।' দুষ্টামির হাসি ফুটল দাউদের মুখে। 'এত প্রশ্ন করছ কেন, বয়ফ্রেন্ডকে জানাতে হবে?'

রেগে উঠল মেয়েটি। বাংলাদেশ দূতাবাসে জালাল নামে নতুন একটা স্টাফ এসেছে পাকিস্তান থেকে 'বদলি' হয়ে। বেচারা নতুন, কিছু চেনে না কাবুলের, তাই দুদিন তাকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিল ও। একদিন কিছু সময়ের জন্যে পার্কেও বসেছিল, দূর থেকে দেখে ফেলে দাউদ। ব্যস্, সেদিন থেকে সুযোগ পেলেই তাকে নিয়ে বিরক্ত করে আসছে ওকে।

ঠাণ্ডা গলায় বলল হামিদা, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি ও আমার বয়ফ্রেন্ড নয়, দাউদ। এক কথা বারবার শুনতে ভাল্লাগে না।'

মিথ্যে বলল-ও। আসলে ভাল লাগে। ওরকম এক স্মার্ট ছেলে-বন্ধু তার আছে, ভাবলেই অদ্ভুত এক শিহরণ জাগে দেহমনে। ছেলেটা বিদেশী, পশতু অল্প বোঝে, এই যা। নইলে যে কোন আফগান যুবকের থেকে হাজারগুণে ভাল। কি ভেবে আরক্ত হলো হামিদা গুলিস্তানী। নিজের দুর্বলতার কথা ভালই জানে। প্রথম প্রথম জলিলের চোখে চোখ রেখে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারত ও, ইদানীং পারে না। কেন যেন আপনা থেকেই নত হয়ে যায় দৃষ্টি। কেন? হামিদা দুর্বল হয়ে পড়ছে? দাউদ সেদিন প্রথম হাসতে হাসতে ওকে তার বয়ফ্রেন্ড বলেছিল, সেদিন থেকেই এই পরিবর্তন এসেছে ওর মধ্যে। এর মানে কি? ও নিজেও কি মনে মনে…?

হাতব্যাগ তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল হামিদা। কাজে যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'আম্মা, আমি যাচ্ছি!'

তিন

জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট।

বিশাল হ্যাঙ্গারের একেবারে ভেতরদিকে দাঁড়িয়ে আছে এক আমেরিকান ট্রান্সপোর্ট বিমান, হারকিউলিস সি-১৩০। তিনদিন আগে গভীর রাতে এসেছে ওটা, এসেই যে নাক সেঁধিয়েছে হ্যাঙ্গারে, আর বের হওয়ার নাম নেই।

গত তিনদিন ধরে হ্যাঙ্গার ঘিরে রেখেছে একদল মানুষ। সাদা পোশাকে আছে তারা, কিন্তু চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সাধারণ নয়। গ্রাউন্ড ক্রুদের ধারণা ওরা আর্মি। বিশেষ পাস না থাকলে হ্যাঙ্গারে লাট-বেলাট কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না লোকগুলো। কাছেই ঘেঁষতে দেয় না।

বিমানের হাতে গোনা কয়েকজন গ্রাউন্ড ক্রু আর টেকনিশিয়ান জানে ভেতরে কি চলছে। আর্মিদের কাজে সাহায্য করছে বলে জানে তারা। কাজ বলতে মূল ছিল বিমানটার সমস্ত মার্কিং মাস্কিং টেপ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রং স্প্রে করাসহ টুকটাক কিছু টেকনিক্যাল জব। সে সব শেষ, ওটা এখন টেক্-অফের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। ভাসা ভাসা শোনা যাচ্ছে সন্ধের পর যাত্রা করবে হারকিউলিস। কোথায়, আল্লা মালুম।

ওটা সম্পর্কে এত রাখ-ঢাক কেন, সে ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু জানা যাচ্ছে না বলে বন্দরের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে নানা

জল্পনা-কল্পনা চলছে। চারদিকে গুজগুজ ফিসফিস।

সন্ধের পর সত্যি ডানা মেলল হারকিউলিস, আরও অজস্র গুজবের জন্ম দিয়ে পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

চট্টগ্রাম।

শহরতলির এক বাড়ির ড্রইং রুমে বসে আছে স্তম্ভিত মাসুদ রানা। মিশনের অন্য এগারোজনের অবস্থাও প্রায় এক। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের দিকে।

ওদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন বৃদ্ধ, কিন্তু একটু আগে ঢাকা হয়ে যে খবর এসেছে, তাতে তিনিও বোকা হয়ে গেছেন। কাবুল থেকে বিসিআই এজেন্ট জলিল খবর পাঠিয়েছে ডন আর যূথীকে তাশকুরগান থেকে সরিয়ে বাঘলান শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেন, জানা যায়নি।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল রানা। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে যাত্রাটা অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়া হোক, স্যার।'

চোখ কুঁচকে নিভে যাওয়া পাইপের দিকে তাকালেন তিনি, মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে বললেন, 'তা ছাড়া আর উপায় কি? আমি ঢাকায় গিয়ে দেখি বাঘলানের কিছু ছবির ব্যবস্থা করি।'

মাথা দোলাল রানা। মাথার মধ্যে ঘুরছে রিভাইজড্ অপারেশনাল প্ল্যান তৈরির চিন্তা। পরের চারদিন খাগড়াছড়ির মানুষ আবার দেখল সেই কর্ডন, সেই মহড়া। তবে এবার ওরা যে ভবনকে কেন্দ্র করে দৌড়ঝাঁপ করল, সেটা আগেরটার মত নয়, অন্যরকম। অনেক ছোট।

চারদিন পর আবার সব হাওয়া। এই কদিন পতেঙ্গা বিমানবন্দরের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকল হারকিউলিস সি-১৩০। এখানেও কাউকে ওটার ধারে ঘেঁষতে দেয়া হলো না। ফল যা হওয়ার তাই হলো, হাজারো গল্প জন্ম নিল এখানেও।

সেদিন অফিসে অনেক চেষ্টা করেও কাজে মন বসাতে পারল না হামিদা। জরুরী কিছু চিঠি টাইপ করা দরকার ছিল। কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে বারবার। একসময় বিরক্ত হয়ে কাজ বন্ধ করে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল ও, অধৈর্য হয়ে রাষ্ট্রদূতের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকল।

কি এক জরুরী কাজে বাইরে গেছেন তিনি, অফিসে এসে পায়নি সে। জালালও নেই, কেউ জানে না কোথায় গেছে সে। প্রায় দুপুর হয়ে এল, এখন পর্যন্ত অমন দামী খবরটা কাউকে দিতে পারল না বলে ভেতরের ছট্‌ফটানি ক্রমে বেড়েই চলেছে। অবশেষে দুটোর সময় ফিরল জালাল। ওর সাথে চোখাচোখি হতে এমন এক হাসি দিল, বুকটা ধড়ফড় করে উঠল হামিদার।

দুই গোলাপী গাল রাঙা হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'জরুরী কথা আছে আপনার সাথে।'

ওর ডেস্কের পাশে দাঁড়াল যুবক। এক কোণে রাখা সেদিনের চিঠিপত্র তুলে নিজের নামের কাল্পনিক চিঠি খুঁজতে খুঁজতে চাপা গলায় বলল, 'কি?'

মুখ খুলতে গিয়েও সামলে নিল মেয়েটি। রুমে আরও কিছু আফগান মেয়ে-পুরুষ কর্মচারী রয়েছে, ওদের অনেকেই তাকাচ্ছে থেকে থেকে। বিশেষ করে মেয়েরা। কাশির ছলে মুখ আড়াল করল হামিদা। 'অফিসের পরে, ছ'টায়। পার্কে।'

চিঠিগুলো সাজিয়ে রেখে চলে গেল যুবক। সময়মত পার্কের

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসল। আগে একদিন তাকে এখানেই নিয়ে এসেছে হামিদা। ব্যস্ত রাজপথের পাশে জায়গাটা। কিন্তু গাছপালা এত ঘন যে বিশ হাত দূরের রাস্তা থেকেও ভালমত দেখা যায় না। বেঞ্চে বসল জালাল, কয়েকদিনের বাসি ইয়া পুরু এক লন্ডন টাইমস্ মেলে ধরল চোখের সামনে।

দশ মিনিট দেরিতে পৌঁছল মেয়েটি। ওর বড় বড় চোখ সব সময় হাসে, কিন্তু এ মুহূর্তে হাসছে না। মনে হচ্ছে কোন কারণে ভয় পেয়েছে। একই বেঞ্চের আরেক মাথায় আড়ষ্ট হয়ে বসে পড়ল সে, ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে দু'হাতে শক্ত করে ধরল। বেশ নার্ভাস লাগছে ওকে।

'কি হয়েছে, হামিদা?' কাগজে মুখ আড়াল করে মৃদু গলায় বলল জালাল। 'ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে? এখানে কেন আসতে...'

'আপনার দেশী সাংবাদিক...ওদের সরিয়ে ফেলা হচ্ছে কাবুল থেকে,' হড়বড় করে বলল সে।

চমকে উঠল যুবক। 'কি বলছ?'

'হ্যাঁ। আজই খবর পেয়েছি আমি।'

'সে কি!' কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করার ক্ষমতা তালগোল পাকিয়ে থাকল তার। 'কবে, কখন সরিয়ে নেয়া হবে?'

'সঠিক জানি না, তবে শুনেছি দুই-এক দিনের মধ্যে।'

'কোথায়...?'

'বাঘলানে।'

কিছু সময় ভাবল জালাল। শহরটা কাবুলের দেড়শো মাইল সোজা উত্তরে, কান্দুজ নদীর পুব তীরে। দুই শহরের মাঝ দিয়ে লম্বালম্বি পুবে চলে গেছে সাড়ে চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু হিন্দুকুশ পর্বতমালার আফগান অংশ। ওখান থেকে উত্তরে রুশ বর্ডার, পুবে পাকিস্তান বর্ডার। দুটোই বেশ কাছাকাছি।

'বাঘলানে কোথায়?'

'একটা সুরক্ষিত বাড়িতে। তালেবান গার্ডরা পাহারা দেয় বাড়িটাকে।'

তাও ভাল, জালাল ভাবল। অন্তত তাশকুরগানের থেকে অনেক সহজে কাজ উদ্ধার করা যাবে ওখানে। যদিও তার জানা নেই ঢাকায় কি চলছে, কি পরিকল্পনা করছেন রাহাত খান। তবে ধারণা করছে, এখানে যখন কূটনীতিকের ছদ্মপরিচয়ে পাঠানো হয়েছে তাকে, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে এবং প্রতিটা খবর যথাসময়ে ঢাকায় রিলে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন কিছু না কিছু নিশ্চয়ই ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো কমান্ডো হামলা চালিয়ে...

চিন্তার গাড়ি থামাল সে। 'বাড়িটা কোথায় জানো?'

মাথা দোলাল হামিদা। 'না। তবে জেনে নেব।'

'খুব সাবধান, কোন বিপদ বাধিয়ে বোসো না যেন।'

'জালাল?'

'বলো।'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন?'

'অফিসে আজ কোলিগরা ঘন ঘন তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ওদের চাউনি সন্দেহজনক মনে হয়েছে।'

চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল যুবক। এর অর্থ খুব সোজা। হামিদা সন্দেহের তালিকায় পড়ে গেছে। এখন ওর সাহায্য নিতে গেলে মেয়েটাকে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ফেলা হবে। নিজেকেও। 'তাহলে এখন সতর্ক হতে হবে আমাদের। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, হামিদা। যথেষ্ট সাহায্য করেছ তুমি, আর দরকার নেই। আমার সাথে তোমার আর দেখা না হওয়াই ভাল।'

বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন খালি খালি লেগে উঠল

হামিদার, মনে হলো বহু মূল্যবান কি যেন একটা হারিয়ে ফেলল এইমাত্র। সরাসরি জালালের মুখের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

কপাল কুঁচকে উঠল যুবকের। 'কেন?'

'কারণ...কারণ আমি...আমি...' থেমে গেল হামিদা। উপযুক্ত ভাষা হয়তো খুঁজে পায়নি, অথবা হয়তো পেয়েও লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারেনি। কিন্তু তাতে জালালের ব্যাপারটা টের পেতে দেরি হলো না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পত্রিকা গোটাতে শুরু করল সে। 'হামিদা, যদি কিছু সন্দেহ করে আমাদের অ্যারেস্ট করে বসে ওরা, তোমার সাহায্য কোন...' হঠাৎ গলা বুজে গেল ওর একদল তরুণের ওপর চোখ পড়তে। প্রায় আট-দশজন, চোদ্দ থেকে সতেরো-আঠারোর মধ্যে বয়স। দৈর্ঘ্য যাই হোক, দাড়ি আছে সবার গালে। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের চারপাশে ঘুরঘুর শুরু করেছে। ওদের চেহারায় ঝামেলা বাধানোর সুস্পষ্ট আভাস দেখতে পেল জালাল। 'উঠে পড়ো!' মুখের পাশ দিয়ে বলল, 'হামিদা, গেট আপ্! জলদি কেটে পড়ো এখান থেকে!' কথার ফাঁকে হাত চলছে, পত্রিকাটাকে টাইট করে পেঁচিয়ে ভারী, নিরেট এক ব্যাটন বানাচ্ছে।

মেয়েটি দেখল ওদের, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'দাউদ!'

'কে?'

'আমার ভাই!'

হতভম্ব চেহারা হলো যুবকের। 'তোমার...কোনটা?' ওর নির্দেশ করা আঙুল অনুসরণ করে দাউদকে দেখল চোখ কুঁচকে। 'সঙ্গে ওরা কারা, বন্ধু?'

'জানি না। আগে কখনও দাউদের সঙ্গে দেখিনি ওদের।' গলা

কাঁপছে হামিদার, ভাইয়ের সীমাছাড়া অসভ্য আচরণ দেখে রেগে আগুন হয়ে গেছে। 'ওরা...ওরা মনে হয় তালেবান!'

'সব্বোনাশ, জলদি ভাগো! আমি পরে দেখা করব।'

'কিন্তু...'

'শাট আপ্!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও।

একই সঙ্গে তরুণদের একজন চেঁচিয়ে ডাকল জালালকে। 'অ্যাই, বাংলাদেশী হারামজাদা! এদিকে এসো, আলাপ করি।'

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল জালাল। তরুণকে দেখে রিংলীডার মনে হলো। এক হাত কোমরে রেখে আরেক হাতে কাছে ডাকছে। ভাবখানা এমন, যেন তাতেই ও কৃতার্থ হয়ে এগিয়ে যাবে। ব্যাটার কোথায় প্রথম মারটা লাগাবে, কত ওজনের, মনে মনে হিসেব কষতে লেগে গেল জালাল। কাগজের ব্যাটনের এক প্রান্ত শক্ত মুঠোয় ধরে বসে আছে। অল্প অল্প দোলাচ্ছে দুই ফুটী ব্যাটন, ওজন বুঝে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। ওদিকে ডাকটা কানে আসামাত্র আর দেরি করেনি হামিদা, ঘুরে পার্কের গেটের দিকে এগোতে শুরু করেছে ব্যস্ত পায়ে। বারবার উদ্বিগ্ন চোখে ঘুরে তাকাচ্ছে।

'কি হলো?' রিংলীডার বলে উঠল। 'এসো না, কথা বলি!'

'কি কথা, আফগান পিগ?' বলে উঠে পড়ল ও, অনর্থক ঝামেলা এড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে, তাই হাঁটতে শুরু করল হামিদার পিছন পিছন।

'অ্যাই ব্যাটা, যাচ্ছিস কোথায়?' চেঁচিয়ে বলল তরুণ। 'এদিকে আসতে বলছি কানে যায়নি?'

না শোনার ভান করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হলো না। ও ভয় পেয়েছে ভেবে ছুটে এল কয়েকজন, দাউদও আছে তার মধ্যে। সবাই একযোগে চ্যাঁচাচ্ছে উত্তেজিত গলায়। সময়মত দাঁড়িয়ে পড়ল জালাল, ঘুরে দাঁড়াল। চেহারা স্বাভাবিক রেখে

বলল, 'কি হয়েছে?'

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল তাকে ছেলেগুলো। লীডার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, এক হাত পিছনে। একটা দেড় ইঞ্চি ডায়ার দুই ফুট লম্বা জিআই পাইপ ধরা আছে সে হাতে। 'বলছিলাম, এসো, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে দুয়েকটা তালিম দিই তোমাকে,' বলল সে।

জালাল হাসল মিষ্টি করে। 'তাই? খুব ভাল কথা, পুণ্যের কথা। কিন্তু তুমি নিজে জানো "ইসলাম" শব্দের অর্থ কি?'

বোকাসোকা, মানসিক প্রতিবন্ধীর মত হে-হে করে হেসে উঠল সে দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে। সঙ্গীদের দিকে তাকাল 'ব্যাটা বলে কি!' ধরনের চেহারা করে। 'কেন জানব না? "ইসলাম" হচ্ছে গিয়ে...ইয়ে...মানে...'

'বুঝেছি,' হাত তুলে বাধা দিল জালাল। 'বিদ্যে পেটের বাইশ হাত নাড়িভুঁড়ির সাথে জড়িয়ে গেছে, বোমা মারলেও কোনদিন বের হবে না। সরো, যেতে দাও।'

'কি?'

'বোঝোনি?' পিছনে লঘু পায়ের শব্দ শুনে তৈরি হলো ও। 'গুড! তাহলে এবার অন্য ভাষায় বলছি, দেখো তো বোঝো কি না!' পরক্ষণে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'বলছি পথ ছাড়, শুয়োরের বাচ্চারা!'

একই সাথে লীডারের পাঁজর সই করে ব্যাটন চালাল গায়ের জোরে। ভারী, নিরীহদর্শন জিনিসটা দড়াম করে জায়গামতই পড়ল, মট্ মট্ করে দুটো রিব ভেঙে গেল তার। সময় নষ্ট করল না জালাল, পরক্ষণে চর্কির মত ঘুরেই আবার চালাল ওটা। পিছনে তিন হাতের মধ্যে এসে পড়েছিল একজন, পাইপ ছিল এর হাতেও। তুলতে যাচ্ছিল, এই সময় ওর রিফ্লেক্স দেখে জমে গেল

সে, অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। কিছু করার কথা ভাবার সময় পেল না ছেলেটা, আকাশ ভেঙে পড়ল বাঁ কানের ওপর। চাপা কট্ শব্দে জায়গা ছেড়ে সরে গেল চোয়ালের হাড়, চেহারা ত্যাড়া হয়ে গেল। পাইপ ছেড়ে মুখ চেপে ধরে দু'পা পিছিয়ে গেল সে।

জালাল চক্কর বন্ধ করল না, ওর ওপরই আরেকটু ঘুরে তৃতীয়জনের নাকে বসিয়ে দিল এক ঘুসি। পলকে পাকা টম্যাটোর মত থেঁত্‌লে গেল ওটা, দুই ফুটো দিয়ে সবেগে বেরিয়ে এল রক্তের দুটো ধারা। পরেরজন চোখের সামনে ওর অবিশ্বাস্য তাণ্ডব নৃত্য দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জমে গেছে জায়গায়।

হাতে ছুরি থাকতেও কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে ফেলল এক মুহূর্ত। সুযোগটা ষোলো আনাই নিল জালাল, ব্যাটনের মাথা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মেরে তার ডান চোখটা খুলির তিন ইঞ্চি ভেতরে সেঁধিয়ে দিল।

তারপর থামল যথেষ্ট হয়েছে ভেবে। হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকা দেহগুলো দেখে চুক্ চুক্ করে আফসোস প্রকাশ করল। বাকি ছয় তরুণ তখন পিছাচ্ছে, প্রত্যেকের নজর জালালের ওপর সেঁটে আছে বলে এ ওর পায়ে বাড়ি খেয়ে ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে, আছাড় খাচ্ছে। পরক্ষণে উঠে পড়ছে তড়াক্ করে।

শ্রাগ করে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল জালাল। 'কাউকে কিছু শেখাতে হলে আগে নিজেকে ভালমত শিখে নিতে হয়, বুঝলে? পরেরবার এই ভুল আর কোরো না। চলি, খোদা হাফেজ!'

ধীর পায়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল সে।

রিসিভার রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল আফগান ইন্টারনাল সিকিউরিটি চীফ, কর্নেল নাজাফ মুরাদ। চেহারায় গভীর সন্তুষ্টি।

দুই বাংলাদেশী সাংবাদিকের ব্যাপারে ব্যবস্থা পাকা।

অবশেষে মোল্লা বরকতীর বিরুদ্ধে জয় হয়েছে তার। সেদিনের মক এগজিকিউশনের ফল শূন্য হওয়ায় ভীষণ খেপে গিয়েছিল ব্যাটা, সত্যি সত্যি মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওদের, মুরাদ তা ঠেকিয়ে দিয়েছে। সরাসরি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে তাকে বুঝিয়েছে, অপরাধ প্রমাণ না হতে মেরেই যদি ফেললাম, তাহলে ওদের পিছনে এতদিন সরকারের পয়সা আর খানা কেন অপচয় করলাম?

প্রেসিডেন্টও মোল্লা, তবে ঘটে বিচারবুদ্ধি কিছুটা হলেও রাখেন। তার কথায় ঝামেলার গন্ধ পেয়ে কি করে সমস্যার সমাধান করা যায়, ভাবতে বসে গেলেন। বরকতী তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী। পরীক্ষিত চামচা, তাকে অসন্তুষ্ট করতে চান না তিনি, মুরাদের মত এক যোগ্য অফিসারকেও অসন্তুষ্ট করতে চান না। জানতে চাইলেন, তার কি ইচ্ছে।

বলল মুরাদ। ডন এবং তার স্ত্রীর বিচার স্থগিত রেখে ওদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তার ওপর ছেড়ে দেয়া হোক, সাতদিনের জন্যে। এই ক'দিন কেউ তার সিদ্ধান্তে নাক গলাতে পারবে না। সাতদিন পর ওদের দু'জনের স্বীকারোক্তিসহ প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবে মুরাদ।

রাজি হয়েছেন তিনি অবশেষে। বরকতীকে একটা কিছু বলে এই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখবেন কথা দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত মনে মনে আগেই নিয়ে রেখেছিল মুরাদ, অনুমতি পাওয়ামাত্র তা কাজে পরিণত করতে উঠেপড়ে লাগল। তালেবান গার্ড হয়েও বরকতীর চেয়ে তারই প্রতি বেশি অনুগত আলি ও ইরাজকে জানিয়ে দিয়েছে পরিকল্পনা।

ড্রয়ার থেকে নতুন এক প্যাকেট আমেরিকান কেন্ট সিগারেট

বের করে একটা ধরাল কর্নেল। তালেবান শাসিত আফগানিস্তানে এ জিনিস নিষিদ্ধ হলেও তার পেতে কখনও অসুবিধে হয় না। নিয়মিত পায় সে–সিগারেট, দামী দামী আমেরিকান-ব্রিটিশ পানীয়, সব। পরপর কয়েক টান দিয়ে ডানদিকের IN ট্রের ফাইলের স্তূপের দিকে তাকাল। অনেক জমে গেছে।

অলস ভঙ্গিতে ওপরের ফাইলটা তুলে সামনে রাখল সে, ওপরের টাইপ করা লেবেল পড়ল। ওখানে লেখা আছে: হামিদা গুলিস্তানী, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ দূতাবাস, কাবুল, বয়স ২০। কি ভেবে মুখ ভ্যাঙচাল কর্নেল, জায়গায় রেখে দিল ফাইল। পরে দেখা যাবে, ভাবল মনে মনে। এখন সময় নেই, এর চেয়ে জরুরী কাজ পড়ে আছে, আগে সেদিকে নজর দেয়া দরকার।

পতেঙ্গা বিমান বন্দর। তিনদিন পর।

স্কোয়াড্রন লীডার কাজী আনিসুজ্জামান ধ্যানমগ্নের মত বসে আছে দৈত্যাকার হারকিউলিস পরিবহন বিমানের ফ্লাইট ডেকে। শেষবারের মত পাওয়ার চেক সেরে নিচ্ছে। এয়ারফোর্সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ পাইলট ছিল সে, বর্তমানে বিমানের পাইলট। দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করে। কয়েকদিনের জন্যে তাকে ধার নিয়েছে বিসিআই।

রাত এগারোটা। চাঁদের আলো ছাড়া চারদিক অন্ধকার। সন্ধের পরপরই সমস্ত আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে বন্দরের। তার আগে, বিকেলে, সমস্ত সিভিল কর্মচারীকে বিশেষ ছুটির নামে ভাগিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। 'বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণের' কথা বলে আর্মি টেক আপ করেছে বন্দরের দায়িত্ব।

দশ ফুট নিচে গাঢ় রঙের টিউনিক পরা চার-পাঁচটা দেহের কাঠামো দেখতে পেল কাজী আনিস। রানওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে

ককপিটের দিকে চেয়ে আছে। প্লেনের ল্যান্ডিং লাইটের আলোয় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। চিন্তিত। কিছু নিয়ে আলোচনা করছে জরুরী ভঙ্গিতে।

এরমধ্যে 'অপারেশন থান্ডারবোল্টে' কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ক্যাপ্টেন কামাল ও তার তিন সঙ্গীকে বাদ দেয়া হয়েছে রিভাইজড্ প্ল্যানে। মূল দলের সাথে ওরা নেই। অন্য পথে রওয়ানা হয়ে গেছে তিন দিন আগেই। নৌ-বাহিনীর এক গানবোট নিয়ে শ্রীলঙ্কা চলে গেছে তড়িঘড়ি আয়োজন করা 'শুভেচ্ছা সফরে'। আগের যে বিকল্প এস্কেপ প্ল্যান ছিল, ওটা একটু অন্যভাবে সাজানো হয়েছে বলে এই পরিবর্তন।

কো-পাইলটের দিকে তাকাল আনিস। হাসল চওড়া হাসি। চল্লিশের মত বয়স লোকটার, তার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। এক্স ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, সরোয়ার। যথেষ্ট অভিজ্ঞ পাইলট, কিন্তু এ ধরনের মিশনে এই প্রথম। সে-ও তাকাল, পাল্টা হাসি দিল, তবে নিষ্প্রাণ। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে ফল কি হবে, সে কথা ভেবে উদ্বিগ্ন।

'র‍্যাম্প থ্রী এখনও একটু একটু সমস্যা সৃষ্টি করছে,' বলল সে বিড়বিড় করে। 'সময়মত খারাপ কিছু ঘটিয়ে না বসে।'

'গ্রাউন্ড ক্রুরা চেক্ করেছে ব্যাপারটা, তাই না?'

'তা করেছে, কিন্তু...' থেমে গেল সে রেডিওতে কল-সাইন শুনে।

'কন্ট্রোল টু আলফা পতেঙ্গা। ওয়ান ও সেভেন। কন্ট্রোল টু আলফা পতেঙ্গা...ওয়ান ও সেভেন। ইউ আর ক্লিয়ারড্ ফর টেক-অফ, ওভার।' থেমে গেল ক্যানকেনে ধাতব কণ্ঠস্বর।

শব্দ করে হেসে উঠল আনিস, ককপিটের গুমোট পরিবেশ কেটে গেল। 'গুড ইভনিং, কন্ট্রোল। দিস ইজ আলফা পতেঙ্গা।

থ্যাঙ্কস ফর ক্লীয়ারেন্স। নাউ, মে আই হ্যাভ সাম রানওয়ে লাইটস্, প্লীজ?'

হাসি শোনা গেল জবাবে। 'রজার, আলফা পতেঙ্গা।' পরমুহূর্তে হারকিউলিসের নাকের সামনে এক সঙ্গে জ্বলে উঠল তিন সারি দীর্ঘ, নীল ফায়ারফ্লাই। 'খোদা হাফেজ। ওভার।'

'কাল নাশতার টেবিলে দেখা হবে, কন্ট্রোল। ওভার।'

'ও হ্যাঁ, ডিম কি ভাবে খেতে পছন্দ, আলফা পতেঙ্গা?'

'মাঝারি পোচ, আস্ত কুসুম ওপরে,' জবাব দিল কাজী আনিস।

'কাট্ ইট!' অন্য একটা গম্ভীর গলা বলে উঠল মাঝখানে। 'কড়া রেডিও সাইলেন্স মেনে চলুন, প্লীজ!'

'সরি। আলফা পতেঙ্গা রোলিং। আউট।'

একসার পাওয়ার লিভার সামনে ঠেলে দিল সে। হুঙ্কার ছাড়ল বিশাল চার অ্যালিসন টার্বো প্রপ, অল্পসময়ের মধ্যে ওগুলোর সম্মিলিত শক্তি আঠারো হাজার হর্স পাওয়ারে উঠে এল। কানে তালা লাগানো এঞ্জিন পিচ প্রবল বেগে ঝাঁকাতে শুরু করেছে ককপিট ডেকিং। সরোয়ারের দিকে তাকাতে বুড়ো আঙুল তুলে সঙ্কেত দিল সে, সামনে ঝুঁকে ব্রেক রিলিজ করল কাজী আনিস। গড়াতে শুরু করল সীল-ছাপ্পরবিহীন হারকিউলিস। রানওয়ে সেন্টারলাইন অতিক্রম করার সময় একবার, দু'বার ঝাঁকি খেল নোজহুইল, দুলে উঠল পুরো ক্র্যাফট।

তারপর হু-হু করে বাড়তে থাকল দৌড়ের গতি, দোল কমে এল। বাতাসের বুক ছিন্নভিন্ন করে সাঁই-সাঁই ঘুরছে প্রপেলর ব্লেড। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত আলাদা চেনা গেল প্রতিটা ফায়ারফ্লাইকে, তারপর আর সে উপায় রইল না, এক হয়ে তিনটে জ্বলজ্বলে মোটা দড়িতে পরিণত হলো ওগুলো।

'ভী ওয়ান,' রিপোর্ট করল সরোয়ার। দৌড়ের গতি নিরাপদ

ফ্লাইং স্পীড ১৩০ নটে উঠে পড়েছে। সময় হয়েছে। 'রোটেট।'

গতির তোড়ে নাক মনে হলো যেন উঁচু হতে শুরু করেছে হারকিউলিসের। কন্ট্রোল কলাম ধীরেসুস্থে পেটের দিকে টেনে আনল পাইলট, এইবার সত্যি সত্যি উঁচু হলো, এক সেকেন্ড পর হালকা এক ঝাঁকি প্রমাণ করল উঠে পড়েছে ওটা। তারপর আরেক ঝাঁকি–পিছনের লো স্লাং মেইন আন্ডার ক্যারিজও মাটির মায়া ছেড়েছে।

'গীয়ার আপ,' ভেরিফাই করল কো-পাইলট।

মাথা দুলিয়ে কন্ট্রোল কলাম পোর্টের দিকে খানিকটা ঘোরাল কাজী আনিস, দৈত্যাকার পাখা কাত হয়ে গেল, বাঁক নিতে শুরু করল হারকিউলিস। সোজা হতে অনেক নিচে ল্যান্ডিং লাইট দেখা গেল, এখন আবার আলাদা চেনা যাচ্ছে সবগুলোকে। ঢিলেঢালা মুঠোয় ধরা কন্ট্রোল চমৎকার কাজ করছে দেখে খুশি হলো সে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাগরে পৌঁছবে ক্র্যাফট, চাঁদের আলোয় চকচকে সারফেসের অনেক কাছ দিয়ে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর হয়ে অনেক পথ ঘুরে আফগানিস্তান যাবে। উপায় নেই, লং রেঞ্জ মিলিটারি রাডারের চোখ এড়াতে হলে বেশি ওপরে ওঠা যাবে না।

সাগরের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কাজী আনিসুজ্জামান। শুরু হয়ে গেছে অনিশ্চিত 'অপারেশন থান্ডারবোল্টের' বিপজ্জনক যাত্রা।

চার

বাঘলান।

ঝিম্ মেরে বসে আছে ডন সিদ্দিক। চোখ বোজা।

বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। শক্ত কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দু'হাত ব্যাক রেস্টের পিছনে এত মজবুত করে বেঁধে রাখা হয়েছে যে হাত কেটে বসে যাচ্ছে বাঁধন। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে, চেষ্টা করেও আঙুল নাড়াতে পারছে না। কতক্ষণ পর মনে নেই, জোর করে চোখ মেলল সে, সঙ্গে সঙ্গে মুখের সামনে ঝুলন্ত জোরাল বালবের আলো যেন ঘুসি মেরে বসল দু'চোখে।

মাথা ঝাঁকাল ডন। রুমের চারদিকে তাকাল ঘোর লাগা চোখে। তারপর আলোর পিছনে চেনা মুখগুলো আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। আছে, আলি এবং রিয়াজ বসে আছে ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত। মুখে তালা।

'কেন এভাবে অনর্থক বসিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে?' এক সময় না বলে পারল না ডন। 'কিছু বলছ না কেন তোমরা?'

'চুপ করে থাকো!' ওদের কেউ ধমকে উঠল। 'এখানে প্রশ্ন আমরা করব তুমি শুধু তার জবাব দেবে।'

'তাহলে বসে আছ কেন সঙের মত?' বিরক্ত হয়ে বলল ও। 'কোন্ ঘোড়ার ডিম প্রশ্ন করবে করছ না কেন?'

'অ্যাই ব্যাটা, চোপ্!' আলি বলল। 'কর্নেল সাহেব আসছেন। প্রশ্ন তিনি করবেন। উনি আমাদের বলেছেন তোমাকে বসিয়ে রাখতে, আমরা রেখেছি।'

হায় খোদা! ভাবল ডন, ওদের যখন গতকাল তাশকুরগান থেকে বের করে আনার আয়োজন চলছে, ও তখন ভেবেছে বুঝি মুক্তি দেয়া হচ্ছে। কী যে আনন্দ লেগেছিল! কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি লাগেনি। একটুপর যখন বদ্ধ প্রিজন ভ্যান ওদের নিয়ে রওয়ানা হয়, জেলগেটের গার্ডের সাথে কথা বলার সময় আলিকে কয়েকবার বাঘলান উচ্চারণ করতে শুনে যা বোঝার বুঝে ফেলেছে ডন। মুক্তি নয়, ওদের অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে ওর মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে সে অন্তত বরকতীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে। সেদিন রাতে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছিল হারামজাদা, তারপর থেকে ওর কথা ভাবলেও দেহে কাঁপুনি উঠে যেত। গলা-বুক শুকিয়ে উঠত।

এই শহরে আগে কয়েকবার এসেছে ডন পেশাগত কাজে। মোটামুটি চেনা। ছোট শহর। অধিবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই জনই দারিদ্র্যসীমার নিচে। মূল শহরকেন্দ্রে কয়েক কিলোমিটার পাকা রাস্তা আছে, বাকি সব নুড়ির কার্পেটিং করা অথবা কাঁচা। শহরের পুবদিক দিয়ে বয়ে গেছে কান্দুজ নদী।

নদী! ভাবল ডন, দাঁড়াও, এক মিনিট! আজ খুব ভোরেই না পানির কুলকুল আওয়াজ শুনেছে সে? হ্যাঁ, তাই তো! আধো ঘুম আধো জাগরণে স্রোতের মৃদু আওয়াজ শুনেছে ডন পরিষ্কার। ভুলেই গিয়েছিল। আবার ডানে-বাঁয়ে তাকাল। তার মানে কি এই বাড়িটা নদীর তীরে? এত বড় বাড়ি...কোনটা হতে পারে?

চোখ বুজে স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগল সে, শহরটার ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। বেশি সময় লাগল না, বুঝে ফেলল সাংবাদিক। নদীর খুব কাছে কয়েকটা বাড়িই আছে. তার মধ্যে

বড় মাত্র দুটো। একটা মুজাহেদীন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আহমেদ শাহ্ মাসুদের বড় বোনের স্বামীর, আরেকটা প্রধান মসজিদ। তার মানে এটা প্রথমটা! বুকের মধ্যে চাপা উল্লাস অনুভব করল সাংবাদিক।

প্রতিহিংসাপরায়ণ তালেবান সরকারের ভয়ে পালিয়ে পাকিস্তান চলে গেছে এ বাড়ির লোকজন, ডনের জানা আছে। তার মানে এটা...উচ্ছ্বাসের সল্‌তে নিভু নিভু হয়ে এল। না হয় নিশ্চিত হওয়া গেল বাড়ি সম্পর্কে, কিন্তু কি লাভ তাতে? সে খবর জেনে কি করবে সে? বন্দী অবস্থায় কি করার আছে?

আবার বোধহয় তন্দ্রার ঘোরে তলিয়ে গিয়েছিল, কানের কাছে কর্নেল মুরাদের, 'হ্যালো, ডন!' শুনে চমকে তাকাল। মুখের দেড় হাত সামনে তার হাসিমাখা চৌকো মুখটা দেখে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেল। 'কেমন আছেন?'

জবাব দিল না ও। কিছু সময় অপলক দেখল লোকটাকে, তারপর মুখ নামিয়ে চোখ বুজল।

'সে কি, ডন! পুরনো বন্ধুকে এভাবে স্বাগত জানানো...'

'বন্ধু!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

'অফ কোর্স, বন্ধুই তো!' হাসল মুরাদ। 'আপনি জানেন না, আর দু'দিন সময় পেলে বরকতী আপনাদের সত্যি সত্যি মেরে ফেলত। ব্যাপার টের পেয়েই না তাশকুরগান থেকে সরিয়ে আনলাম আপনাদের। আপনি যাই বলুন, ডন, এই দেশে যদি কোন বন্ধু আপনার থেকে থাকে, তো সে আমি। আমি চাই আপনারা নিরাপদে দেশে ফিরে যান। নতুন বিয়ে করেছেন, পরস্পরকে এখনও ঠিকমত জেনে-বুঝে উঠতে পারেননি। সে সুযোগ আমি করে দিতে পারি যদি আপনি মুখ খোলেন।'

'প্রথম থেকেই মুখ খোলা রেখেছি আমি...আমরা, কর্নেল।

কিছুই গোপন করিনি কারেমির। সে আমার হোটেলে গিয়েছিল, কিছু ডকুমেন্টস দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি নেইনি। ফিরিয়ে দিয়েছি।'

বাঁকা হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'কেচ্ছা শেষ?'

'হ্যাঁ।'

'অনেস্ট?'

'অনেস্ট।' কিন্তু মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে দু'চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সাথে, এবং ওইটুকুই চাইছিল কর্নেল। এই লাইনে বহুবছর কাটিয়েছে সে, মুখের সাথে চোখের ভাষার অমিল হলে কি বুঝে নিতে হয় জানে। ঝট্ করে সিধে হলো সে, আলি-ইরাজের উদ্দেশে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল, 'ওর বউকে নিয়ে এসো!'

'কেন?' প্রতিবাদ করতে গেল ডন। 'ওকে কেন...'

'শাটাপ্! যা জানতে চাইছি বলো, নয়তো বন্ধ রাখো মুখ।'

দুই মিনিটের মধ্যে যূথীকে প্রায় ঝুলিয়ে এ ঘরে নিয়ে এল দুই গার্ড। নিজের পায়ে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না ও, শক্তি পাচ্ছে না। ফোলা চোখের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চাউনি দেখলে বোঝা যায় ঘুমিয়ে ছিল, ডাকাডাকির কষ্টে না গিয়ে স্রেফ তুলে এনেছে ব্যাটারা। মনে যাই থাকুক, কর্নেল মুরাদের নির্দেশ পালনে কোনরকম শৈথিল্য দেখাতে রাজি নয় আলি বা ইরাজ।

ডনের মুখোমুখি আরেক চেয়ারে বসিয়ে ওর হাত-পা বাঁধা হলো। একজন আলো ঘুরিয়ে সরাসরি ওর মুখের ওপর স্থির করল। কাটাছেঁড়া ড্রিল শার্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে যূথীর উদ্ধত, ভরাট বুক। গলা-বুক বেয়ে স্বেদবিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে, দুই স্তনের মাঝখানের গভীর উপত্যকায় হারিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল মুরাদ। অন্যমনস্ক। আলি-

ইরাজের চোখে খাই খাই নজর। ওর ওই সম্পদ এত ভালভাবে দেখার সুযোগ এই প্রথম হয়েছে, চোখের মণি তাই নড়েই না।

কেন্টের একগাল ধোঁয়া সিলিঙের দিকে ছুঁড়ল কর্নেল। 'জিনিসটা নিয়ে এসো!'

তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল আলি, মিনিট পুরো হতে না হতে একই গতিতে ফিরেও এল লোহার তৈরি লাল বালতির মত কিছু একটা নিয়ে। গ্যালভানাইজড্ আয়রনের। 'এনেছি, কর্নেল।'

'ওদের সামনে ধরো। দেখতে দাও জিনিসটা কি।'

তাই করল সে। ভাল করে দেখল ডন, এবং ভুল ভাঙল। বালতি নয়, ওটা বিশেষ হেলমেট। চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত। ওটার কি কাজ, বুঝতে পেরে গায়ের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা।

সিগারেট মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল কর্নেল। 'চিনেছেন তাহলে? হ্যাঁ, আলেকজান্ডার দ্যুমার "দ্য ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক" উপন্যাসের সেই বিখ্যাত হেলমেটের আফগান সংস্করণ ওটা। খুব সাধারণ এক ডিভাইস, তবে ভারি কার্যকর। কল্পনা করুন ওটা এই খুবসুরাত মোহ্তারমার মাথায় বসিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটালে কি ঘটবে। ক্রমাগত ঘণ্টার মত আওয়াজ করবে ওটা। এত বিকট আওয়াজ, শুনতে শুনতে হয়তো শেষ পর্যন্ত চিরতরে বধির হয়ে যাবেন আপনার স্ত্রী।'

'হারামজাদা!' অসহায় রাগে অস্থির হয়ে উঠল ডন।

'কথা আদায়ের ইলেকট্রোড মেথডও কাজে লাগাই আমরা,' পাত্তা না দিয়ে বলে চলল মুরাদ। 'মেয়েদের বেলায় ওতে সুবিধে হয়। নিপ্‌লে অথবা ক্লাইটোরিসে··· বুঝলেন না?'

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে রাজধানীতে ফিরে এল কর্নেল। বেশ সন্তুষ্ট। প্রথমদিনেই বেশ খানিকটা এগিয়েছে কাজ। ঘাবড়ে

গেছে সাংবাদিক। আরেকটু চাপ দিলে আজই হয়তো মুখ খোলানো যেত, কিন্তু মুরাদ তা করেনি। আরও পাঁচদিন সময় আছে হাতে, অনর্থক ব্যস্ত হওয়ার কি দরকার?

বাড়ির গেটে যখন জীপ থেকে নামল সে, ঠিক সেই সময় বিশাল এক কালো ছায়া শ্রীলঙ্কা উপকূল ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগরে পড়ল, এক চক্কর দিয়ে উত্তরে চলল ওটা আরব সাগরের দিকে। পানির মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে আলফা পতেঙ্গা ফ্লাইট। থেকে থেকে এক আধটু ঝিলিক মারছে তারার আলোয়।

একসময় সহকারীর দিকে তাকালেন কাজী আনিস। 'অটোপাইলটের হাতে ব্যাটাকে সঁপে দেয়া গেলে ভাল হত, কি বলো? ক্লান্তি লাগছে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসল কেবল সরোয়ার। জবাবে বলল না কিছু।

ওদিকে পিছনে, ককপিট ডেক থেকে সামান্য নিচে প্রকাণ্ড পেটের এক জায়গায় বসে আছে আট সদস্যের থান্ডারবোল্ট টীম। ক্যানভাস সীটে হাত-পা মেলে দিয়ে যে যার চিন্তায় মগ্ন। আসন্ন মিশনের ওপর সবাইকে কনসেন্ট্রেট করতে নির্দেশ দিয়েছে লীডার মেজর মাসুদ রানা, তাই করছে ওরা।

হারকিউলিসের বাঁক ঘোরা শেষ হতে সার্জেন্ট মোহাম্মদ শহীদ আপনমনে বলল, 'ভারত মহাসাগরে পড়েছি আমরা।'

'কি করে বুঝলে?' প্রশ্ন করল পাশে বসা দলের সবচেয়ে ছোটখাট সদস্য, ট্রুপার হেকমত আলি। 'অ্যানিমেল ইনস্টিংট্ না কি যেন বলে, তার সাহায্যে?'

চোখ কুঁচকে উঠল পাইলটের। 'এর মধ্যে অ্যানিমেল ইনস্টিংট্ আসে কি ভাবে? এতবড় জায়গা নিয়ে বাঁক ঘোরা টের পেয়েই...'

'সরি.' লাজুক হাসি হাসল হেকমত আলি। 'ভুলে গিয়েছিলাম

তুমিও পাইলট।' প্রিঅপ কনফাইনমেন্টের সময় রানার উৎসাহে সবার সাথে সবার সম্পর্ক তুমিতে নেমে এসেছে। এতে আন্তরিকতা বাড়ে। অবশ্য লীডারকে সবাই 'আপনি' বলে। সঙ্কোচের কারণে মুখ দিয়ে 'তুমি' বের হয় না।

'এখনও তাহলে সাগরের ওপর আছি?'

'হ্যাঁ। ঝাঁকি শুরু হলে বুঝবে মাটির ওপর দিয়ে চলছি।'

'ও।'

ঘুরে হেকমত আলিকে দেখল পাইলট। 'ব্যাপার কি, তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে? প্লেনে চড়তে ভয় করে?'

'না। আমি ভাবছি আমার গিন্নির কথা।'

'কি হয়েছে তার?'

'হয়নি, হবে।'

'বাচ্চা?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল হেকতম আলি। 'হুঁম।'

চুপ করে গেল ওরা। ওদিকে, বাঁ সারির জানালার কাছে ক্যানভাস সীটে প্রায় শুয়ে আছে মাসুদ রানা। দু'হাত বুকে বাঁধা, পা মেলে দিয়েছে লম্বা করে। আফগান বিশেষ টুপিতে কপাল-চোখ ঢাকা। দেখে মনে হতে পারে ঘুমিয়ে আছে বুঝি, আসলে পুরো সজাগ।

অন্ধকারে হারকিউলিসের ভেতরের হালকা তেলতেলে গন্ধ আর প্রতিটা দোল অনুভব করার চেষ্টা করছে। সবকিছুর সাথে এক হয়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এতে লাভ হয়, যে কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়া সহজ হয়। এই অনিশ্চিত মিশনে ভাগ্যে কি আছে কে জানে! সাংবাদিক যুগলকে বাঘলানে কোথায় রাখা হয়েছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও জানতে পারেনি ওরা। জালাল জানতে পারেনি। ওরা কাল্পনিক এক

রেপ্লিকা বানিয়ে নতুন করে মহড়া দিয়ে এসেছে, কিন্তু রানার মন তাতে ভরেনি। জালাল অবশ্য চেষ্টায় কোন ঢিলেমি করেনি। এখনও লেগে আছে। দেখা যাক, কি হয় শেষ পর্যন্ত।

আট মাইল ওপর থেকে স্যাটেলাইটের তোলা ছবি দেখে এ ধরনের রেইডের প্ল্যান করা, তারওপর ভিত্তি করে মহড়া দেয়া এবং সব কাজ ভালয় ভালয় শেষ করে ফিরে আসতে পারার চিন্তা অনেকটা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার মত মনে হয় ওর। অবশ্য ছবিগুলো যে খুবই স্পষ্ট ছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এতই পরিষ্কার যে কাবুল বা বাঘলানের রাস্তায় চলমান গাড়ির নাম্বার প্লেট পড়তেও একটু সমস্যা হয়নি। তবু অস্বস্তি খানিকটা রয়েই গেছে।

ক্যাপ সরাল ও, পিছনে তাকাল। মৃদু, লালচে ইন্টেরিয়র আলোয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুই লং হুইল বেজড্ ল্যান্ড রোভারকে ভীষণরকম জান্তব মনে হচ্ছে। ধূসরের ওপর হালকা কালচে ডোরাকাটা রঙ ওগুলোর–ডেজার্ট ক্যামোফ্লেজ। জায়গায় ধরে রাখার জন্যে প্যারাস্যুট প্যালেটের সাথে বাঁধা আছে ওগুলো।

বিসিআইয়ের সংরক্ষিত বিশেষ অ্যাপারেটাসের অংশ ও দুটো–পিঙ্ক প্যান্থার। স্পেশাল ফাইটিং মেশিন, ভারি বিশ্বস্ত। রিইনফোর্সড চেসিস, ষোলো ইঞ্চি চওড়া গভীর থ্রেডের স্যান্ড টায়ার আর দানবীয় শক্তির সুপারচার্জড ভি-৮ এঞ্জিন চালিত গাড়ি দুটো মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের হোম বেজ হিসেবে ব্যবহার হবে।

কাজের সময় যা যা দরকার, সবই আছে ওতে। সাইড বিনের ডস-ব্যাগে আছে সেসব। যন্ত্রপাতি, গোলাগুলি, অস্ত্র ও গাড়ির পার্টস, পানি ও ফুয়েলের জেরিক্যান, পার্সোন্যাল কিট্, কমিউনিকেশনস্ ইকুইপমেন্ট এবং অস্ত্রের বড়সড় এক ভাণ্ডার।

এছাড়া বনেটে বিশেষ কায়দায় সেট করা আছে এল-৩৭ জিপিএমজি, বোতাম টিপলেই মাথা তোলে। লো-ফ্লাইং ক্র্যাফট বা লাইট আর্মার্ড ট্রাকের মোকাবিলায় যথেষ্ট। সব মিলিয়ে দারুণ এক গাড়ি।

তেমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিশনের অন্য সদস্যরা। যে যার ক্ষেত্রে মহাওস্তাদ ফরোয়ার্ড খেলোয়াড় একেকজন। এগিয়ে যেতে জানে, পিছাতে নয়। মারতে জানে, মরতে নয়। পাইলট শহীদকে দেখল রানা। সমীহের দৃষ্টি ফুটল চোখে। এতজন স্পেশালের মধ্যে সেরা স্পেশাল সে। টীম লীডারের সাথেও যে কোন দিক থেকে টেক্কা দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

বুদ্ধি, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, কয়েক ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা, এক্সপ্লোসিভ ও ডেমোলিশন, কমিউনিকেশনস্ এবং কপ্টার চালনা, সবকিছুতে বিশেষজ্ঞ। এসবের বেশিরভাগ অর্জন করেছে সে সার্ভিসে, বাকিটা বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর। ওকে সংস্থার গৌরব আখ্যা দেয়া যায় নির্দ্বিধায়। 'রিজার্ভ' তিনজনের একজন ও।

সিগারেট ধরাল রানা। শুয়ে সিলিং দেখতে লাগল। টানা গোঁ-গোঁ শব্দে উড়ে চলেছে হারকিউলিস, বিরক্তিকর একঘেয়ে ফ্লাইট। এক সময় ইরানের আকাশে ঢুকল, বর্ডার অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা স্টারসাইডে রেখে হাঁ-হাঁ করে ছুটল সামনে। খানিকটা যেতে প্লেনের বিশেষ রাডারে এক এয়ারবোর্ন ইরানী রাডারের সাড়া পেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আনিস। 'ইন্টারসেপ্ট' করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।

কিন্তু হাইট আরও লূজ করে ফাঁড়া কাটাল সে, ওদের রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সি-১৩০। পাহাড়ী অঞ্চলের বিভ্রান্তিকর সমস্ত ছবির মধ্যে ইরানীরা হারিয়ে ফেলল ওদের। তারপর আবার

একঘেয়ে চলা। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলছে আলফা পতেঙ্গা। একটুপর ঢুকে পড়ল আফগান আকাশসীমায়, ক্রমে কাছিয়ে আসতে থাকল ড্রপ-জোন।

জায়গাটা কাবুল ও হিন্দুকুশের মাঝখানের খুদে শহর চারিকার সামান্য উত্তরে। হিন্দুকুশের পেটের মধ্যে তিন মাইল লম্বা তেকোনা এক সমতল খোলা ব্রেক ওটা। চারদিকে উঁচু পাহাড়ের চূড়া, মাঝখানে ফাঁকা। ভেতরে নামা এবং ওঠার জন্যে দু'মাইল জায়গা পাবে পাইলট। যথেষ্ট। তবে সময়ের হিসেবে এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হয়ে গেলে সর্বনাশ, ওঠার সময় সোজা দশ হাজার ফুট উঁচু চূড়ায় আছড়ে পড়বে আলফা পতেঙ্গা।

সেই আশঙ্কার কথা ভাবতে গিয়ে ঘাম ছুটে গেল কাজী আনিসের। 'ওকে, সরোয়ার,' সময় হয়ে এসেছে বুঝে বলল। 'ডিজেড এসে পড়েছে। ডিসপ্যাচারদের বলো সবাইকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিতে। দশ মিনিট পর জাম্প করতে হবে।'

ইন্টারকমে কো-পাইলটের ঘোষণা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো। ঝটপট খুলে ফেলা হলো পিঙ্ক প্যান্থারের বাঁধন, থান্ডারবোল্টের সদস্যরা যে যার জাম্প হেলমেট পরে ফ্লাইট ডেকের নিচের বে-র সামনে জড়ো হলো, একজন অন্যজনের প্যারাস্যুটসহ যাবতীয় পার্সোন্যাল কিট নেয়া হয়েছে কি না, ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কি না, চেক্ করতে লাগল নীরবে। কাজ শেষ হতে পরস্পরের উদ্দেশে বুড়ো আঙুলে 'ওকে' সঙ্কেত দিল তারা।

প্রত্যেকে টের পেল প্লেনের নাক ওপরমুখো হতে শুরু করেছে হিন্দুকুশের বেড়া ডিঙানোর জন্যে। এসে পড়েছে ডিজেড। পাকস্থলীতে অদ্ভুত এক অনুভূতি জাগল রানার, মনে হলো সব খালি হয়ে গেছে ভেতরে। পোর্ট উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল ও,

বিশাল সব বোল্ডার বিছানো আবছা একেকটা চূড়া সাঁ সাঁ করে উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে।

পাইলট লোকটা যেন ঠিক জায়গায় নিয়ে এসে থাকে ওদের, মনে মনে বলল রানা। কোন ভুল যেন না হয়ে থাকে তার। প্লেনের নাক আরও উঠল, তারপরই আবার নিচু হতে শুরু করল। এসে গেছে!

ক্রসউইন্ড কয়েক মুহূর্তের জন্যে দুলিয়ে দিল প্রকাণ্ড উড়ন্ত দানবটাকে, অনেক কষ্টে পরিস্থিতি সামাল দিল পাইলট। কো-পাইলট সুইচ টিপে টেইলর‍্যাম্প খুলে দিল। ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল পিছনটা। আচমকা বাতাসের চাপে বাইরের ধুলোবালি ভেতরে ঢুকে উন্মত্তের মত ছোটাছুটি শুরু করল। একটুপর থেমে গেল তা, বিশুদ্ধ পাহাড়ী, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত লেগে উঠল সবার।

ভেতরে একটা লাল লাইট টিপ টিপ করে জ্বলেছে। রেডিও অল্টিমিটার আটশো ফুট শো করতে নিভে গেল ওটা, পাশে আরেকটা সবুজ জ্বলে উঠল। সাথে সাথে এক্সট্র্যাকশন শ্যুট রিলিজ করল পাইলট, প্যান্থারের প্যালেটে বাঁধা একশো ফুট লাইনের কয়েলে ঢিল পড়ল, অমনি পিছনের গ্যাপের দিকে গড়াতে শুরু করল ও দুটো।

'লোড মুভিং,' ইন্টারকমে তাকে রিপোর্ট করল ডিসপ্যাচার।

গতি বেড়ে গেল প্যান্থারের, একটা সাঁ করে গায়েব হয়ে গেল। তারপর অন্যটাও। ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে খুলে গেল ওদের প্যারাস্যুট। ওদিকে প্লেনের গতি ১১৫ নটে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কাজী আনিস, অসম্ভব কঠিন কাজ। সতেরোশো মিটারের সাতশো ততক্ষণে খেয়ে ফেলেছে হারকিউলিস।

'লোড গন,' বলল ডিসপ্যাচার। উদ্বিগ্ন চোখে রানাকে দেখল। 'এরিয়া ফুরিয়ে আসছে, মেজর। গো!'

'ওকে, লেট'স গো!' সঙ্কেত দিল রানা সবাইকে।

পিছনের ক্রীম মাখা কালো মুখগুলোয় হাসি ফুটল। লীডারের পিছন পিছন দৌড়ে র‍্যাম্পের দিকে চলল সবাই, দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল অন্ধকার রাতের আকাশে। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, 'খারা, আইতাছি!' শেষের শব্দটা শোনা গেল না অবশ্য, টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দুরন্ত বাতাস।

ওদিকে ককপিটে মনে মনে মরে গেছে কাজী আনিসুজ্জামান। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, সময় শেষ। সরোয়ার উইন্ডশীল্ডে নাক প্রায় ঠেকিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ভয়ে, উত্তেজনায় চেহারা ফ্যাকাসে। 'সম্ভব না,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সে। 'শেষ...!'

কাজী আনিসের চেহারা সাদা হয়ে গেছে, বিস্ফারিত চোখে সামনে থেকে দ্রুত ধেয়ে আসা হিন্দুকুশের নিরেট দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। আর কত দেরি ওদের? ভাবছে সে। আর কত...'

'স্টিক গন!' অবশেষে ঘোষণা করল ডিসপ্যাচার।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল পাইলট, এক ঝট্‌কায় কন্ট্রোল কলাম নিজের দিকে টেনে আনল, একই মুহূর্তে অন্য হাতের তালুর গোড়ার এক ধাক্কায় সামনে ঠেলে দিল পাওয়ার লিভার। রেডিও অল্টিমিটারের কাঁটা র‍্যাপিড রাইডিং শো করতে আরম্ভ করল তক্ষুণি। চারটে প্রচণ্ড শক্তিশালী অ্যালিসন ঠেলে ওপরে তুলে দিতে লাগল হারকিউলিসকে। ওগুলোর সম্মিলিত চিৎকার চারদিকের পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। মনে হলো নরকের সমস্ত শয়তান বুঝি নেমে এসে ধ্বংসের সুর তুলেছে বাঁশিতে।

উঠছে হারকিউলিস...উঠছে। নাক একদম খাড়া, যেন আকাশ ছুঁতে চায়। হ্যান্ডহোল্ড ধরে অসহায়ের মত ঝুলছে ডিসপ্যাচাররা।

হাত ছুটলেই শেষ। র‍্যাম্প লক্ হওয়ার মুহূর্তখানেক আগে পিছনের তেকোনা ডিজেড চোখে পড়ল তাদের, একইসঙ্গে বেলুনের মত গাঢ় রঙের কয়েকটা অ্যারোফয়েল প্যারাস্যুটও।

পরক্ষণে পেটের তলা দিয়ে সাঁ করে পিছিয়ে গেল কালচে হিন্দুকুশ, খুব বেশি হলে পঁচিশ ফুট নিচে দিয়ে। ভয় কেটে যেতে গর্বে বুক ভরে উঠল কো-পাইলটের। পাশে স্কোয়াড্রন লীডার কাজী আনিস হাসছে, দাঁত দেখা যাচ্ছে তার।

একটুপর ঘুরে দক্ষিণমুখো হলো আলফা পতেঙ্গা, একশো ফুট উচ্চতায় নেমে এসে ছুটে চলল সুদীর্ঘ ফিরতি পথ ধরে।

মুখ তুলে ওটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মাসুদ রানা, আওয়াজও মিলিয়ে গেল একটু পর। এবার দোল খেয়ে নামতে থাকা সঙ্গীদের দিকে নজর দিল ও। ক্যানোপি ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের মৃদু শিস ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আল্ট্রামেরিন আকাশের পটভূমিতে অদ্ভুতুড়ে লাগছে হিন্দুকুশের চূড়াগুলোকে।

নিচে তাকাল রানা, গাছ, মাটি বা পাথর, কিছুরই দেখা নেই। তবু সতর্ক থাকল। যে কোন মুহূর্তে সাঁ করে উঠে আসতে পারে ওর যে কোন একটা, অসতর্ক থাকলে হাত-পা ভাঙা, কি খুলি গুঁড়ো হয়ে যাওয়া, কোনটাই অসম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতেই আচমকা দেখা দিল ঊষর পাথুরে মাটি। স্ট্র্যাপ শক্ত করে ধরে হাঁটু ভাঁজ করল ও। ল্যান্ডিং এত চমৎকার হলো যে বিশ্বাসই হতে চাইল না। পা মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, পেটের কাছের রিলিজ রিং মুচড়ে খুলে দিল রানা, বেরিয়ে এল হার্নেসের বাঁধন থেকে। পরক্ষণে ব্যস্ত হাতের কয়েক টান ও চাপড়ে স্যুটের বাতাস বের করে দিল।

সাব-মেশিনগান নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এক মুহূর্ত পর।

সম্পূর্ণ তৈরি। নার্স খন্দকার জাহাঙ্গীর নামল পঞ্চাশ ফুট দূরে। ওর ল্যান্ডিং সুবিধের হয়নি, পাথরের বুকে তার বুট ঘষটানোর শব্দে বুঝল রানা। বেশ কয়েক ফুট টেনে নিয়ে গেছে তাকে স্যুট। অবশ্য দুই মিনিটের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে রানার সাথে এসে যোগ দিল সে।

দু'মিনিট পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল মোহাম্মদ শহীদ। 'কি হয়েছে?' উদ্বেগ ফুটল রানার কণ্ঠে।

'তেমন কিছু না। গোড়ালিতে লেগেছে একটু।'

'কোন চিন্তা কোরো না,' অভয় দিল ডাক্তার। 'আমার কাছে ব্যবস্থা আছে, ঠিক হয়ে যাবে।'

খুঁজতে খুঁজতে দুই পিঙ্ক প্যান্থারের কাছে পৌঁছল ওরা। দ্বিতীয় ড্রাইভার ফয়েজ মোহাম্মদ আগেই পৌঁছে গেছে ওখানে। ঝাঁকি নিরোধক হানিকুম প্লাটফর্মের ওপর বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে থাকা একটাকে প্যালেটের বাঁধনমুক্ত করে চালিয়ে এনে মাটিতে দাঁড় করিয়েছে সে। দশ মিনিটের মধ্যে অন্যরাও একে একে এসে হাজির হলো।

'স্যুট আর প্যালেটগুলো এক জায়গায় করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'চুপ্, চুপ্!' হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠল হেকমত আলি। ঝপ্ করে এক হাঁটুতে গেড়ে বসে সাব-মেশিনগান তুলল। অন্য সবাই ঘুরে তাকাল ওটার নলের নিশানা অনুসরণ করে।

'কি হয়েছে?' বলল আলালউদ্দিন খান পাঠান।

'একটা শব্দ শুনলাম,' জবাব দিল সে। 'ধাতব শব্দ, ঘণ্টার মত। ওই যে...শুনতে পাচ্ছ?'

'কই...কোথায়?'

'চুপ্ করো!' রানা চাপা ধমক লাগাল। খুব আবছা হলেও

আওয়াজটা শুনেছে ও। নীরব হয়ে গেল সবাই, কান খাড়া করে অপেক্ষায় থাকল। মিনিট তিনেক পর হঠাৎ একটা নড়াচড়া দেখা গেল অন্ধকারে। আটটা সাব-মেশিনগান স্থির হয়ে থাকল সেদিকে। আরও একটু পর পরিষ্কার দেখা গেল জিনিসটাকে। একটা ভেড়া! গলায় বাঁধা ঘণ্টা ঠুন-ঠুন আওয়াজ তুলছে।

'ধুর!' তীব্র হতাশা ফুটল হেকমত আলির কণ্ঠে।

'কথা বোলো না!' ফের চাপা গলায় সতর্ক করল রানা। 'গলায় ঘণ্টী বাঁধা ভেড়ার সঙ্গে রাখালও থাকে। চলো কেটে পড়ি।'

প্রায় নিঃশব্দে স্টার্ট নিল প্যান্থার ওয়ান। গিয়ার দিল হেকমত আলি, ক্লাচ ছেড়ে এক্সিলারেটরে চাপ দিল। হেভি ডিউটি টায়ার প্রথমে খানিক ধুলো আর নুড়ির মেঘ তৈরি করল জায়গায় চক্কর কেটে, তারপর দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে ঠেলে নিয়ে চলল চারজনের ব্যাক-আপ টীমটাকে।

চালকের পাশে বসা মোহাম্মদ শহীদ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল অন্ধকারে ছুটতে হচ্ছে বলে। মরুভূমিতে ইনফ্রা-রেড হেডলাইটের সাহায্যে ড্রাইভ করা মোটেই যা-তা ব্যাপার নয়। যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

'সাবধান, হেকমত আলি,' বলল সে। 'আস্তে চালাও, বেশি হেকমতি দেখাতে যেয়ো না।'

খাকি রঙের ধাতব কমন ইউজার বিনকিউলারের ফ্রেমের নিচে লোকটার চওড়া হাসি দেখা গেল। 'হেকমতির দেখেছ কি? সবে তো শুরু হলো!'

সঙ্গীর চেয়ে অনেক সুবিধেজনক পর্যায়ে আছে সে বিদঘুটে গগলসের মত জিনিসটা পরে। ওটার নিজস্ব পাওয়ার প্যাকের

উৎপন্ন আই আর হেডল্যাম্প বীমের সাহায্যে প্রতিটা চূড়া জ্বলজ্বলে ব্যাটনের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। দারুণ সিস্টেম, তবে বর্তমানে ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে অন্য সমস্ত অত্যাধুনিক আবিষ্কারের কাছে।

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু...'

'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, আমি জানি কোথায় যাচ্ছি আমি।'

'দেখো। পাহাড়ে চড়ে বসার আগে জানাতে ভুলো না।'

হাতের পার্সপেক্স ফেসড্ ক্যানভাস কেসের ভেতরে সেট করা এই অঞ্চলের ডিটেইলড্ ম্যাপের দিকে নজর দিল সে। নিচের ম্যাপ লাইটের আভায় ম্যাপের প্রতিটা সূক্ষ্ম রেখাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'কিছুটা সামনে ল্যান্ড স্লিপের স্তূপ আছে। ডানদিকে। সাবধান!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল হেকমত।

টানা দশ মিনিট ঝড়ের বেগে ছুটল দুই প্যান্থার। আলো ফোটার আগে বাঘলানের যত কাছে পৌঁছানো যায়, ততই লাভ। সাড়ে তিনটের দিকে একটা রাস্তা পার হয়ে ফের উঁচুনিচু মরুভূমিতে পড়ল। নিজের ম্যাপের সাথে রাস্তাটা মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। প্যান্থার টুতে আছে ও। যে রাস্তাটা ফেলে এল, ওটার দক্ষিণ মাথায়, মরুভূমির মধ্যে পরিত্যক্ত এক এয়ারস্ট্রিপ আছে। সব যদি ঠিক থাকে, পাঁচদিন পর ওদের তুলে নিতে ওখানে ল্যান্ড করবে আলফা পতেঙ্গা।

ভোরের আলো ফোটার আগে কান্দুজ নদীর তীরের ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা। অনেক গভীরে এসে থামল, স্টার্ট বন্ধ করে হ্যান্ডব্রেক টেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল দুই ড্রাইভার।

গাড়ি থেকে নামল সবাই। চারদিকে নজর বুলিয়ে পরিবেশ দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। চমৎকার জায়গা। দিনের পর দিন লুকিয়ে

থাকলেও কেউ টের পাবে না। গতকাল চট্টগ্রামে ডুবতে দেখা সূর্য আজ আফগানিস্তানে উদয় হতে যাচ্ছে ভেবে আজব এক অনুভূতি জাগল ওর। একটাই সূর্য, অথচ এই আলোয় বাইরে মুখ দেখাবার স্বাধীনতা কতই না সীমিত ওদের। কী অদ্ভুত!

ফ্যাকাসে সোনালী আভা ফুটল পুব আকাশে। পাখিরা বাসা ছাড়ল। অপ্রত্যাশিত অতিথিদের দেখে নিজেদের ভাষায় কিছুক্ষণ আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাল, তারপর ফল হবে না বুঝতে পেরে উড়ে চলে গেল।

ওদের মাথার অনেক ওপরে, হিন্দুকুশের এবড়োখেবড়ো গা সূর্যের আলোয় হেসে উঠল।

'পাঠান মুলুকে সবাইকে স্বাগতম,' হাসিমুখে বলল জাফর আহমদ। 'তবে দেখেশুনে চলতে হবে, কারণ এদেশের আবদুর রহমানরা মরে গেছে অনেক আগে। রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালারাও নেই। আছে...'

আসন্ন মিশনের চিন্তা হঠাৎ পেয়ে বসায় শেষটুকু শোনা হলো না রানার। ও ভাবছে বাকি পথের কথা। বাঘলান পৌঁছতে একটা মাউন্টেন রেঞ্জ আর পঁয়ষট্টি মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের। তারপর...

কি তারপর?

পাঁচ

দীর্ঘদেহী দুই আফগান ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে বাঘলানের পথ

দিয়ে। তাদের মলিন সালোয়ার-কুর্তা, উলের টুপি, দাড়ি, সব ধুলোবালিতে একাকার। একজনের হাতে একটা হোল্ড অল। ঘুমের অভাবে চোখ লাল। লম্বায়-পাশে প্রায় একইরকম দু'জনে। কোনদিকে নজর নেই তেমন, এদিক-ওদিক, কোনদিকেই তাকাচ্ছে না। মনে হয় নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য আছে।

নদীতে একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের লাফঝাঁপ দেখে মৃদু হাসি ফুটল একজনের মুখে। 'কী সুন্দর!' খাস বাংলায় বলে উঠল সে। 'আমাদের শিশুরাও গরমের সময় এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোসল করে।'

মাথা ঝাঁকাল দ্বিতীয়জন। 'জ্বি।' একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি তো, রানা ভাই?'

'আমাদের ইনফর্মার যদি কোন ভুল না করে থাকে, তাহলে ঠিক পথেই যাচ্ছি।'

আর কথা বলল না শহীদ। ক্লান্ত, আড়ষ্ট পা টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলল নিজেকে। আর চলে না, ইচ্ছে করছে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে।

'প্রায় এসে পড়েছি,' রানা বলল। 'বাঁচলাম! পা আর চলছে না।'

ওকে অকপটে মনের কথা প্রকাশ করতে শুনে ঘুরে তাকাল শহীদ। ওর হতচ্ছাড়া চেহারার সাথে নিজেরটা মিলিয়ে নিল মনে মনে। সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত ওরা, অসম্ভব পরিশ্রান্ত। পরশু সন্ধের পর মূল দল ছেড়ে এসেছে ওরা চারজন—মাসুদ রানা, শহীদ, আলালউদ্দিন ও জাফর। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে একনাগাড়ে হেঁটেছে দু'রাত। গতরাতে, শহরের বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের এক গোপন হাইড আউটে পরের দু'জনকে রেখে এসেছে রানা বিশেষ উদ্দেশে।

মূল শহর ছাড়িয়ে এল ওরা। পথের পাশের উঁচু দেয়ালের এক বাউন্ডারি ওয়ালের সামনে থেমে সিগারেট ধরাল রানা, এই ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিল চারদিকে। তেমন কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে দেয়ালে ফিট্ করা বন্ধ কাঠের দরজায় নক্ করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে বোল্ট খোলার আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে চাদর মুড়ি দেয়া পটলচেরা চোখের এক যুবতী উঁকি দিল। 'আসসালামু আলাইকুম! কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?'

'ওয়াআলাইকুম আসসালাম,' মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর বিশুদ্ধ পশতুতে বলল, 'আমরা দুই বন্ধু অনেক দূর থেকে আসছি। খুব ক্লান্ত। এখানে একটু বিশ্রাম নিতে চাই সুযোগ থাকলে। আর, একজন ভাল সিলভারস্মিথের খোঁজ চাই, জরুরী কিছু কাজ করাতে হবে।'

নির্ধারিত আইডেন্টিফিকেশন কোড শুনে চোখ হেসে উঠল যুবতীর। বিস্ময় ফুটল এক বিদেশীর মুখে চোস্ত দেশী ভাষা শুনে। 'তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন আপনারা, মুসাফির। আসুন।'

'আল্লাহ্ আপনার মনের বাসনা পূরণ করুন।'

ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। বেশ পুরানো বাড়ি, সামনে বড় আঙিনা। তার মাঝখানে একটা ফোয়ারা। বন্ধ অবশ্য, নষ্ট। দরজা বন্ধ করে ঘুরল যুবতী, পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল ওদের। উঁচু খিলানের মত মূল দরজা দিয়ে ভেতরের হোয়াইটওয়াশ করা এক রুমে এনে বসতে অনুরোধ করল। ফ্লোরে বিছানো কার্পেটে বসার ব্যবস্থা দেখে খুশি হয়ে উঠল ওরা। শোয়া-বসা, দুটোই চলবে।

ওদের সাড়া পেয়ে আরেক দরজা দিয়ে রুমে ঢুকল জালাল। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় সেরে মেয়েটিকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে। 'এ আমার গাইড, হামিদা গুলিস্তানী। এর

সাহায্য ছাড়া জিম্মিদের ট্রান্সফারের খবর জানা হয়তো সম্ভব হত না আমার পক্ষে। আমাদের জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছে হামিদা।'

'আমরা সে জন্যে কৃতজ্ঞ, হামিদা,' রানা বলল। 'অনেক ধন্যবাদ।'

লজ্জা পেল মেয়েটি। 'আপনাদের খানার ব্যবস্থা করে আসছি,' বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে গেল। রানাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে এবার জালালও লজ্জা পেল। 'আর বলবেন না, কি করে যে ওর মনে ধরে গেল আমাকে,' শ্রাগ করল।

'এতে লজ্জার কি আছে?' তার পিঠ চাপড়ে দিল ও। 'ভাগ্যবানদের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে।' একটু পর কাজের কথা পাড়ল, 'খোঁজ পাওয়া গেছে ওদের?'

'হ্যাঁ। হামিদা খুঁজে বের করেছে।'

'ভেরি গুড।' বুঝল রানা, ভেতরে ভেতরে পানি অনেকদূর গড়িয়েছে। 'এই বাড়িটা, এটা কার?'

'ওর চাচার,' মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল যুবক।

ও তখন প্রকাণ্ড এক ট্রেতে নানান খাবার সাজিয়ে ভেতরে ঢুকছে। চাদর খুলে রেখে এসেছে। নীল সালোয়ার-কামিজ আর সাদা ওড়নায় অপরূপ লাগছে দেখতে। জালাল বাড়ির প্রসঙ্গ তুলতে সে বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। আমার চাচা এখানকার বড় মসজিদের ইমাম। চোখে কম দেখেন বলে মসজিদেই পড়ে থাকেন। তাঁর ছোট ছেলে সাথে থাকে, কিন্তু এখন সে নেই। আমি বেড়াতে এসেছি শুনে খুশি হয়েছেন চাচা, গত দু'দিনে এ মুখো হননি। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন আপনারা।'

কাবুল। একদিন আগের কথা। নিজের অফিসে বসে আছে কর্নেল নাজাফ মুরাদ। কপালে চিন্তার কুঞ্চন। সিলিং তাক্ করে কেন্টের

ধোঁয়া ছাড়ছে। অন্যমনস্ক চেহারা। আজ বড় খারাপ গেছে তার সকালটা।

ক্ষিপ্ত হাসান শাহ্ বরকতীর চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট নতি স্বীকার করেছেন আজ, তাকে যে সাতদিন সময় দেয়া হয়েছিল, তা বাতিল করে দিয়েছেন লোকটার চাপের মুখে। পারেননি তাকে ঠেকাতে। জেলারের খাতা চেক্ করে ঘটনা জেনে গেছে সে।

তার সোজা কথা, প্রেসিডেন্ট কোন আক্কেলে কর্নেলকে এমন এক কাজের অনুমতি দিলেন? কোন যুক্তিতে মুরাদ তাদের কাবুল থেকে সরিয়ে নিল, তাও বাঘলানের মত এক বর্ডার টাউনে? তালেবানরা পাহারা দিচ্ছে ওদের ভাল কথা, কিন্তু তারা যে পরীক্ষিত, ঈমানদার, তার নিশ্চয়তা কি? যদি টাকা খেয়ে ওদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে ব্যাটারা? যদি পাকিস্তান বা রুশ বর্ডার দিয়ে ওপারে চলে যায় দুই স্পাই, তখন কি হবে?

শেষ পর্যন্ত কথা হয়েছে, মুরাদ তাদের একা জেরা করতে চায় করুক, সাতদিন কেন চোদ্দদিন লাগলেও ক্ষতি নেই, তবু ওদের কাবুল নিয়ে আসা হোক। তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বরকতী নাক গলাবে না। কাজেই এরপর আর কথা চলে না। হাজার হোক মুরাদ সরকারের চাকর, আর বরকতী তাঁর মন্ত্রী। তাঁর সহযোদ্ধা, সরকারের একটা অঙ্গ।

সবচেয়ে বড় কথা, তালেবানদের মধ্যে তার সমর্থক একেবারে কম নেই। বেশি খেপে গেলে হয়তো অন্য ধরনের কিছু ঘটিয়ে বসতেও পারে। কি দরকার সেধে এত যন্ত্রণা ডেকে আনার? অতএব আজ মুরাদকে ডেকে দুই সাংবাদিককে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সে যা করতে চায় এখানে বসে করুক। রাজি না হয়ে উপায় কি কর্নেলের? তবে বলে-কয়ে আজকের রাতটা সময় নিয়েছে সে।

আজ স্পাই দুটোর মুখ খোলার শেষ চেষ্টা করবে। সফল হোক, বা না হোক, কাল সকালে তাদের ফেরত আনার ব্যবস্থা করবে।

এইডকে বারবার ডেস্কের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখে বিরক্ত হলো কর্নেল। সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল, 'কি চাও তুমি?'

'স্যার, অনেক ফাইল জমে গেছে,' IN ট্রে দেখিয়ে বলল তরুণ লেফটেন্যান্ট। 'কয়েকটা অন্তত ছেড়ে দেয়া গেলে ভাল হত।'

'হুঁম!' প্রথম ফাইল টেনে নিল সে। নাম দেখল, হামিদা গুলিস্তানী, অভিযোগ, সন্দেহভাজন বিশ্বাসঘাতক। আর কিছু দরকার হলো না, খস খস করে তার ডিটেনশন অর্ডারে সই করে দিল। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত একটানা কাজ করে স্তূপ অর্ধেকে নামিয়ে আনল সে।

বাঘলান। পেট ঠাণ্ডা হতে ঘুমে চোখ বুজে এল রানা ও শহীদের। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে উঠে পড়ল ওরা, জালালের সাথে আলোচনা সেরে ঠা-ঠা রোদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হামিদার নির্দেশ করা পথ ধরে এগিয়ে দূর থেকে বাড়িটা দেখল।

একদম নদীর তীরে ওটা, চারতলা। চারদিকে বারো ফুট উঁচু দেয়াল। দেখেই বোঝা যায় ওপরের ফুটচারেক বেশিদিন হয়নি গাঁথা হয়েছে। তারওপর কাঁটাতারের বেড়া রোদে চকচক করছে। মেইন গেটে তিন তালেবান গার্ড দাঁড়িয়ে গল্প করছে, ঢিলেঢালা ভাবভঙ্গি। সামনের মেইনরোডের দু'পাশে বড় বড় পপলার গাছ। বাড়ির ভেতরেও বড় বাগান আছে মনে হলো। ছাদে সার্চলাইট।

দুই ক্লান্ত পথিকের মত একটু দূরের এক গাছের ছায়ায় বসে পড়ল রানা ও শহীদ। টুপি খুলে চোখেমুখে বাতাস করতে লাগল।

দেখা গেল আরও দুই গার্ড আছে বাড়িটার পিছনে। দেয়ালের ভেতরে সম্ভবত এক প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দিকে নজর রাখছে। কাঁধ থেকে ওপরের অংশ দেখা যায় তাদের।

'বাড়িটা উপযুক্ত,' শহীদ বলল। 'কিন্তু সিকিউরিটি ব্যবস্থা তো তেমন মনে হয় না দেখে। গাছের আড়ালে আড়ালে গেট পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে যেতে পারব আমরা, কি বলেন, রানা ভাই?'

মাথা দোলাল ও। 'নদীপথে আরও সহজ হবে মনে হয়।' আরও কিছুক্ষণ চোখ নেচে বেড়াল বাড়িটার ওপর। টেলিফোনের লাইন দেখতে পেয়ে সেদিকে ইশারায় শহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'সামনের পাওয়ার লাইন দেখতে পাচ্ছ?'

'জ্বি। দুটোই উড়িয়ে দিলে ভাল হয়।'

'চলো এবার। নদীর ওপারে গিয়ে পিছনদিকটা চেক্ করা যাক।'

শহরের দিকে চলল দু'জনে। নদী পারাপারের জন্যে রুশদের তৈরি বড় এক ঝুলন্ত ব্রিজ আছে, সেদিকে।

শহরের কাজ সেরে দক্ষিণ-পশ্চিমের খুদে বাঘলান ফাইটার বেজের দিকে চলল ওরা। ওটাও রুশদের তৈরি। এক সময় মোটামুটি ব্যস্ত ঘাঁটি ছিল, বর্তমানে কয়েকটা কপ্টার থাকে কেবল। ঠিক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে ওগুলোর ব্যবস্থা করা জরুরী। আড়ালে হোল্ডঅল থেকে বিমান বাহিনীর কভারল বের করে পরে নিয়ে এগোল ওরা।

রানা যা ভেবেছে, দেখা গেল তাই সত্যি। কপ্টার কয়েকটা আছে তবে গার্ড ব্যবস্থা একেবারেই ঢিলেঢালা। বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই বেজটার। লাঞ্চ সেরে হাটে ঝিম্ মেরে বসেছিল সিকিউরিটি গার্ড। কাশি শুনে চোখ মেলল, সামনেই দুই কভারল

পরা মেকানিক দেখে উঠে এল। 'আপনারা?'

তার ঘুম ঘুম চোখের সামনে নিজেদের আইডি তুলে ধরল দু'জনে। ভাল করে দেখলও না মানুষটা। 'কাবুল থেকে পাঠানো হয়েছে আমাদের,' রানা বলল। 'ভাল কন্ডিশনের কপ্টার কতগুলো আছে, তা চেক্ করে রিপোর্ট করতে হবে ওদের।'

'কিন্তু...আপনাদের চিনতে পারছি না কেন?' দ্বিধায় পড়ে ইতস্তত করতে লাগল গার্ড। 'আগে কখনও...'

কড়া চোখে তাকাল শহীদ। 'কানে কম শোনো নাকি তুমি? বলা হলো না কাবুল থেকে এসেছি আমরা?'

আর কথা বাড়াল না লোকটা, গেট খুলে দিল। এখানকার কর্মচারীদের ঢিলেমি ইত্যাদি নিয়ে গজগজ করতে করতে ভেতরে ঢুকল দু'জন। কপ্টার পার্কের দিকে এগোল। উল্টো ইউর মত টিনের শেডওয়ালা পার্কটা বেশ বড়। ভেতরে অনেকগুলো সোভিয়েত নির্মিত কপ্টার দেখা গেল, বেশিরভাগই অকেজো। ধুলোর পুরু স্তরের নিচে আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেছে।

ভেতরে এক লোকাল মেকানিককে পাওয়া গেল। সেও খেয়েদেয়ে এক দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। লোকটাকে ডাকতে যাচ্ছিল শহীদ, কিন্তু দরকার হলো না, নিজে থেকেই ঘুম ভেঙে গেল তার। 'কারা আপনারা?' উঠে বসল সে।

আইডি দেখাল ওরা। রানা বলল আসার কারণ। শুনে মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করল মেকানিক। 'ওফ্, এই নিয়ে এবছর চারবার হলো। হেড অফিসের কাজের মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝি না। কেন যে বারবার...'

'ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ো, ভায়া,' শহীদ বলল। 'এখন দয়া করে দেখাও চালু কপ্টার কয়টা আছে। কোন্টা কোন্টা। কাজ সেরে আজই আমাদের কাবুল ফিরতে হবে।'

খাটিয়া ছেড়ে ওঠার কষ্ট করল না লোকটা, দূর থেকে আলাদা পার্ক করে রাখা গোটাছয়েক কপ্টার দেখিয়ে দিল। যত্নের সাথে ওগুলো পরীক্ষা করে দেখল শহীদ, রানা ওর হাতে ধরা ক্লিপবোর্ডে লিখল কি সব। কাজের সাথে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে ওরা, যেন হতাশ হয়েছে এখানকার ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বহীনতা, রক্ষণাবেক্ষণে চরম অবহেলা ইত্যাদি দেখে।

ছটার মধ্যে পাঁচটা উড়ল, কিন্তু ওগুলোকে উড়ন্ত মৃত্যুফাঁদ বলে আখ্যা দিল শহীদ। একটামাত্র পাওয়া গেল ভরসা করার মত। একটা জেটরেঞ্জার, ফুয়েল ট্যাঙ্ক পুরো ভর্তি। ওটার ইগনাইটার প্লাগ খুলে কভারলের পকেটে ছেড়ে দিল শহীদ। মামলা ডিসমিস। আরও দু'তিন জায়গায় গেল ওরা, তারপর সন্তুষ্ট হলো পুরোপুরি।

আবার বিশ মাইল পাড়ি দিয়ে যখন অন্য দু'জনের সঙ্গে মিলিত হলো ওরা, তখন বেশ রাত। নির্ধারিত ১২০৫ মিনিটে থান্ডারবোল্ট ওয়ানের তরফ থেকে একটা হাই-স্পীড কোডেড মোর্স মেসেজ পেল দূরে অপেক্ষমাণ থান্ডারবোল্ট টু। ওটা এরকম: টুমরো নাইট প্ল্যান এ।

পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণে আলালউদ্দিন খান পাঠানের বার্তা পিঙ্ক প্যান্থারের রেডিওতে রিসিভ করল করপোরাল সদরউদ্দিন। সন্ধে নামতেই মূল দলের সাথে যোগ দিতে রওয়ানা করল টু।

রাতে ঘুমাতে পারল না মাসুদ রানা। অস্বস্তিকর এক অনুভূতি জাগিয়ে রাখল ওকে। যে চ্যালেঞ্জ আসছে, তাকে মোকাবিলা করার চিন্তা অস্থির করে রাখল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামত এল বটে, কিন্তু আলো ফুটতেই কেটে গেল রেশ। দুপুরে খেয়ে দু'জন দু'জন করে শহরের দিকে রওনা দিল দলটা। গাড়ি দুটো সঙ্গে নিল না। অস্থায়ী ঘাঁটিতে

নিরাপদেই থাকবে ওগুলো।

ছয়

রাত নেমেছে বাঘলানে।

ওদিকে শহরের ছয় মাইল দূরে, বনের মধ্যে থান্ডারবোল্ট টীম শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। গাঢ় সবুজ সালোয়ার-কুর্তার ওপর জলপাই রঙের বিশেষ ফিল্ড জ্যাকেট পরেছে সবাই। তালেবান গার্ডদের অফিশিয়াল ড্রেস এটা। দেখতে একইরকম হলেও ঢাকায় তৈরি এগুলোর বাড়তি কয়েকটা রিইনফোর্সড পকেট আছে।

ঢিলেঢালা করে কাটা হয়েছে জ্যাকেটের বগল যাতে প্রয়োজনের সময় হাত নাড়তে অসুবিধে না হয়। ওয়েবিং জ্যাকেটের বদলে কোমরে চওড়া বেল্ট পরল ওরা। বেল্টের সাথে ফিক্স করা আছে জলপাই রঙের প্লাস্টিক রেসপিরেটর কেস ও কয়েকটা পাউচ। মেডিকেল কিটস্, ইমার্জেন্সি শুকনো রেশন ও গোলাগুলি আছে ওগুলোয়। আর আছে দুটো করে ধাতব পানির বোতল।

এরপর সাইলেন্সারসহ পশ্চিম জার্মানীর হেকলার অ্যান্ড কচ জি-থ্রী কাঁধে ঝোলাল প্রত্যেকে। তালেবান গার্ডদের অস্ত্র ওটা। এবং একটা করে ব্রাউনিং অটো পিস্তল ও স্ট্যান্ডার্ড ফাইটিং নাইফ। আলালউদ্দিন ও জাফর আহমেদ সঙ্গে অতিরিক্ত নিল পাম্প-

অ্যাকশন রেমিংটন রিপিটার। পয়লা চোটে দরজার তালা ওড়াতে অথবা 'জনতা সামাল দিতে' দরকার হতে পারে ওগুলো।

ওজন যাতে বেশি না হয়ে পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে সবাইকে যথাসম্ভব অল্প ম্যাগাজিন সঙ্গে নিতে পরামর্শ দিল রানা। বেশি নেয়া অনর্থক, একজন এক্সপার্ট হাত চালিয়ে কাজ করলে কয়েক সেকেন্ডে শূন্য ম্যাগাজিন ভরে ফেলতে পারে। এরপর কয়েকটা করে এল-টু ফ্র্যাগমেন্টেশন, স্মোক বম্ব, ইলিউমিনেশন ফ্লেয়ার এবং স্টান গ্রেনেড তুলে নিল প্রত্যেকে। পাইলট শহীদের কাঁধে পড়ল বাড়তি ডজনখানেক পি ই-ফোর বিস্ফোরকের প্যাকেট ও ফিউজ। বোঝা বেশি হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করল না সে। বরং ওগুলো কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে কিনা, তাই নিয়ে লোকটাকে উদ্বিগ্ন মনে হলো।

একটা করে লাইট-ওয়েট ব্যাকপ্যাক নিল সবাই। ওর মধ্যে আছে ফ্লোটেশন ব্যাগ, টগ্‌ল রোপ, ওয়্যার কাটার, দড়ি ও রাতে দেখার বিশেষ যন্ত্র আইডব্লিউএস স্টারলাইট স্কোপ, এবং একসেট করে সাধারণ পরিধেয়। সকাল হলে ওগুলোর দরকার হবে। দলের অবস্থানের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হলো মাটির বুক থেকে, নদীর তীরের নরম মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হলো।

এরপর শেষ আইটেম, রেডিও ও ভিএইচএফ পকেটফোন। বেজ টীমের সাথে কথা বলতে রেডিওটা নিল জাফর আহমেদ, আর সবার সাথে থাকল শর্ট ডিস্ট্যান্স কমিউনিকেশনের জন্যে টকিং ব্রুচ–কলারে ফিট করা একটা থ্রোট মাইক ও খুদে রিসিভার ইয়ারপীস।

এবার রওয়ানা দেয়ার পালা। বনের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে ডাবল করে আধঘণ্টার মধ্যে বাঘলানের প্রান্তে পৌঁছল দলটা। আগের দিন দুপুরে রানা ও শহীদের বাছাই করে রেখে যাওয়া এক

গ্যারেজে পৌঁছল। এক মাইনিং কোম্পানির গ্যারেজ ওটা। ভেতরে একটা দেড় টনী সিমকা ট্রাক আছে ক্যানভাস কার্গো বডিওয়ালা, ওটাই ওদের টার্গেট। দারোয়ানকে বেঁধেছেঁদে ট্রাক বের করতে বেশি সময় লাগল না।

নিজস্ব কায়দায় ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ওটাকে স্টার্ট দিল মাসুদ রানা, দ্রুত চালিয়ে পৌঁছে গেল প্রথম টার্গেটে। বাঘলানের দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুভূমির মধ্যে ওটা, বাঘলান কাবুল হাইওয়েতে। মূল টেলিফোন লিঙ্ক। জায়গামত পৌঁছে কাজে লেগে পড়ল শহীদ, ওটার সাথে সবুজ কার্ডবোর্ড কভার মোড়া পি ই-ফোর বিস্ফোরক বেঁধে ফিউজ সেট করল। ডায়ালে সময় বেঁধে দিল চার ঘণ্টা তিন মিনিট।

আফগানিস্তান সময় রাত সোয়া একটায় বাঘলানের সাথে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সম্পূর্ণ। এখানে কেয়ামত ঘটে গেলেও কাবুল জানবে না কিছু। কাজ শেষ হতে বড় এক লূপ তৈরি করে বাঘলান ফিরে চলল সিমকা। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল জায়গামত পৌঁছতে। কান্দুজ হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক ড্যামের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ওটা–ওভারহেড পাওয়ার কেবল।

দৈত্যাকার স্টীল লেগের ওপর দিয়ে প্রথমে বাঘলানের দিকে গেছে ওটা, তারপর বিভিন্ন দিকে। লেগের দুই পায়ে দুই পি ই ফোর চার্জ বাঁধল শহীদ, ওপরের দুই ক্রস ব্রেসিঙেও। কাজ সেরে সন্তুষ্ট মনে নেমে এল সে। লাইনে যদি স্পার্ক না ঘটে, তাহলে ঠিক সময়ে যাবে লাইন। ঘটলে আগেভাগেই যাবে।

ঘড়ি দেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। নির্ধারিত সময় এদিক-ওদিক হয়নি, একদম ঠিক আছে। 'সিনক্রোনাইজ করে নাও সবাই,' বলল ও। 'এগারোটা পঞ্চান্ন।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না, নীরবে ঘড়ির কাঁটা অ্যাডজাস্ট

করে নিল।

'কার কি কাজ, মনে আছে সবার?'

জবাব দিল না কেউ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একযোগে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল নীরবে। সবার চেহারায় কাজ শুরু করার ব্যগ্রতা।

'কারও কোন প্রশ্ন নেই তাহলে?'

নেই।

মোহাম্মদ শহীদ ও জাফর আহমেদ ক্যামোফ্লেজ ক্রীমের টিউব নিয়ে কাজে লেগে পড়ল।

'মাত্র দু'জন আছে ব্যাটারা,' চাপা গলায় বলল জাফর। নদীর ওপারে বসে স্টারলাইট স্কোপ দিয়ে ভিলার সবুজ রঙের দুই চলমান সেমি-নেগেটিভের ওপর নজর রাখছে সে।

শহীদও দেখল। 'একটা ছাদে। অন্যটা পিছনের দেয়ালে।'

'হুঁম!'

ভিলার ছাদের গার্ড সার্চলাইট ঘুরিয়ে নজর বোলাতে লাগল চারদিকে। ওদের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল শক্তিশালী বীম, কয়েক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হারাল ওদের শাফটিস্কোপ। নব ঘুরিয়ে নিজের স্কোপ অফ করে দিল জাফর, সার্বক্ষণিক মৃদু গুঞ্জন থেমে গেল। ওটাকে কোমরের বেল্টের সাথে ক্লিপে ঝোলানো ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ভরে ফেলল সে। বিড়বিড় করে বলল, 'হারামজাদারা ঘুমাতে যায় না কেন?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল শহীদের। 'যাবে। আগে তোমাকে রোস্ট বানিয়ে।'

'আমি রেডি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সে। 'ওরা স্টিক আর পিট তৈরি করলেই,' কথা শেষ না করে পানিতে আঙুল চোবাল সে,

লাফিয়ে উঠল পরমুহূর্তে। '...ওরে বাবা, কী ঠাণ্ডা!'

'স্রোত কিরকম?'

'আছে মোটামুটি।' ব্যাকপ্যাক থেকে কালো নাইলনের দড়ির কয়েল বের করল জাফর, একমাথা পানির ধারঘেঁষা একটা উইলো গাছের গোড়ায় মজবুত করে বাঁধল, অন্য মাথা কোমরের হার্নেস বেল্টে। এরপর ব্যাকপ্যাক, হেকলার অ্যান্ড কচ ও ব্রাউনিং, সব ফ্লোটেশন ব্যাগে ভরে ফেলল।

প্যারাস্যুট অ্যাঙ্কেল বুট পরা এক পা পানিতে নামিয়ে থামল কি ভেবে। 'যদি পানিতে ভিজে আমার ফোন অকেজো হয়ে যায়, দড়িতে তিনটা টান দেব।'

'চেক্,' মাথা ঝাঁকাল শহীদ। উইলো গাছে হেলান দিয়ে লাইনটা মুঠো করে ধরল। সঙ্গীর প্রয়োজন অনুযায়ী ঢিল দেবে ওতে।

গলা পর্যন্ত নামল সে, তারপর নিঃশব্দে ভেসে পড়ল। মৃদু স্রোতে গা ভাসিয়ে ওপারের দিকে চলল ফ্লোটেশন ব্যাগ সামনে ধরে। বছরের এই সময় পানি বেশ কম থাকে কান্দুজে। এতই কম যে কয়েক জায়গায় হাঁটু আর হাতের ওপর ভর করে এগোতে হলো ওকে। ঠাণ্ডা পানি, শীত লাগছে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক আছে বলে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন করছে দেহ, তাই ব্যাপারটা তেমন টের পাচ্ছে না জাফর। সমস্যা যা একটু ঘটাল ভারী বুট, আর কোন অসুবিধে হলো না।

দশ মিনিটে অন্য তীরের বুক পানিতে পৌঁছে থামল সে, এরমধ্যে কান্দুজ এখানটায় কত চওড়া সে হিসেব হয়ে গেছে। একশো পঁচিশ গজের মত। খুব সতর্কতার সাথে পানি ছেড়ে উঠে পড়ল, বাড়িটার একশো গজ দূরের মোটা কাণ্ডের এক গাছের আড়ালে বসল। মুহূর্তে হাতে চলে এসেছে সাব-মেশিনগান, একই

সাথে টার্গেটে পৌঁছার সহজ ও সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথের খোঁজে তাকাল সে।

ওদিকে আর কারও নড়াচড়া দেখল না জাফর। গার্ড দু'জনই আছে। হেভিডিউটি সার্চ লাইট আগের মতই চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে নদীর ওপর। কাছ থেকে লোক দুটোকে খুবই অসতর্ক মনে হলো তার। অসাবধান, এবং অপেশাদার। মনে মনে হাসল জাফর, ভালই হলো।

এত কাছ থেকে ফোনে কথা বলতে ভরসা হলো না বলে দড়ি ধরে পরপর তিনটে টান দিল ও। একটু পর দড়িতে পাল্টা টান পড়ল। ওটা ধরেই আসছে শহীদ। এবং সাত মিনিটে পৌঁছে গেল পাইলট। ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় সব বের করে তৈরি হয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

'চলো এবার।'

তীর ঘেঁষে সন্তর্পণে এগোল ওরা। পা বাড়াবার আগে ঘড়ি দেখে নিয়েছে দু'জনেই–একটা কুড়ি। আর পঁচিশ মিনিট সময় আছে। পা দিয়ে মাটি-পাথর টিপে টিপে এগোচ্ছে ওরা, হেকলার রেডি। মাথার ওপর আকাশ ঢেকে রাখা প্রচণ্ড ছাতার মত পপলার গাছ মৃদু বাতাসে দুলছে, সরসর আওয়াজ করছে।

ভিলার দেয়ালের ভেতরে কেউ কেশে উঠল। চেনা-অচেনা গানের পোকাদের ঐকতানে ছন্দপতন ঘটাল আওয়াজটা। একটু থমকাল, খানিক বেসুরো বাজল, তারপর আবার ছন্দ খুঁজে পেল ওদের তান। বেড়ে চলল আওয়াজ।

জায়গামত পৌঁছে বসে পড়ল শহীদ ও জাফর। ঘড়ি দেখল–দেড়টা। আরও পনেরো মিনিট।

আচরণ দেখে যতটা মনে হয়, ইরাজ আসলে তার সিকি ভাগ

রাগীও নয়। ভেতরে ভেতরে বরং অনেক শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ। সাধারণ।

মোটামুটি লিখতে-পড়তে জানে বলে একটু গর্ব অবশ্যই আছে মনে, কারণ বেশিরভাগ আফগান হচ্ছে বকলম। তাদের তুলনায় সে ব্যতিক্রম, গর্ব হবে না কেন? তবে বুদ্ধি একটু কম, এই যা। এই জন্যেই তালেবান মোল্লারা যখন ধর্মের নামে ক্ষমতা দখলের ডাক দিল, চট্ করে ভিড়ে গেল তাদের সাথে। জান বাজী রেখে মুজাহেদিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করল, ক্ষমতা দখলে সাহায্য করল বর্তমান সরকারকে, তাদের হয়ে খুন-খারাবিও কম করেনি।

ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি ইরাজ। মাথা ঘামানোর কথা মাথায়ই আসেনি আসলে। মোল্লারা বলেছে, অমুককে মেরে রেখে এসো, কি অমুক পরিবারের সবাইকে ঘরে বন্দী করে আগুন ধরিয়ে দাও ঘরে, সে তাই করেছে সরল মনে। যারা তার হুকুমদার, ইরাজ জানে তারা অনেক লেখাপড়া জানা। না বুঝে কোন হুকুম দেয় না।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্যরকম ঠেকছে তার। অভিযোগ প্রমাণ না হতে কোন বিদেশী নাগরিককে এত হেনস্তা করা হয়, তাও একজন মহিলাসহ, এই প্রথম জানল সে। ওরা কি এমন ক্ষতিকর জিনিস পাচার করছিল? কারেমি কি দিতে গিয়েছিল ওদের? এয়ারপোর্ট থেকে ধরে ক'দিন কাবুলে রাখা হলো, ওখান থেকে নিয়ে আসা হলো এখানে, ফের কাবুল! কেন?

কর্নেল মুরাদের যে মেসেজ এসেছে আজ, তাতে বলা হয়েছে, এই দুই সাংবাদিক যুগলের মুখ খোলাবার শেষ চেষ্টা করতে আজ রাতে সে আসছে। সে জন্যে নির্যাতনের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রেডি রাখতে বলা হয়েছে মেসেজে, তা জেনে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছে ইরাজ। ওগুলো রুশদের আমদানী করা ডিভাইস, কয়েক

বছর আগে আফগানদের ওপরই ব্যবহার করা হত।

সে জানে, ওগুলো যদি সত্যিই ব্যবহার করা হয়, সকালের সূর্য দেখার জন্যে কেউ বেঁচে থাকবে না ওরা। বেঁচে থাকলেও দেখবে না, কারণ ওদের জান তখন ঠোঁটের ডগায় থাকবে। সোজা কথায় মেরেই ফেলা হবে, সে এখানেই হোক, কি কাবুলে। ভাল কথা, তাই যদি হবে, তাহলে মৃত্যুপথ যাত্রীদের শেষ মুহূর্তের যে সুযোগ-সুবিধে দেয়ার বিধান আছে, এদের তা দেয়া উচিত ছিল না কি? কেন শুধু শুধু কষ্ট দেয়া হচ্ছে খাবার-কম্বলের সুবিধে থেকে বঞ্চিত করে? কেন আলাদা সেলে রাখা হয়েছে দু'জনকে?

ভাবতে ভাবতে কথাটা মনে পড়ল ইরাজের, মেয়েটাকে এক কাপ গরম চা বানিয়ে দিলে কেমন হয়? ভালই হয়, কিছুটা তো গা গরম হবে বেচারীর! নিজেরও খুব তেষ্টা পেয়েছে, একসাথে দু'কাপ...পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় দপ্ করে সমস্ত আলো নিভে গেল। 'ধুশ্ শালা!' বিড় বিড় করে উঠল ইরাজ।

ছাদের সার্চলাইটও গেল একই মুহূর্তে। তীব্র নীল্‌চে আলোর বীম হঠাৎ ঝপ্ করে তেজ হারাল, পরক্ষণে নেই হয়ে গেল লালচে আভার ঝলক দেখিয়ে। পশতু ভাষার কয়েকটা কণ্ঠের হতাশাসূচক ধ্বনি ভেসে এল শহীদ ও জাফরের কানে। একটু পর কারও হোঁচট খাওয়া এবং জঘন্য মুখ খিস্তি। ওদের ট্রেনিং পাওয়া কান অনেক দূর থেকে আসা বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজও শুনল। পুরো বাঘলান ডুবে গেল গাঢ় অন্ধকারে।

এক সেকেন্ড পর পকেটফোনে রানার গম্ভীর নির্দেশ শুনল ওরা, 'গো!'

'রজার,' জবাব দিল শহীদ। জাফরের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, 'চলো।'

ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে চলল দু'জনে, খাড়া তীর

বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে ঢুকে আবার এগোল। হাত মুখ ক্রীম মেখে কালো করে ফেলা হয়েছে, পরিধেয় সবকিছুর রঙ গাঢ়, অন্য সব উজ্জ্বল সারফেস কালো ম্যাট ইনসুলেশন টেপে ঢাকা, ধাতব যা কিছু, সব এমনভাবে দেহের এখানে-ওখানে ঝোলানো হয়েছে যাতে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ না ওঠে, কাজেই নির্ভয়ে মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে পিছনের বারো ফুট উঁচু দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল ওরা অল্পক্ষণের মধ্যে।

বসে জিরিয়ে নিল কিছু সময়। উত্তেজনা আর পরিশ্রমে ঘেমে গোসল। ঢপ্-ঢপ্ করছে হৃৎপিণ্ড। সামলে নিয়ে এক হাঁটু গেড়ে বসল শহীদ, সাইলেন্সার লাগানো হেকলারের দীর্ঘ নল তুলল দেয়ালের যেদিকে গার্ড অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম আছে, সেদিকে। জায়গাটা ওদের ডানে, চল্লিশ ফুট দূরে। তখনই দেয়ালের আরেক মাথা থেকে কয়েকটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল অস্ফুটে। কান পাতল সার্জেন্ট। মর জ্বালা!

হাত তুলে তিন আঙুল খাড়া করে জাফরকে দেখাল সে, বুড়ো আঙুল বাঁকা করে উল্টোদিক ইঙ্গিত করল। বিরক্তিতে নাক কোঁচকাল জাফর। বুড়ো আঙুল দেখাল এবার শহীদ, তারপর দু'জনে মিলে লেগে পড়ল খাগড়াছড়িতে বহুবার প্র্যাকটিস করা রুটিন অ্যাকশনে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দু'হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে ভরে হাঁটু গেড়ে বসল সার্জেন্ট। জাফর তার ওপর এক পা রেখে দাঁড়াতে তাকেসহ উঠে পড়ল।

এবার তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা মোটামুটি দেখতে পেল জাফর। ওর কয়েক গজ বাঁয়ে, দেয়ালের চার ফুট নিচে রয়েছে কাঠের তৈরি এক ভাসমান অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম, ওপরে চালাও আছে। ডানেও আছে প্লাটফর্ম, তবে ওটা ফাঁকা। তিনটে ছায়া দেখা যাচ্ছে বাঁদিকেরটায়, আবছামত। গল্প করছে, সিগারেট

ফুঁকছে। ওদের অবস্থান ঠিকমত বুঝে না ওঠা পর্যন্ত সেদিক থেকে নজর সরাল না সে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা–দুটো কাঠামো সরাসরি এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে, অন্যটা পাশ ফিরে। ভিলা দেয়াল থেকে কম করেও একশো গজ ভেতরে।

অবস্থা বুঝে তৎক্ষণাৎ তারকাঁটার বেড়া না কাটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জাফর। অনেক কাছে রয়েছে গার্ডরা, ক্লিপিঙের আওয়াজ যদি না-ও শোনে, বিচ্ছিন্ন হওয়ামাত্র শূন্যে তারের মোচড় খাওয়া নিশ্চয়ই দেখে ফেলবে। অতএব? শহীদের মাথায় চাঁটি মেরে ওকে বসতে বলল সে ইশারায়, নেমে পড়ল মাটিতে। ভেতরের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এক মিনিট পর ফের উঠল, এবার শহীদের দু'কাঁধে পা রেখে।

দু'হাতে দুই কনুইয়ের ওপরটা শক্ত করে ধরল শহীদ, তারপর হাত তুলে দেয়ালের গায়ে নিজের ভর চাপিয়ে দাঁড়াল যাতে কাঁধ স্বাভাবিকের চাইতে সামান্য চওড়া হয়, জাফর তার বাহুর পাকানো পেশীর ওপর দাঁড়াতে পারে। এতে দু'জনেরই সুবিধে। আগের তুলনায় উচ্চতা বেশি হওয়ায় এবার আরও ভাল করে ভেতরটা দেখতে পেল জাফর। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে হেকলারের বাঁট কাঁধে ঠেকিয়ে তৈরি হলো।

তখনই পিছন ফিরে বসা দু'জনের একজন শব্দ করে হেসে উঠল। সুযোগটা মিস করল না জাফর, হাসির আওয়াজ কাজে লাগিয়ে তার পাশেরটার বাঁ পিঠ সই করে গুলি করল। ফুট! ফুট!

হোঁচট খেল সঙ্গীর হাসি, হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকা দেহটা ধরতে যাচ্ছিল সে, পরক্ষণে আবার ফুট! ফুট! অবস্থা বেগতিক, টের পেল ঠিকই তৃতীয়জন, চ্যাঁচাবার জন্যে মুখ খুলেওছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই। জাফরের পঞ্চম গুলি চোয়াল গুঁড়িয়ে দিল তার, পরেরটার ধাক্কায় খুলিসহ উড়ে গেল ঘিলু। একটার ওপর

আরেকটা লাশ গড়িয়ে পড়ল। একটা জ্বলন্ত সিগারেট গড়িয়ে পড়ল নিচে।

'ফিনিশ্!' পিছন ফিরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল জাফর। হেকলার দেয়ালের ওপর রেখে নিজেও উঠে পড়ল। এক মিনিট পর টগ্‌ল রোপ বেয়ে উঠল শহীদ। ছয় ফুটী টগল রোপের এক মাথায় লোহার রাবার পরানো হুক, এবং তিন ফুট পর পর কাঠের চার ইঞ্চি পা দানি আছে, দড়ির দু'দিকে দু'ইঞ্চি করে বেরিয়ে থাকে। প্রয়োজনে ওরকম কয়েকটা জুড়ে যতদূর প্রয়োজন ওঠা-নামা করা সম্ভব।

কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে নেমে পড়ল ওরা। দু'জনেই সন্তুষ্ট। ঝামেলা গেছে, কেটে পড়ার রাস্তাও পরিষ্কার হয়েছে। ছাদে হেঁটে বেড়ানো গার্ডটাকে দেখাল জাফর। 'এখান থেকেই ওটাকে নিলে হত না?'

মাথা নাড়ল পাইলট। 'অন্ধকারে এত দূরের টার্গেটকে গুলি করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এখানে থাকো তুমি। আমি আসছি ওর ব্যবস্থা করে।' দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ওদিকে ছাদের নিঃসঙ্গ গার্ডের যেমন পেয়েছে খিদে, তেমনি করছে শীত। এক সময় রেগুলার ছিল সে। বহু রুশ সৈন্য মেরেছে নিজ হাতে। আগের সরকারের সময় নিয়ম অনুযায়ী অবসর দেয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু কর্নেল মুরাদ আবার ডেকে এনে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। কাবুলে অল্প কিছুদিন কাজ করার পর এখানে বদলি করেছে এই দুই বিদেশী সাংবাদিককে পাহারা দেয়ার জন্যে। সে এই কাজে খুশি। বিদেশী স্পাইদের গার্ড দেয়ার মর্যাদাই আলাদা।

শীত তাড়াবার জন্যে পা ঠুকল গার্ড, দু'হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে তালু ঘষল। ভিলার পিছনদিকের দুই প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ

কুঁচকে তাকিয়ে ভাবল, ব্যাটারা করছেটা কি? টর্চলাইট জ্বেলে দেখলেও তো পারে। হারামজাদা কারেন্টই বা কতক্ষণে আসবে? সারা শহর অন্ধকার, তার মানে মেজর ফল্ট। ওভারলোড, ভাবল সে, ঠিক তাই।

মুখ তুলে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকাল, তখনই চল্লিশ ফুট নিচের বাগানের পথ দিয়ে একটা ছায়া নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ভিলার এক পাশের ড্রেনেজ পাইপের দিকে। মুখ নামিয়ে নিজেকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে পায়চারি শুরু করল গার্ড। প্রতিবার পা ফেলার সময় নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, কাল বাড়তি জার্সি পরে নিতে হবে। এত ঠাণ্ডায় একটা জার্সিতে কাজ হয় না।

ছাদের একমাথায় পৌঁছে অ্যাবাউট টার্ন করল সে, ও মাথার দিকে পা বাড়াল। কয়েক পা যেতেই সামনে ঠুক্ করে একটা আওয়াজ হতে থেমে পড়ল–কিসের শব্দ? ইঁদুর নাকি? ছাদে ইঁদুর? না পাখি? চোখ কুঁচকে আরও এক পা এগোল। না অন্য কিছু?

ওটাই ছিল তার জীবনের শেষ ভাবনা।

নুড়িটা ছুঁড়ে পিছনে তৈরি হয়ে বসে ছিল পাইলট, শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গার্ড সামনের দিকে যাবে জেনে নিশ্চিত ছিল। ঘটলও তাই। এবং তিন পা যেতে না যেতে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল সে। এক হাতে পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে ফাইটিং ছুরি চালাল। থুতনির নিচ দিয়ে সুচালো ব্লেড ঢোকার সময় একটু ব্যথা হলো বটে, কিন্তু ওটা মগজে ঢুকে পড়তে আর কোন যন্ত্রণা থাকল না।

পলকে চিরঘুমে তলিয়ে গেল গার্ড। লাশটা আস্তে শুইয়ে দিল শহীদ। ঠোঁট নড়ে উঠল ওর। 'ওয়ান টু থান্ডারবোল্ট লীডার। ইন পজিশন। ওভার।'

ভিলার সামান্য দূরের এক সাইড রোডে অন্য এক চোরাই গাড়িতে বসে আছে রানা ও অন্যরা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে সিমকা আরেক সাইড রোডে বিসর্জন দিয়ে এটা হাতিয়েছে। একটা টয়োটা পিক্‌আপ এটা।

শহীদের রিপোর্ট শুনে হাসি ফুটল রানার মুখে। ওকে হাসতে দেখে ড্রাইভারের সীটে বসা আলালউদ্দিনও হাসল।

'ভিলার তিনতলায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে,' বলল রানা। 'ওটা কিসের আলো? ওভার।'

'রেডিও রুম ওটা, হ্যারিকেন জ্বেলে কাজ করছে ব্যাটারা। ওপরে ওঠার সময় দেখেছি। ওটার এরিয়াল ছাদে। ওভার।'

কিছুসময় ভাবল রানা। ভিলার ভেতরের লেআউট জানা নেই ওদের কারও। জিম্মি দু'জনকে কোথায় রাখা হয়েছে, তাও অজানা। তবে অনুমান করা যায় হয় চিলেকোঠায়, নয়তো বেজমেন্ট রুমে রাখা হয়েছে ওদের। একজন গার্ড অন্তত থাকবে তাদের সেলের পাহারায়। এবং তার কাছেও নিঃসন্দেহে একটা হ্যারিকেন থাকবে রেডিও রুমের মত। গুড! দ্বিতীয় আলো যেখানে দেখা যাবে, সেখানেই প্রথম হানা দেবে ওরা। মন বলছে বন্দী দু'জনকে বেজমেন্টেই রাখা হয়েছে।

'প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করে যাও, ওয়ান,' বলল রানা। 'সম্ভবত স্ট্রীট লেভেলের নিচে আছে আমাদের টার্গেট। থান্ডারবোল্ট টু?'

'ইয়েস, বস্!'

'ব্যাক ডোরের কাছে পজিশন নাও। আমরা আসছি।'

'ওকে, বস্!'

'ওয়ান, ওদের রেডিও অফ করে দাও। আউট।'

হাসি ফুটল পাইলটের মুখে। ঝোলা থেকে বারো ইঞ্চি দীর্ঘ একটা শেরমালি প্যারা-ইলাম ফ্লেয়ার বের করে যে চিমনি দিয়ে

ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার পাশে রাখল। তারপর বের করল একটা এইটথ্রী স্মোক গ্রেনেড। বিস্ফোরিত হলে অনবরত নীল, ঘন কুয়াশার মত গ্যাস বের হয় ওর মধ্যে থেকে। হুলস্থুলের সময় ডবল হুলস্থুল বাধাতে জিনিসটার জুড়ি নেই।

চিমনির খোলামুখে এক হাতে ফ্লেয়ার ধরে অন্যহাতে ওটার পুল-লূপ টেনে খুলেই ছেড়ে দিল শহীদ, আচমকা বিকট 'হুশ্‌শ্‌!' আওয়াজ উঠল, চিমনির ভেতরটা আলো করে রকেটের বেগে নিচের দিকে ছুটল ওটা। বিস্ফোরিত হলো আগুনে পড়ে। ছিট্‌কে উঠে সারাঘরে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। ভেতরের অবস্থা কল্পনা করে মনে মনে হাসল পাইলট, স্মোক গ্রেনেডটাও ছেড়ে দিল।

তারপর পাইপ বেয়ে রওয়ানা হলো নিচের দিকে। তার আগে রেডিওর এরিয়াল কেব্‌ল্‌ কেটে দিতে ভুল হলো না।

অনেক দেরি হয়ে গেছে কর্নেল মুরাদের। অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রচুর কাজ জমে ছিল অফিসে, সেসব সেরে উঠতেই সন্ধে হয়ে গেল। তারপর যখন বের হতে যাবে, তখনই এসে হাজির হাসান শাহ্‌ বরকতী। মিষ্টি মিষ্টি কথায় অনেকক্ষণ ধরে তাকে নসিহত করে গেছে মানুষটা।

সে সবের সার কথা বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি মুরাদের। সোজা কথায় সে তাকে ভবিষ্যতে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে। তার শিকার কেড়ে নেয়ার যে দুঃসাহস দেখিয়েছে কর্নেল, আগামীতে সে জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। সেই সাথে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে যেন কাল সূর্য ওঠার আগে দুই বাংলাদেশী স্পাইকে অবশ্যই কাবুলে ফিরিয়ে আনে সে।

যন্ত্রণার ওপর যন্ত্রণা! ব্যক্তিগত কপ্টারে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো

যাবে ভেবে এয়ারপোর্টে গিয়ে খেয়েছে আরেক ধাক্কা। ঠিক ওড়ার আগমুহূর্তে এঞ্জিনে ঝামেলা দেখা দিল। অস্থির, অধৈর্য মুরাদ যতবার পাইলটকে জিজ্ঞেস করেছে, 'সারতে আর কত সময় লাগবে?' ব্যাটা ততবার একই জবাব দিয়েছে, 'এই তো, স্যার, পাঁচ মিনিট।'

শেষ পর্যন্ত লেগেছে চার ঘণ্টা। এমন হবে জানলে গাড়িতেই চলে আসত সে। বেগতিক দেখে মিলিটারি বেজের ইন-চার্জের কাছে আর্মির একটা কপ্টার ধার চেয়েছিল মুরাদ, দিল না শালার মোল্লা। একেবারে মুখের ওপর না করে দিল। থাকত যদি সে আজ আর্মিতে, হারামজাদার অন স্পট কোর্টমার্শাল করে তবে ছাড়ত। আধা ডুবে যাওয়া দেশটাকে পুরো ডোবাবে এই শালারা, তাতে কোন সন্দেহ নেই মুরাদের। সে যা হোক, অবশেষে সোয়া একটায় নিজের কপ্টার নিয়েই আকাশে উড়েছে কর্নেল। রাত আর বেশি নেই জানে, বন্দীদের জেরা করার প্রয়োজনীয় সময় পাবে না, তাও জানে। কাজেই সপ্তমে চড়ে আছে মেজাজ।

নিচের অন্ধকার শেষ হয় না দেখে একসময় আবার ধৈর্য হারাল সে, পার্সপেক্সের স্বচ্ছ ক্যানোপিতে জোরে কয়েকবার আওয়াজ করে পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'কি হলো, ভুল করে সাহারায় নিয়ে আসোনি তো আবার?'

'না, স্যার, কর্নেল।'

'তাহলে? কোথায় গেল বাঘলান! এত অন্ধকার কেন নিচে?'

চুপ করে থাকল লোকটা, ভয়ে ঘামছে। তার ধারণা কর্নেল এবার নির্ঘাত মেরে-টেরে বসবে।

'কথা বলছ না কেন?'- রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল তার হুঙ্কার।

'স্যার, মনে হয় কারেন্ট ফেল করেছে বাঘলানের। শহর,

এয়ারপোর্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

আবার হুঙ্কার ছাড়তে যাচ্ছিল মুরাদ, কিন্তু ততক্ষণে বাঘলান বেজের সাথে কথা বলার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লোকটা। অবশেষে কাজ হলো, মিনিট দুয়েক পর সাড়া দিল ওরা। কর্নেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল দু'হাজার ফুট নিচে এমার্জেন্সি জেনারেটর চালিত রানওয়ে ও টার্মিনাল ভবনের আলো জ্বলে উঠেছে দেখে।

ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল। ঠিক পৌনে দুটো বাজে। 'জলদি করো!' বলল সে ব্যগ্র কণ্ঠে। 'জলদি নামাও হারামজাদাকে!'

সাত

'আগুন! আগুন!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল বাইরে।

ডনের বেজমেন্ট সেল থেকে চিৎকারটা আলি শুনল ঠিকই, তবে গায়ে মাখল না। দূর! কিসের আগুন? নিজের কাজ করে যেতে থাকল সে, পিঠ খাড়া চেয়ারের হাতল আর পায়ার সাথে মনের সুখে কষে বাঁধছে সাংবাদিককে।

আবার উঠল চিৎকার, এবার কয়েকটা কণ্ঠে। সঙ্গে ছোটাছুটির আওয়াজ। দেখতে দেখতে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল বাইরে। চারদিক থেকে 'আগুন! আগুন!' চিৎকার আসছে। মনে হচ্ছে গোটা হিন্দুকুশ ধসে পড়েছে বুঝি ভিলার মাথায়।

কি মুশকিল! কর্নেল মুরাদ আসছেন, এখন এ দুটোকে

ইন্টারোগেশনের জন্যে রেডি করতে হবে, আর ওদিকে কি না…সেলের স্টীলের দরজায় ধুম্ ধুম্ কিলের আওয়াজে সিধে হলো আলি। 'অ্যাই, কে ওখানে? কি হয়েছে?' হাঁক ছাড়ল।

করিডরের দৌড়ঝাঁপ আরও বেড়ে গেছে টের পেল সে। গাঢ় অন্ধকারে এ ওর গায়ের ওপর পড়ছে। চিৎকার, ডাকাডাকি, হুড়োহুড়িতে মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা। কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল আলি। 'কে ওখানে?'

জবাব এল, 'আগুন!' আলি নাক টানল। হ্যাঁ, সত্যি, ধোঁয়ার গন্ধ আসছে।

'অ্যাই, গেট খোলো!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'বেরোতে দাও আমাকে!'

দোজখে বা পৃথিবীতে, কোথাও পুড়ে মরার ইচ্ছে নেই তার। তাও সেলে আটকে পড়া ইঁদুরের মত। গেটের চাবি যার কাছে থাকে, তার নাম ধরে কয়েকটা হাঁক ছাড়ল সে। শুনল লোকটা। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ উঠল, পরক্ষণে ঘটাং শব্দে দরজা খুলে গেল। আশ্বস্ত হলো আলি। 'কি হয়েছে?'

'কিচেনে আগুন ধরে গেছে,' হড়বড় করে বলল গার্ড। 'চায়ের ভ্যাট ফেটে গেছে হঠাৎ করে।' সেলের হ্যারিকেনটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'ওটা দেবে কিছুক্ষণের জন্যে? দেখে আসি কি হলো। শালার অন্ধকারে…'

'না না, ওটা দেয়া যাবে না। আমি এখানে…'

বেজমেন্টের সিঁড়ির মাথায় ঝোলানো একটা পেতলের ঘণ্টী সশব্দে বেজে উঠতে থমকে মুখ তুলল সে। গার্ডের দিকে তাকাল। 'নিশ্চই কর্নেল সাহেব! জলদি গেট খুলে দিয়ে এসো। দেরি হলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন কর্নেল। কুক হারামজাদাকে বলো আগুন নেভাতে।'

হোঁচট খেতে খেতে ছুটল গার্ড, করিডরের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা আরও দুই হতভম্ব গার্ডকে নিয়ে মেইন গেটের দিকে এগোল। ধোঁয়ায় চোখে পানি এসে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেউ। হাঁটার ফাঁকে কাঁধ থেকে জিথ্রী নামাল লোকটা, ব্যস্ত হাতে বোল্ট সরিয়ে ভারী গেট টেনে খুলে দিল।

সামনেই কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা এক মোল্লাকে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল তার। লোকটার সঙ্গীও আরেক মোল্লা, তবে বেশ ছোটখাট।

ধোঁয়া লাগায় চোখ কোঁচকাল দীর্ঘদেহী মোল্লা। 'কি হচ্ছে এখানে?' ভরাট, গম্ভীর গলায় চার্জ করল।

'আ-আগুন...'

'আগুন!' গর্জে উঠল রানা। 'কোথায়? বন্দীদের কি অবস্থা?'

'ভা-ভাল, স্যার! স্যার, আপনি?'

'ওটা সরাও, আহাম্মক কোথাকার!' ধমকে উঠল ও তার জিথ্রী দেখিয়ে। 'অস্ত্র কাদের দিকে ধরতে হয় এখনও শেখোনি নাকি?' বলতে বলতে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আলালউদ্দিনও গুটগুট করে ঢুকে পড়ল ওর পিছু পিছু।

গার্ড ব্যাটা ভড়কালেও নিজের দায়িত্ব ভোলেনি। বাইরে আর কাউকে না দেখে কিছুটা অবাক হলো। 'আপনারা মাত্র দু'জন? কর্নেল মুরাদ কোথায়?'

'উনি আসছেন। কিন্তু সর্বনাশ, এসব কি ঘটিয়ে বসছ তোমরা! কর্নেল এসে দেখলে তো...আবার দেখো কেমন উজবুকের মত দাঁড়িয়ে আছে!' চেহারা বিগড়ে গেল রানার। 'গেট খুলে রেখেছ কি মনে করে, গাধার দল! বন্ধ করো! ধোঁয়ার আড়ালে বন্দীরা যদি পালায় গুষ্ঠিসহ মরতে হবে তোমাদের, তা জানো?'

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল গেট। 'স্যার আপনি বন্দীদের কথা জানেন?' ওর পথ বন্ধ করে দাঁড়াল গার্ড।

'অবশ্যই!'

'কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারছি না! আগে কখনও দেখিনি!'

'না দেখে থাকলে চিনবে কি করে, হাঁদারাম?' মাথার ঝাঁকির সাথে নকল দাড়ি দুলে উঠল ওর। 'হোসেন শাহ্ বরকতীর নাম শুনেছ?'

একটু বিস্ময়, একটু শ্রদ্ধা ফুটল গার্ডের চেহারায়। 'নিশ্চয়ই, স্যার। কিন্তু আপনাকে তো তাঁর মত লাগছে না!'

'লাগার কথা নয়, কারণ আমি সে নই। আমি তার ভাই।'

চট্ করে পথ থেকে সরে গেল গার্ড। বিস্মিত। 'ও, তাই নাকি?'

'সে সব পরে হবে, আগে বন্দীরা যাতে দম আটকে না মরে সে ব্যবস্থা করতে হবে।' দৃঢ় পায়ে এগোতে শুরু করল রানা। 'কোথায় আছে ওরা?'

'সেলারে, স্যার।'

'এখনও বের করা হয়নি?' আরেক ছোটখাট হাঁক ছাড়ল ও। 'গাধার দল! নাহ্, ওদের আগে এইসব অপদার্থের ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি।'

আলালের দিকে ফিরল রানা। 'চলো চলো, আগে বন্দীদের পিছনের বাগানে নিয়ে যাই। ওখানে খোলা জায়গায় ভয়ের কিছু থাকবে না।' গার্ডের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা তাড়াতাড়ি আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করো।'

'জ্বি।'

'সেলার কোনদিকে?'

ওদিকে অসহায়ের মত চ্যাঁচাচ্ছে ডন। 'আমাকে বের করো! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। আমার স্ত্রী...'

'চুপ্ করো!' আলি ধমকে উঠল। 'কোথাও যাচ্ছ না তুমি।'

ডনকে কাশতে শুনে চোখ কুঁচকে উঠল তার। খেয়াল করল ধোঁয়ার ঘনত্ব আগের চাইতে বেশ বেড়েছে, লোকটার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে নিরুপায়, কর্নেলের হুকুম নেই নিজে থেকে কিছু করার।

ভারী পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল আলি, ধোঁয়ার মেঘ ঠেলে রানা ও আলালকে বের হতে দেখে চোখ কোঁচকাল। 'কে...?'

'ডন কোথায়?' ধমকের সুরে প্রশ্ন করল রানা।

অবাক হলো সে। চিন্তা-ভাবনা না করেই বলে বসল, 'এখানে। কেন? কে জানতে চায়?'

পাত্তা দিল না ও। 'যূথী?'

'অ্যাঁ!'

'যূথী?' একই সুরে, একই ভঙ্গিতে বলল ও।

'ও...ওপাশে আরেক রুমে।'

'ঠিক আছে।' ডনের বাঁধন দেখল রানা ঝুঁকে। 'জলদি খোলো একে, পিছনের বাগানে নিয়ে যেতে হবে।'

'কে দিয়েছে অর্ডার?' অনিশ্চিত চেহারায় প্রশ্ন করল আলি। 'কর্নেল মুরাদ?'

'নয়তো কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। তাকাল এমনভাবে যেন বোকার মত প্রশ্ন করেছে লোকটা।

'ঠিক আছে। আমি বাগানে নিয়ে যাচ্ছি ওকে।'

'আমরা নিয়ে যাব,' কড়া চোখে তাকাল ও। 'তোমাকে ওর বাঁধন খুলতে বলেছি, তুমি তাই করো।'

আবার লোকটার চেহারায় অনিশ্চিত ভঙ্গি ফুটল, তবে মুখে

কিছু বলল না। শ্রাগ করে বাঁধন খুলতে লেগে গেল। প্রথমে হাতের বাঁধন খুলল, তারপর পায়ের। পরক্ষণে যা ঘটল, সে জন্যে কেউ তৈরি ছিল না। তখনও পুরো সিধে হতে পারেনি আলি, ডান পায়ে গায়ের জোরে তার থুতনিতে লাথি ঝেড়ে দিল ডন। এত জোরে লাগল ওটা যে রুমের অর্ধেক দূরত্ব উড়ে পেরিয়ে গেল ছোটখাট পাঠান।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মেঝেতে পড়ে থাকল। কিন্তু যেই দেখল আবার তেড়ে আসছে ডন, এক ঝট্‌কায় পাশে পড়ে থাকা নিজের জিথ্রী তুলে নিল। তবে তোলা পর্যন্তই, আর এগোতে পারল না। আলালউদ্দিনের সাইলেন্সার পরানো একই অস্ত্রের এক সেকেন্ডের ব্রাশে গোটা মাথাটাই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল তার।

থতমত খেয়ে ব্রেক কষল সাংবাদিক, চোখ কপালে তুলে ওদের দিকে তাকাল। রানাকে হাসতে দেখে আরও বাড়ল বিস্ময়।

'শান্ত হোন,' বলল ও। 'আর ভয় নেই, আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। চলুন, আপনার স্ত্রীকে বের করি আগে।'

তালেবান মোল্লার মুখে খাস বাংলা শুনে বিস্ময়ের মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগল ডন। অনেক কষ্টে বলল, 'আপনারা...?'

'বাংলাদেশী,' মধুর হাসি দিল ও। 'ডকুমেন্টটা কোথায়?'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দু'চোখ। 'ড-ড-ডকুমেন্ট! ও হ্যাঁ, ওটা আমার স্ত্রীর কাছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'চলুন।' পরমুহূর্তে অন্য চিন্তা ঢুকল মাথায়। 'না, এখানেই থাকুন আপনি। আলাল, তুমি এঁকে গার্ড দাও, বন্ধ রাখো দরজা। আমি আসছি এখনই।'

রুমটা খুঁজে বের করতে পনেরো সেকেন্ডও লাগল না। ডনের সেলের দুই রুম পরে ওটা। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে আলো

জ্বলছে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে নজর বোলাল রানা। একটা কাঠের প্যাকিং বক্সের ওপর ইরাজকে বসা দেখল, যূথী বসা রুমের আরেক কোণে। ওকে কি যেন বলছে লোকটা হাসিমুখে। পায়ের শব্দে দু'জনেই মুখ তুলল।

'তুমি জানো না বিল্ডিঙে আগুন লেগেছে?' জবাবদিহির সুরে ইরাজকে প্রশ্ন করল রানা। ডান হাত দেহের পিছনে আয়েশী ভঙ্গিতে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে দাঁড়াল সে। লোকটা কে ভেবে পাচ্ছে না। 'জ্বি? শুনলাম প্রায় নিভে এসেছে নাকি!'

'তোমার মাথা!' গর্জন করে উঠল রানা। 'জলদি বের করো ওকে! বাড়ির ছাদ ধসে পড়তে যাচ্ছে, আর এদিকে তুমি বসে বসে গল্প করছ?' যূথীর দিকে ফিরল। 'বের হয়ে আসুন।'

চোখ কুঁচকে উঠল ইরাজের। 'কার অর্ডারে নিয়ে যেতে চাইছেন ওকে?'

'কর্নেল মুরাদ।'

'কোথায় তিনি?' অবিচল দেখাল লোকটাকে।

'আসছেন।'

'ঠিক আছে, আগে আসতে দিন। তার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত...' বলতে বলতে নিজের জিথ্রী তুলল গার্ড। 'আমি...' আর বলতে পারল না। হাতের কাজও পুরো করতে পারল না।

পিছন থেকে আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে এল রানার ব্রাউনিং ধরা হাত, গলায় আর বুকে স্লেজহ্যামারের ভয়ঙ্কর দুই আঘাত খেয়ে উড়ে পিছনের দেয়ালের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল ইরাজ। তারপর হুড়মুড় করে মেঝেতে। ভয়ে জমে গেল যূথী, হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। লাশটার দিকে তাকাল না পর্যন্ত ও, হাত বাড়াল যূথীর দিকে। 'আসুন. আমরা আপনাদের দেশে

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। কয়েকবার চেষ্টা করেও কথা বলতে ব্যর্থ হলো।

'কই আসুন!' তাড়া লাগাল রানা।

'আপনি বাঙালী?'

'হ্যাঁ, এবং বাংলাদেশী। জলদি করুন। ডকুমেন্টটা কোথায়?'

'অ্যাঁ!!!' চুলের প্রান্তে পৌঁছে গেল তার চোখ।

'কামন, যূথী। ওটা দিন আমাকে। আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে। এবং দয়া করে তাড়াতাড়ি আসুন। এরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগে পালাতে হবে আমাদের।'

'কি? এই আগুন...এসব...'

'হ্যাঁ, এসব আমরাই ঘটিয়েছি। আসুন। আপনার স্বামী অপেক্ষায় আছেন।'

ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটি, এক হাত উঠে গেছে মাথার পেছনে। এক মুহূর্ত পর খুদে এক ফিলম্ ক্যাসেট দেখা গেল সে হাতে। 'এই যে।'

নিল রানা। দেখেই বুঝল মিনক্স। ওটা জ্যাকেটের পকেটে চালান করে ঘুরে দাড়াল। 'আসুন।'

দরজা টেনে দিয়ে ডনের সেলে এল ওরা, রানার সঙ্কেতিক টোকা শুনে আলাল দরজা খুলে দিল। ভেতরে স্বামী-স্ত্রীর দু'হাত আলগা করে বাঁধতে নির্দেশ দিল রানা, নইলে অন্য গার্ডরা সন্দেহ করে বসবে। কাজটা শেষ হতে বেরিয়ে পড়ল ওরা—রানা আগে, আলাল পিছনে। যূথী ও ডন মাঝখানে। সিঁড়ি ভেঙে করিডরে উঠে এল দলটা, তারপর ডানে এগোল শহীদের উঁচু গলা শুনে। ধোঁয়া ততক্ষণে অনেক কমে গেছে, প্রায় পরিষ্কার দেখা যায় সব।

বড় এক হলরুমে এসে পড়ল ওরা। শহীদকে দেখা গেল শেষ

মাথায় কিচেনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চার তালেবান গার্ডকে ধমক-ধামক মেরে কাজ করাতে। বালতি নিয়ে ছোটাছুটি করছে লোকগুলো। ওদের দেখে ইঙ্গিতে বাগানে বের হওয়ার দরজা দেখাল সে, 'তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে যান। বসিয়ে রাখুন বাইরে। অ্যাই, জলদি করো তোমরা। কর্নেল মুরাদ এসে পড়লে সর্বনাশ...'

দরজা খুলে পিছনের বাগানে বেরিয়ে পড়ল চারজনের দলটা। ওদের দেখে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল জাফর, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। 'সোজা চলুন, বস্। গ্র্যাভেল পথ ধরে সোজা। দেয়ালের কাছে পৌঁছে ডানে যাবেন।'

'আপনারা কারা?' প্রশ্ন না করে পারল না বিস্মিত সাংবাদিক। যদিও জবাব আশা করেনি, এবং এলও না।

বিনা বাধায় দেয়ালে বাঁধা টগ্‌ল রোপের মইয়ের সামনে পৌঁছে গেল দলটা। আলাল উঠল আগে, ওপাশটা দেখে নিয়ে ওদের সঙ্কেত দিয়ে গায়েব হয়ে গেল দেয়াল টপকে। এবার উঠল ডন, তারপর যূথীকে অনুসরণ করল জাফর। সবার শেষে রানা। তারপর টান করে বাঁধা লাইন ধরে নিরাপদেই এক এক করে নদী পার হয়ে গেল ওরা।

জাফর আহমেদ রয়ে গেল পাইলটের অপেক্ষায়। কিন্তু আসছে না কেন সে? এত দেরি করছে কেন?

'জল্‌দি করো, জল্‌দি!' ভেতরে তখনও চার গার্ডকে ব্যস্ত রেখেছে শহীদ। কোনদিকে তাকাবার সুযোগই দিচ্ছে না। তারাও রীতিমত তটস্থ আসমান থেকে পড়া দীর্ঘদেহী, অচেনা মোল্লার হুকুম পালনে। কিন্তু বেশিক্ষণ বহাল থাকল না পরিস্থিতি, এক তরুণ গার্ড পানি টানা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'কিন্তু, স্যার, আগুন তো নিভে গেছে!' বলল সে।

'ননসেন্স! কয়লার স্তূপের চাপা আগুন যে কোন মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে আবার। তাহলে এত কষ্ট সব মাঠে মারা যাবে।' এইবার সময় হয়েছে কেটে পড়ার, ভাবল সে। ব্যাটারা সেয়ানা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

কিন্তু সুযোগ হলো না। বাইরে থেকে এক বয়স্ক ও এক তরুণ গার্ড এসে ঢুকল হলরুমে, শহীদকে রানা ভেবে ভুল করল প্রথমজন। 'এই যে, আপনি না বললেন কর্নেল মুরাদ আসছেন? কই, কোথায় তিনি?'

'আছেন নিশ্চয়ই ধারেকাছে কোথাও,' শ্রাগ করল পাইলট। 'হয়তো ওপরের রেডিও রুমে গেছেন।'

'আর বন্দীরা? ওদের বাগানে কেন নিয়ে যাওয়া হলো?'

অবাক হওয়ার ভান করল পাইলট। 'কে বলল বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ওরা তো সামনে দিয়ে গেল। আমি...' থেমে গেল সে অস্ত্র কক্ করার শব্দ উঠতে, ঘুরে তাকাল। লোকটার সঙ্গী তরুণ গার্ডকে দেখল ওর দিকে জিথ্রী তাক্ করে ধরে থাকতে।

'আমি ছিলাম সামনের গেটে,' বলল সে। 'ওই পথে যায়নি কেউ।'

'তোমার অস্ত্র ফেলে দাও,' প্রথমজন বলে উঠল শহীদের উদ্দেশে। 'সাবধান! একটু এদিক-ওদিক হলে মাথা ছাতু করে দেব।'

এ মাথার দড়ি খুলে অপেক্ষা করছে জাফর আহমেদ। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বেশি পেরিয়ে গেছে, এখনও শহীদের ফেরার নাম নেই দেখে উদ্বিগ্ন। জানে দেরির জন্যে কাঁচা চিবিয়ে খাবে মাসুদ রানা, তবু জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছে না সে।

কি করা যায় ভাবছে, তখনই ভেতর থেকে কয়েকটা চড়া গলার চিৎকার ও কয়েক জোড়া পায়ের দৌড়ে আসার শব্দ শুনে চমকে উঠল। মুহূর্তে বুঝে ফেলল ঝামেলা হয়ে গেছে, আর দেরি করার উপায় নেই। যথাসম্ভব নিঃশব্দে পানিতে নেমে পড়ল সে, একই সময়ে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ডান বাহুতে যেন আগুন ধরে গেল, তীব্র যন্ত্রণায় সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল জাফর।

হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল দড়ি, মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল আবার। টের পেল ডান হাত অবশ হয়ে আসছে। চারপাশের পানিতে বৃষ্টির মত গুলি পড়ছে দেখে ডুব দিল জাফর। একহাতে প্রাণপণে দড়ি চেপে ধরে থাকল, এগোবার শক্তি খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে আঁধার দেখছে।

এমনসময় দড়িতে টান পড়ল।

বেশ জোর ঝাঁকির সাথে ল্যান্ড করল কর্নেল মুরাদের কপ্টার, একটা স্কি ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, কিন্তু তাতে কিছু মনে করল না সে। নামতে যে পেরেছে জায়গামত, তাতেই মনে মনে কৃতজ্ঞ। রোটর স্লো হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে, নেমে পড়ল সে।

ঝুঁকে দ্রুত পায়ে এগোল টার্মিন্যালের দিকে। টার্মিন্যাল ভবনের বাইরে তার জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে ফুল ইউনিফর্মড্ এক তালেবান যোদ্ধা, কর্নেলকে দেখে কড়া এক স্যালুট ঝেড়ে দিল সে।

পাত্তা দিল না মুরাদ। তাকালই না। 'ইলেক্ট্রিসিটি ফেল হয়েছে কখন?' উঠে বসে প্রশ্ন করল রাগ রাগ গলায়।

'ঘণ্টাখানেক হবে, স্যার।'

'হুঁম!' চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'জলদি চালাও।'

এত যত্ন করে সাজানো-গোছানো পরিকল্পনা এমন দ্রুত ওলট-পালট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে দেখে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না মাসুদ রানা। সর্জেন্ট শহীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল, শিডিউলড্ সময়ের পিছনে পড়েই সমস্যাটা বাধিয়ে বসেছে ও, ভাবছে রানা। এদিকে আহাম্মক জাফর, সেও অমার্জনীয় অপরাধ করেছে।

সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে নিজেই মরতে বসেছে, এখন ঘাড়ে করে তার অজ্ঞান দেহ টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে দুশো গজ দূরে অপেক্ষমাণ টয়োটা পর্যন্ত। তার চেয়ে বিপদের কথা দলের নির্ভরযোগ্য এক পাইলটকে হয়তো হারিয়েছে ওরা।

অজ্ঞান জাফরকে টেইলবোর্ডে শুইয়ে দিল রানা, আলালকে তার পাশে তুলে দিয়ে ডন ও যূথীকে সামনে বসতে বলল। নিজে বসল চালকের আসনে। মুহূর্ত পর বাঘলান এয়ারপোর্টের দিকে পিক্-আপ ছোটাল। হেডলাইট জ্বালার দরকার হলো না, কারণ আলাল আগেই এটায় বিকল্প ইনফ্রা-রেড হেডলাইট সেট করে ফেলেছে। তারওপর সিইউবি ভিউয়ার পরা থাকায় ফুল স্পীডে ছুটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

উদ্বেগ অমূলক প্রমাণ হলো রানার, শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছতে পারল এয়ারপোর্টে। কোন বাধা এল না। ওকে উন্মত্তের মত ড্রাইভ করতে দেখে সারা পথ ভয়ে সিঁটিয়ে থাকল দুই সাংবাদিক, অপ্রত্যাশিত মুক্তির আনন্দ সম্ভাব্য মৃত্যুর আশঙ্কায় অনেক আগেই হাওয়া হয়ে গেছে। তবু মুখ খুলতে সাহস পেল না ওরা রানাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর আর চিন্তিত দেখে।

এয়ারপোর্টে এমার্জেন্সি বাতি জ্বলছে দেখে কপ্টার পার্কের একটু দূরে পিক্-আপ দাঁড় করাল রানা। বেরিয়ে এসে নকল দাড়িসহ যাবতীয় পরিধেয় ঝট্‌পট্ বদলে ফেলল। ওদিকে

ততক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে জাফরের। নিজের মেডিক্যাল কিটের মরফিন পুশ করে তার ব্যথা গয়েব করে দিয়েছে আলালউদ্দিন। তবে প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, কারও সাহায্য ছাড়া নড়তে পারছে না।

তৈরি হয়ে ডনের দিকে ফিরল রানা। 'আমরা দু'জন ভেতরে যাচ্ছি,' আলালকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল। 'কাজ সেরে টর্চলাইট জ্বেলে সঙ্কেত দেব, সাথে সাথে আমাদের এই আহত সঙ্গীকে নিয়ে চলে আসবেন আপনারা।'

'আমরা এখানে কেন এসেছি?' বলল যূথী।

'একটু পর জানতে পারবেন। যা বলেছি ভুলবেন না।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'আলাল, এসো।'

পরস্পরের দিকে তাকাল স্বামী-স্ত্রী, এক মুহূর্ত পর সামনে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল ওদের দু'জনের চিহ্নও নেই দেখে। চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে প্রেতের মত। জায়গামত পৌঁছে কাটার নিয়ে ফেন্সের ওপর ঝুঁকে বসল রানা, মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডে দুই মানুষ যেতে পারে এমন এক ফাঁক তৈরি করে ফেলল।

'এখানে থাকো,' আলালকে নির্দেশ দিল ও। 'কপ্টারের স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনলেই ওদের সঙ্কেত দেবে। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বি।'

ঢুকে পড়ল রানা। হেকলার বাগিয়ে সতর্ক পায়ে এগোল। কোন দরকার ছিল না, কম্পাউন্ড একদম ফাঁকা। জায়গামত পৌঁছে নীল জেট রেঞ্জারটাকে খুঁজে পেতে কোন সমস্যাই হলো না। তবে আরেকটা জেটরেঞ্জার থেকে ইগনাইটার প্লাগ খুলে এনে জুড়তে মূল্যবান কয়েক মিনিট সময় নষ্ট হলো। তারপর কক্‌পিট লাইট

জ্বেলে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল চেক্ করল রানা, ঠিক আছে সব। লম্বা করে দম নিয়ে স্টার্টার বাটন টিপে দিল।

ভোঁতা 'হুপ্' শব্দ করে বাতাসে বাড়ি মারল প্রকাণ্ড ব্লেড; আড়মোড়া ভেঙে যেন নিতান্ত ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘুরতে শুরু করল। তারপর, প্রতি পাকে বাড়তে শুরু করল গতি। অস্ত্র বাগিয়ে উঁকি দিল রানা, উদ্বিগ্ন চোখে ওরা আসছে কিনা দেখার চেষ্টা করল। মনে হলো কয়েকটা ছায়া নড়ছে–হ্যাঁ, চারটে ছায়া। একটা আগে, তিনটে পিছনে।

ওরা তখনও বিশ গজ দূরে, এমন সময় একজোড়া ডিপড্ হেডলাইট দেখতে পেয়ে বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। এদিকেই আসছে! যথেষ্ট দূরে আছে অবশ্য। একলাফে নেমে পড়ল ও, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল আলালদের। সেই সাথে নীলচে সিগন্যাল লাইট দোলাচ্ছে পাগলের মত।

কাজ হলো। কষ্ট হলেও পা চালাবার গতি বাড়িয়ে দিল জাফর। ডন ও যূথীর কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে সে। ওদের তুলে দিয়ে আরেকবার হেডলাইট দুটো দেখে নিয়ে উঠে পড়ল রানা, দ্রুত চোখ বোলাল প্যানেলে। আরপিএম ৮৫তে শো করছে কাঁটা, বিকট আওয়াজ করছে এঞ্জিন, গোটা কপ্টার ঝাঁকি খাচ্ছে ভীষণভাবে। ওদিকে ব্যাপার টের পেয়ে গাড়িটা হঠাৎ হেডলাইট হাই করে হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসতে শুরু করল।

গুলি ছুঁড়ছে একনাগাড়ে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। বাগে পাওয়ার আগেই ভেসে পড়ল জেট রেঞ্জার, আকাশে ওটার কালচে কাঠামো দ্রুত ছোট হতে হতে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

নতুন বন্দীর ব্যাপারে কোনরকম চান্স নিতে রাজি নয় গার্ডরা। জানে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে, কর্নেল মুরাদ পৌঁছলে কপালে

যা আছে তা ঘটবেই, একে তখন তার সামনে ধরে দিয়ে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যাবে ভেবে ডনের সেলে আটকে রেখেছে তারা শহীদকে। শুধু আটকে নয়, হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে। দুই গার্ড পাহারা দিচ্ছে সেল।

ওদিকে ভেতরে নিজের আহাম্মকির জন্যে পস্তাচ্ছে সার্জেন্ট। আগে থেকে বেঁধে দেয়া সময়ের অতিরিক্ত নষ্ট করেছে সে বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে, এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। বিরক্তি আর হতাশা চরমে পৌঁছুতে চ্যাঁচাতে শুরু করল সে। পশতুতে যত জঘন্য, বাছাই করা গাল জানা আছে, এক এক করে তার সব দুই গার্ডের উদ্দেশে ঝাড়তে লাগল। তবু গায়ে মাখছে না ব্যাটারা। ভেতরে আসছে না ওর মুখ বন্ধ করাতে, শহীদও কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে না।

এক সময় হতাশ হয়ে ক্ষ্যান্ত দিল সে। সময় ফুরিয়ে গেছে বুঝতে পারছে, দলের সাথে যোগ দেয়ার কোন উপায় নেই আর। চলে গেছে ওরা। এখন যদি কিছু করতে পারে সে, কোনমতে এদের মুঠো গলে বের হতে পারে, বাকিটাও নিজেকেই করতে হবে। কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কি করবে সে? এই অবস্থায় করার আছে কি? কন্টিনজেন্সি প্ল্যান অবশ্য আছে একটা, তা হলো মূল দল থেকে অ্যাকশনের সময় কেউ আলাদা হয়ে পড়লে তাকে শহরের ছয় মাইল দূরের বিশেষ এক জায়গায় পৌঁছতে হবে ভোর চারটের মধ্যে। পিঙ্ক প্যান্থার নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করবে ড্রাইভার হেকমত আলি। জালাল ও হামিদাকে তুলে নিতে ওখানে থাকবে সে। যেখান থেকে থান্ডারবোল্ট ওয়ান মূল মিশন শুরু করেছিল, সেখানে। ওর মধ্যে যদি না পৌঁছায় সে বা তারা, চলে যাবে ওরা। সে যদি টীম লীডারও হয়, তবু। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে

হলে তখন তাকে বা তাদেরকে নিজের চেষ্টায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বোকামি যা করার করে ফেলেছে, ভাবছে শহীদ, এখন পালাতে হবে যে করে হোক। বাঁচতে হবে। হাজার শোকর যে আহত হয়নি সে, একদম সুস্থ আছে। হাত-পা, মাথা, কাজ করছে ঠিকমতই। অতএব বসে বসে চিন্তা না করে পালাবার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত।

হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টায় লেগে পড়ল সে মনস্থির করে। বিসিআইয়ের প্রত্যেক অপারেটরকে পেশী নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের যত বিদ্যে আছে, সব অনেক যত্নের সাথে শেখানো হয়। এই ট্রেনিং তাদের ক্যারিয়ারের অন্যতম মূল ভিত্তি। ওদের কাউকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হলে; যে বাঁধবে, তাকে প্রথমে দড়ি এবং নট্ সম্পর্কে হাফেজ হতে হবে। একটু পরই শহীদ টের পেল এ ব্যাটারা তা নয়।

কয়েক মিনিটের চেষ্টার পর বাঁধন খুলতে পেরে আশ্বস্ত হলো শহীদ। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসতে পরের পদক্ষেপ নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। সবচেয়ে ভাল হয় বাথরুম দিয়ে চেষ্টা করলে। এ বাড়ি সত্যি সত্যি জেলখানা নয়, একটা আবাসিক বাড়ি, কাজেই বাথরুমে জানালা না হোক, ছোটখাট ফোকর নিশ্চয়ই আছে। ওর জ্যাকেটের কলারে সেলাই করে জুড়ে রাখা বিশেষ হ্যাকস' ব্লেড দিয়ে ফোকরের লোহার বার কাটা কোন সমস্যাই হবে না।

এবং বাথরুম নিশ্চয়ই বাড়ির পিছনদিকে কোথাও হবে। বের হতে পারলে কার্নিস হয়ে গাছ বেয়ে দেয়ালে পৌঁছানো কোন সমস্যাই হবে না।

তবে কাজে নামার আগে একটু অপেক্ষা করবে ঠিক করল শহীদ। ওর মন বলছে অন্য সুযোগ আসবে, এত কষ্টে যেতে হবে না। দেখা গেল ওর ধারণাই ঠিক। সুযোগ এল। প্রথমে কয়েকটা

উত্তেজিত গলা ভেসে এল, একটু পর কয়েকজোড়া ব্যস্ত ভারী পায়ের শব্দ। তারপর অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। আবার উঠল পায়ের আওয়াজ, তবে এবার ধীর।

আওয়াজ একেবারে কাছিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে উঠে পড়ল ও, দু'হাত পিছনে রেখে পায়চারি করতে লাগল। আসলে লাফ দেয়ার জন্যে মনে মনে রেডি। চেহারায় যথাসম্ভব পরাজিত, হতাশ ভাব ফুটে আছে। দুই গার্ড ঢুকল গেট খুলে, বন্দীর হার মানা চেহারা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে একজন ঘোষণা করল, 'কর্নেল মুরাদ এসে পড়েছেন। এবার বুঝবে তুমি বিদেশী স্পাইদের সঙ্গে কি আচরণ করি আমরা।'

হাঁদা বুঝল না ব্যাপারটা, কিন্তু কয়েক হাত পিছন থেকে মুরাদ ঠিকই বিপদ টের পেয়ে গেল। চেঁচিয়ে গার্ডদের সতর্ক করতে চাইল সে, কিন্তু হলো না। নিজে পিছিয়ে সরে যাবে, তাও পারল না। ভারী বুট পরা পা ঝট্ করে তুলেই পাশ থেকে প্রথম গার্ডের হাঁটুর সামান্য ওপরে গায়ের জোরে লাথি মেরে বসল শহীদ, অনেকটা পোল-অ্যাক্স চালানোর ভঙ্গিতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ম্যাচের কাঠির মত মুট করে দুই খণ্ড হয়ে গেল তার পা, আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল সে।

পরক্ষণে দ্বিতীয় গার্ডের কাঁধে ঝোলানো জিথ্রী লক্ষ্য করে থাবা চালাল শহীদ, একই মুহূর্তে ডান হাতে ভয়ঙ্কর এক বাঁ হাতি পাঞ্চ বসিয়ে দিল তার সোলার প্লেক্সাসে। উড়ে গেল সে, দেয়ালে বাউন্স করে কেটে পড়ার চেষ্টায় ব্যস্ত কর্নেলের উরুর ওপর আছড়ে পড়ে তার গতিরোধ করল। এই ফাঁকে হেকলার নিয়ে একলাফে গেটের চার হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে শহীদ।

ওর কুঁচকি সই করে সবেগে ডান পা ছুঁড়ল কর্নেল, অস্ত্র পায়ের কাছে ফেলে পা-টা খপ্ করে দু'হাতে ধরে বসল ও, টান

মেরে তুলে ফেলল ওপরে। অন্য পা পিছলে গেল মুরাদের, পিঠ আর মাথা দিয়ে ঠাস্ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ে গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। চোখের সামনে সব ঘোলা হয়ে গেছে। সবকিছু কয়েকটা করে দেখছে সে।

দ্বিতীয় গার্ড উঠে পড়েছে দেখে কারবাইনের বাঁট দিয়ে আগের জায়গায় অরেক গুঁতো মেরে তার বিকৃত চেহারা আরও বিকৃত করে দিল সার্জেন্ট। লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেল থেকে। দরজা বাইরে থেকে লক্ করে চাবি ছুঁড়ে মারল অন্ধকার করিডরে, তারপর সামনে ছুটল।

সামনের দরজার বয়স্ক গার্ড হাঁ হয়ে গেল ওকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখে। ধাক্কা সামলে উঠে কাঁধ থেকে জিথ্রী নামাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু হলো না। সার্জেন্টের ব্রাশ ফায়ারে দেহ নিখুঁত ভাবে দুভাগ হয়ে গেল তার। মেইন গেটের একমাত্র গার্ড ভেতরে গুলির আওয়াজ শুনে সতর্ক হলো ঠিকই, তবে একটু দেরিতে। গলায় আর পেটে তিন-চারটে গুলি খেয়ে উড়ে গিয়ে গেটের ওপর আছড়ে পড়ল সে। তার খোলা চোখের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল শহীদ, বাধা দিতে পারল না, কারণ চোখ খোলা থাকলেও ওতে দৃষ্টিশক্তি ছিল না।

বেরিয়ে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকাল সার্জেন্ট, কর্নেল মুরাদের গাড়ি নিয়ে ভাগবে ঠিক করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল। ঠিক তখনই ওপরের কোন জানালা দিয়ে ব্রাশ ফায়ার হলো। পায়ের কাছে এক রাশ ধুলো আর নুড়ি উড়ল।

গাড়ির আশা বাদ দিয়ে দৌড় দিল সার্জেন্ট।

হামিদার চাচার বাড়ির কাছে যখন পৌঁছল সে, তখন প্রায় রাত তিনটা। জানে জালাল বা হামিদা কাউকে পাওয়া যাবে না এখন,

ওরা চলে গেছে, তবু একবার খোঁজ নিয়ে যাবে বলে থামল। অন্ধকার রাস্তা যতদূর মনে হচ্ছে ফাঁকা, কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। গাছের আড়ালে আড়ালে সাবধানে এগোল সে।

বাড়িটার সোজাসুজি রাস্তার ওপর পৌঁছে দাঁড়াল। ডানে-বাঁয়ে শেষবারের মত দেখে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। গেট খোলা কেন? একদম হাঁ করে খোলা, কেন? আর ওটা কি পড়ে আছে গেটের সামনে? এক পাটি জুতো না? তাই তো মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি?

ঝপ্ করে বসে পড়ল সার্জেন্ট। ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে। কি ঘটেছে এখানে? ওরা ধরা পড়েছে? কিন্তু কি করে? কেন? হামিদার বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়ে গেছে তালেবান সরকার? কিন্তু...কি করবে বুঝে উঠতে পারল না শহীদ। বাড়ির ভেতরে ঢুকবে না এখান থেকেই সরে পড়বে, ভেবে পেল না। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সময়মত নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে না পারলে গাড়ি চলে যাবে। কি করা যায়?

প্রায় এক মিনিট কান খাড়া করে বসে থাকল সে, যদি ভেতর থেকে কোনরকম সাড়া শব্দ আসে, সেই আশায়। এল না। অতএব সাহসে ভর করে উঠে পড়ল। কারবাইনে বেশি গুলি নেই, তাই রিপিট ফায়ারে সেট করল ওটা, তারপর যতটা সম্ভব ঝুঁকে এগোল। না, তেড়ে এল না কেউ। নিরাপদেই জুতোটার কাছে পৌঁছে গেল সে। দামী এবং আধুনিক জুতো–তার মানে এটা জালালেরই হবে।

ধুলোয় গভীর টানা-হ্যাঁচড়া এবং টায়ারের দাগ দেখে বুঝে ফেলল শহীদ কি ঘটেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফোঁস করে, মাথা নেড়ে আফসোস প্রকাশ করল। কিচ্ছু করার নেই এখন। আরও কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ-পাতাল ভাবল

সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। এবং জমে গেল কাছেই ফোঁপানোর মত একটা শব্দ শুনে। আওয়াজটা লক্ষ্য করে ঝট্ করে অস্ত্র তুলল।

থমকে গেল কালো চাদর মুড়ি দেয়া মূর্তিটা দেখে। 'কে?'

'আ-আমি। হামিদা।'

অবাক হয়ে গেল সার্জেন্ট। 'হামিদা! আপনি এখানে...কি ব্যাপার?'

'জালালকে...' চাদরে চোখ মুছল মেয়েটি। 'জালালকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

'ওরা কারা? সরকারী গার্ড বাহিনী?'

'হ্যাঁ। আমার ভাই...'

'ভাই?'

'হ্যাঁ। আমার ভাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ওদের।'

'সে কি!' তাজ্জব হয়ে গেল শহীদ।

ক'দিন আগে কাবুলের পার্কের সেই ঘটনা বলল হামিদা। 'নিশ্চই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে...'

'তাই বলে এইভাবে? ওরা আপনাকেও যে পেলে ছেড়ে দিত না, এই সহজ ব্যাপারটা দাউদের মাথায় এল না! কিন্তু...আপনি বাঁচলেন কিভাবে?'

'আমি...' থেমে আবার চোখ মুছল মেয়েটি, নাক টানল। 'আমি মাকে আর বড় বোনকে ফোন করতে শহরে গিয়েছিলাম। লাইন পেতে দেরি হয়ে গেল, এই ফাঁকে...বাড়ির কাছে এসে গাড়ি, অনেক লোক আর হৈ-চৈ শুনে লুকিয়ে পড়ি আমি।'

'কখন ঘটেছে এ ঘটনা?'

'এক-দেড় ঘণ্টা আগে।'

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, হামিদা। কিন্তু এখন কিছু করার নেই এ

ব্যাপারে।' অল্প কথায় মিশনের সাফল্য এবং নিজের বিছিন্ন হয়ে পড়ার কথা জানাল সে। 'এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম বলে দেখে যেতে চেয়েছিলাম। না এলে তো ঘটনা জানাও হত না। ইশ্, কি বিপদেই না পড়া গেল।

নতমুখে মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'হ্যাঁ, মানে...'

'কিন্তু আপনি এখানে কেন অপেক্ষা করছিলেন শুধু শুধু? জায়গামত চলে যাননি কেন? আমি না এলে...'

'আমি লোকেশন চিনি না,' মিনমিনে গলায় বলল সে।

এক মুহূর্ত ভাবল সার্জেন্ট। 'চলুন তাহলে আমার সঙ্গে। সময় বেশি নেই। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হামিদা। যেতে চায়, কিন্তু পা গেড়ে আছে মাটির সাথে।

তাড়া লাগাল শহীদ। 'পিছনের কথা ভেবে লাভ নেই, হামিদা। শোকর করুন যে আপনিও ধরা পড়েননি। এখন চলুন, নইলে অনেক বড় বিপদে পড়তে হবে।'

তবু খানিক ইতস্তত করল মেয়েটি, তারপর চোখের পানি মুছে ঘুরে দাঁড়াল। 'চলুন।'

যথাসম্ভব দ্রুত এগোবার চেষ্টা করল সার্জেন্ট। কিন্তু হামিদার জন্যে হলো না। সময়মত পৌঁছানো গেল না। এসে দেখল চলে গেছে হেকমত আলি।

আট

উঁচু একটা রিজ টপকে জেটরেঞ্জারের উচ্চতা কমিয়ে আনল মাসুদ রানা। সামনে প্রশস্ত, গভীর উপত্যকা। চারদিকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার অসংখ্য চুড়ো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে–উঁচু-নিচু, সরু-চওড়া। কালচে দানবীয় আকৃতি।

'প্রায় এসে পড়েছি,' বলল আলাল ওরফে টাইগার। কোলের ওপর রাখা ম্যাপ দেখছে সে ম্যাপল্যাম্প বীমের সাহায্যে।

আরও ভাল করে সামনে দেখার জন্যে ঝুঁকল রানা। ক্যানোপির ভেতর দিয়ে নিচের ঊষর ল্যান্ডস্কেপ মোটামুটি পরিষ্কার দেখতে পেল তারার আলোয়। সাপের মত আঁকাবাঁকা একটা পাহাড়ী নদীও দেখা গেল, শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে। বর্ষার সময় এগুলোই প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে।

একটুপর পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা বিশাল এক শেলফ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'ওটাই।' পিছনে তাকাল, চেঁচিয়ে ডনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা পাইলটের?'

সামনে ঝুঁকে পাল্টা চ্যাঁচাল সাংবাদিক, 'জ্ঞান ফিরেছে, তবে দুর্বল।'

'ওকে হেডসেট পরিয়ে দিন। কথা বলব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে লেগে পড়ল সে।

'এটা নয়, বস্,' ফস্ করে বলে উঠল টাইগার। টোকা দিল

ম্যাপে। 'আরও একটু সামনে যেতে হবে আমাদের।'

মেজাজ খিঁচড়ে গেলেও যথাসম্ভব চেপে রাখল রানা। 'কামন, আলাল, নেভিগেশন সম্পর্কে রেজিমেন্ট কিছু শেখায়নি নাকি তোমাকে?'

'আমিই বরং রেজিমেন্টকে অল্প-স্বল্প শিখিয়েছি, বস্,' বলল সিদ্ধান্তে অটল ট্রুপার। 'এটা সেই জায়গা নয়।'

'কিন্তু মাটিতে অতবড় করে কেটে বানানো সাইনটা তাহলে কিসের?'

'দেখতে ডি-চারের মতই লাগছে, তবে ওটা সেটা নয়।'

'ধুত্তোর!' বিরক্তি প্রকাশ করল ও। 'তাহলে?'

টাইগার মুখ খোলার আগেই ইয়ারফোনে জাফর আহমেদ ডেকে উঠল, 'বস্? আমি জেগে আছি।'

তার গলা শুনে বুকের ভার কিছুটা হালকা হলো রানার। 'কেমন বোধ করছ এখন, জাফর?'

'মোটামুটি, বস্। তবে সবকিছু দুটো করে দেখছি। মনে হচ্ছে মাথায় বেশ জোরে লেগেছে। ঘুম ঘুম লাগছে সারাক্ষণ।' একটু বিরতি দিল সে। 'আমি দুঃখিত, বস্। লেট করা উচিত হয়নি আমার ওখানে।'

'ওকে। এখন রেস্ট নাও।' পরক্ষণে ফুয়েল গজের ওপর চোখ পড়তে আঁতকে উঠল ও সশব্দে। 'ইয়াল্লা!' একটা লাল সঙ্কেত জ্বলছে-নিভছে গজ প্যানেলের ভেতরে।

'কি হয়েছে, বস্?' জানতে চাইল টাইগার।

'ফুয়েল গজ!' অস্ফুটে বলল ও। 'ফুয়েল তো শেষ! নিশ্চয়ই কোন লিক আছে ট্যাঙ্কে।'

'হয়ে গেছে কাজ,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'এখন?'

'নিশ্চয়ই গুলি লেগেছে তখন।' পয়েন্টার দেখে মনে মনে

হিসেব কষল রানা। 'আর বড়জোর পাঁচ মাইল যেতে পারব।'

'কিন্তু...'

'কোন উপায় নেই। জায়গা সঠিক হোক, বেঠিক হোক, এখানেই নামতে হবে।'

স্টিক ঢিল করে ধরল ও, পিচ্ লিভার নিজের দিকে টেনে আনল ধীরে ধীরে। ঝাঁকি খেল জেটরেঞ্জার, ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল যূথী। লিভার টানার গতি আরেকটু কমাল রানা, ঝাঁকি কমল, তবে একটু কাত হয়ে ঝুলে থাকল কপ্টার। ওদিকে ফুয়েল গজের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে আছে ওর। লাল আলোটা একনাগাড়ে জ্বলছে এখন, পয়েন্টারের শুয়ে পড়তে আর সামান্যই বাকি। এতক্ষণ কেন ব্যাপারটা খেয়াল করেনি ভেবে দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো ওর।

'নামছি!' চেঁচিয়ে বলল। 'সময় নেই! সবাই রেডি হও!'

ছুঁড়ে মারা পাথরের মত ঝাঁপ দিল জেটরেঞ্জার, পাগলের মত হেলেদুলে নামতে শুরু করল। নিচের মাটি সমতল না খাড়া, দেখার সময় নেই। কোনমতে নামতে পারলে বাঁচে রানা, কারণ যে কোন মুহূর্তে ট্যাঙ্কের শেষ ফোঁটাও ফুরিয়ে যাবে, মাটিতে পড়ে চুরমার হবে কপ্টার।

ও যা আশঙ্কা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। জায়গাটা সমতল তো নয়ই, এবড়োখেবড়োও নয়, প্রায় খাড়া এক ঢাল। স্কি ঢাল ছোঁয়ার আগেই একটা ব্লেড বাড়ি খেল তার ওপরের কিনারায়। তারপর যা ঘটল, তা যেমন দ্রুত, তেমনি অস্পষ্ট, এবং ডবল ফাস্ট মোশন ছায়াছবির মত দুর্বোধ্য।

ঢালের ওপরের প্রান্তের এক বড় পাথরে 'টঙঙ!' শব্দে প্রথম বাড়িটা খেল ব্লেড, পরমুহূর্তে ফিউজিলাজ থেকে সবগুলো রোটর ও ট্রান্সমিশন ছিঁড়েখুঁড়ে ছিট্‌কে আলাদা হয়ে গেল। এরপর

কপ্টারের দেহ আছড়ে পড়ল পনেরো ফুট নিচে ঢালের গোড়ায়। ভয়াবহ আওয়াজ উঠল ধাতব ও পার্সপেক্সের ক্যানোপি ভাঙাচোরার। এঞ্জিন এমন বিকট কিচকিচ আওয়াজ করে উঠল, মনে হলো যেন পূর্ণগতিতে ধাবমান এক্সপ্রেস ট্রেনের সবগুলো চাকা আচমকা জ্যাম হয়ে গেছে।

'জাম্প!' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা, নিজের দিকের দরজার ভাঙা অংশে কষে এক লাথি মেরে রাস্তা পরিষ্কার করে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল বাইরে। আলালও একই উপায়ে বের হলো অন্য পাশ দিয়ে। ওদিকে পিছনের স্টারবোর্ড দরজা ঝাঁকি খেয়ে আগেই খুলে গেছে, জাফরকে ধরাধরি করে একইসময় বেরিয়ে পড়েছে সাংবাদিক যুগলও। 'পালাও সবাই!' আবার চ্যাঁচাল ও।

ফুয়েল কক্ অফ করার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু এঞ্জিন কাউলিং থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে সে ইচ্ছে বাদ দিল, নিজেও ছুট লাগাল পড়িমরি করে। দশ গজের মত গেছে বোধহয়, এই সময় স্পার্ক করল প্রায় শুকনো এঞ্জিন, একটা ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের ওপর গিয়ে পড়ল তার কিছু, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল। উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুন হুশ্‌শ্ করে লাফিয়ে উঠল অনেক উঁচুতে।

স্পার্কের আওয়াজে দৌড়ের ওপর মুখ ঘুরিয়েছিল রানা, ঠিক তখনই ফেটেছে ট্যাঙ্ক। আগুনের প্রচণ্ড তাপে মনে হলো ভুরু পুড়ে গেছে বুঝি, শক্ ওয়েভ একটানে ওর বুকের সমস্ত বাতাস বের করে নিয়ে গেল। খক্-খক্ করে কেশে উঠল রানা। দৌড়ে এল আলাল। 'লেগেছে কোথাও, বস্?'

'না। তোমাদের?' জ্যাকেট থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল ও।

'আমরা সবাই ঠিক আছি।'

জ্বলন্ত জেটরেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা নীরবে। যেমন হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই নিভে যেতে শুরু করেছে আগুন। তার মানে তেল একেবারেই শেষ হয়ে এসেছিল। নামতে আরেকটু দেরি করলে কি হত ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল রানা। হতাশ চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাল।

'তুমি ঠিকই বলেছ, আলাল। ভুল জায়গায় নেমেছি আমরা।'

'বস্, তবু তো বেঁচেবর্তে আছি,' হাসল সে। 'ট্যাঙ্কে ফুটো আরও দুয়েকটা বেশি হলে তো বাঘলানেই ল্যান্ড করতে হত। তার চেয়ে এ অনেক ভাল হয়েছে।'

'ঠিক, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল জাফর। 'পায়ের নিচে শুকনো মাটি আছে, কাজেই আর চিন্তা কি?'

'চিন্তা আছে,' অন্যমনস্ক চেহারায় মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বি টীমের দেখা পেতে হলে অনেক পথ হাঁটতে হবে আমাদের।'

ডন এগিয়ে এল ওর দিকে। 'এখনও পর্যন্ত আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ হয়নি, মিস্টার...'

মাথা দোলাল রানা। 'তার কোন প্রয়োজন নেই। তবু যদি জানাতেই চান, পরে সুযোগ পাবেন। ভুল জায়গায় নামতে হয়েছে, বেশ খানিক পথ হাঁটতে হবে এখন আমাদের।'

'সেলারে আটক থাকার চাইতে এ অনেক ভাল,' বলল যূথী। 'বিশেষ করে টর্চারের ভয়ে...'

মেয়েটিকে দেখল ও। যথেষ্ট সুন্দরী, চোখ দুটো মায়া ভরা। 'টর্চার করেছে নাকি ওরা? খুব বেশি?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

ওকে বারবার ছেঁড়া শার্ট টানাটানি করতে দেখে আলালের দিকে ফিরল রানা। 'তোমার জামা কাপড় যা আছে এঁকে দাও।'

'শুধু এক সেট কাবুলি ড্রেস আছে, বস্।'

'তাই দাও। তোমারগুলোই সেট হবে ওঁর। আর ভদ্রলোককে একটা জ্যাকেট দাও। তাড়াতাড়ি, দেরি করার সময় নেই।'

'এরা সবাই বস্ বলছে আপনাকে,' পোশাকের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে যূথী বলল। 'কেন? আপনারা কোন মিলিটারি...মানে, কমান্ডো...?'

'না,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সে সব কিছু নয়।'

'আপনারা খুব সংগঠিত মনে হচ্ছে,' ডন বলল এবার। 'যে কায়দায় আমাদের বের করে আনলেন, তাতে...'

'আমাকে রানা বলে ডাকবেন,' না শোনার ভান করল ও। 'কোন লৌকিকতার প্রয়োজন নেই।'

হাসির আবছা আভাস ফুটল ডনের মুখে। 'শুধু রানা? নো র‍্যাঙ্ক?'

এবার রানা হাসি ঠেকাতে পারল না। 'এখানেও সাংবাদিকতা, ডন? হ্যাঁ, আমি এক সময় আর্মিতে ছিলাম, বর্তমানে এক্স। মেজর।'

বিস্ময় ফুটল স্বামী-স্ত্রীর মুখে। মাথা ঝাঁকাল ডন। 'যা ভেবেছি।' একটু থামল। 'ঠিক সময়মত আমাদের উদ্ধার করে আনার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, মেজর। আপনাদের অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'মোস্ট ওয়েলকাম, ইউ বোথ। এবার তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিন। এখনই রওনা হতে হবে আমাদের। পরনেরগুলো ফেলে দেবেন না যেন।'

একটু পর অনেক উঁচুতে কোথাও একটা প্লেনের আওয়াজ শুনল সবাই। গতি আর আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ওটা ফাইটার। চেষ্টা করেও ওটার দেখা পেল না কেউ। শুরু হলো দলের পদযাত্রা। অন্ধকারে পায়ে হেঁটে উঁচু-নিচু উপত্যকা ধরে চলা যে

কী কঠিন কাজ, হাড়ে হাড়ে তা টের পেল ওরা। সূর্য উঠল বেশ কিছুক্ষণ পর। তার আলোয় আফগান ছায়াহীন, নিষ্ফলা প্রান্তরের বিশালত্ব ও রূপ দেখে তাক্ লেগে গেল। অবশ্য রোদের তেজ বেড়ে উঠতে সে ভাব আর থাকল না, একটু ছায়ার জন্যে হাঁসফাঁস শুরু হয়ে গেল সবার।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট হলো যূথীর। জুতো ছিল না বলে কপ্টারের টায়ার কেটে পা মুড়ে বেঁধে দেয়া হয়েছিল ওর পা। কাজ হলো না তাতে। প্রথম বিশ মিনিটের মধ্যেই পায়ের নরম চামড়া ফেটেফুটে রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়। শেষদিকে এমন অবস্থা হলো যে পা দুটোকে আর পা বলে মনে হলো না, মনে হলো রক্তাক্ত দুটো মাংসপিণ্ড।

এক সময় ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়েই গেল যূথী। আর এক পা চলারও শক্তি নেই। বিনা বাক্য ব্যয়ে আলালউদ্দিন এগিয়ে গেল সাহায্য করতে, ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে সমান তালে এগোতে থাকল। ঝাড়া চার ঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। এক জায়গায় হলো থান্ডারবোল্ট ওয়ান এবং টু।

মিলনের আনন্দ খানিকটা চোট খেল থান্ডারবোল্ট টুর, যখন সার্জেন্ট শহীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার খবর শুনল ওরা।

কাবুল। সকাল দশটা।

এখন একটু ভাল বোধ করছে কর্নেল নাজাফ মুরাদ। বাঘলানের দুঃসংবাদ সে ফিরে আসার আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। এসেই তাই পড়তে হয়েছে হোসেন শাহ বরকতীর তোপের মুখে। প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে তালেবান বিপ্লবী কমিটির মীটিং বসে ফজরের নামাজের পর, একটু আগে ভেঙেছে তা।

ওখানে কি কি ঘটেছে, কি আলোচনা হয়েছে, সব এখন পুরো

মনে নেই কর্নেলের। তবে সে যে দুই স্পাইসহ তাদের উদ্ধারকারীদের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও করে কাবুলে হাজির করার কথা দিয়ে এসেছে, তা স্পষ্ট মনে আছে। কাজটা না করে উপায় নেই। কাউন্সিল মেম্বার একগাদা অশিক্ষিত, আধাশিক্ষিত মোল্লার সামনে যে-সমস্ত জঘন্য ভাষায় তাকে চুনকাম করেছে বরকতী, তাতে ও কাজ তার জীবনের পয়লা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গরজ তার এমনিতেই ছিল, নিশ্চয়ই করত সে কাজটা, শুধু শুধু বেইজ্জত করা হলো। কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনমনে মাথা দোলাল কর্নেল, কোন প্রয়োজন ছিল না।

কী আশ্চর্য! ভাবছে সে, তার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে গেল কি না কোথাকার কোন্ এক রেইডিং পার্টি? বাংলাদেশী কমান্ডো? ওদের প্রশংসা করতে হয়। তবে হ্যাঁ, যত ওস্তাদ পার্টিই হোক, শেষরক্ষা যে করতে পারবে না, তাতে কর্নেলের সন্দেহ নেই। সে জানে একজন সদস্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আরও একজন গুলি খেয়েছে পালাবার সময়। এদের দু'জনের জন্যে নিশ্চয়ই দলের পরিকল্পনা বদল হতে বাধ্য। তার ওপর জালাল তো আছেই।

মুরাদের অনুমান, অন্তত আজ রাত পর্যন্ত রেইডিং পার্টি তাদের অগ্রযাত্রা স্থগিত রাখতে বাধ্য হবে। কিভাবে এ দেশ থেকে বের হবে ওরা? এসেছে কি ভাবে? কোন লং রেঞ্জ এয়ারক্র্যাফটে করে? সে যাতে করেই হোক, এসেছে বটে, কিন্তু যেতে আর পারবে না। যে করে হোক সে ঠেকাবে ওদের।

কেন্ট ধরিয়ে টানের পর টান দিয়ে চলল সে। মনে মনে পরের করণীয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। হাতে আজকের পুরো দিন সময় আছে, এরমধ্যে দলটাকে ট্র্যাক করতে হবে। এ জন্যে তাকে প্রচুর

ক্ষমতাও দিয়েছে বিপ্লবী কমিটি। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে সারাদেশের পুলিস ও ট্রাফিক পুলিস বাহিনীকে তার অধীনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এই বিশেষ কাজের জন্যে। এবং তালেবান গার্ডদের। আসল কাজের বেলায় ব্যাটারা হোপলেস ঠিকই, তবে একেবারে ফেলনা নয়। দেশের আগা-মাথা, ডান-বাঁয়ের সর্বত্র, সর্বশেষ ইঞ্চি মাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওরা।

প্রতিটা হাইওয়েতে চেক-পয়েন্ট বসাবে সে ট্রাফিক পুলিস এবং ওদের সমন্বয়ে, বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালাবে। বন-জঙ্গল, পাহাড় খুঁজবে। প্রয়োজন পড়লে আর্মির সাহায্যও চাইবে। কর্নেল জানে, চাইলে ওদের সাহায্যও পাবে সে, কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অবশ্য। তা অনুমোদন পাওয়ায় তেমন অসুবিধে হবে না। এইডের গলা শুনে ধ্যান ভাঙল মুরাদের।

হাতে ধরা একগাদা কাগজ দোলাল সে। 'আপনি যে সমস্ত রিপোর্ট চেয়েছেন, তার সব নিয়ে এসেছি, স্যার।'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে সাদা সিল্ক্ শার্টের আস্তিন গোটাল সে কনুই পর্যন্ত। 'ইন্টারেস্টিং কিছু আছে?'

'একপলক নজর বুলিয়েছি, স্যার। ঠিকমত...'

'দেখি, আমাকে দাও।' কাগজগুলোর ওপর হামলে পড়ল কর্নেল। খস্ খস্ শব্দে উল্টে চলল একটার পর একটা শীট, টেলেক্স ও ফ্যাক্স মেসেজে অজস্র ভুল দেখে নাক দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল থেকে থেকে। 'হুঁম! চুরি যাওয়া কপ্টার ট্র্যাক করেছিল ওরা দেখা যাচ্ছে! দক্ষিণ-পশ্চিমে যাচ্ছিল ওরা। পরে অবশ্য হারিয়ে ফেলেছে। হুঁমম! অজ্ঞাত এয়ার ট্রাফিকের উপস্থিতি জেনেও কেউ রিপোর্ট করেনি দেখছি।' চোখ তুলল সে। 'এয়ারফোর্সের অ্যাকটিভিটিজ খুব বেশি মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, স্যার। কয়েকজন ইরানী জিম্মি মারা যাওয়ায় ওরা সৈন্য

জড়ো করছে আমাদের সীমান্তে। ট্রুপ, আর্মার...'

'সে খবরে আমাদের দরকার নেই। আমি ভাবছি এয়ারফোর্স যদি বেশি ব্যস্ত থাকে, তাহলে আমাদের কাজে ওদের সাহায্য পাওয়া যাবে কি না।' হঠাৎ এক রিপোর্টের শেষ প্যারায় কিছু দেখে চোখ কোঁচকাল সে। 'এটা কি? এক ফাইটার পাইলট হিন্দুকুশ রেঞ্জে আগুন দেখেছে ভোররাতে?'

'আগুন?' বলল এইড। 'হয়তো রাখালদের শীত পোহাবার জন্যে হবে।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কর্নেল। 'রাত তিনটায়! তাও এতবড় আগুন যে পাঁচ মাইল ওপর থেকে দেখা যায়!'

'হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।'

দেয়ালজোড়া এক বিশাল ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়াল কর্নেল। একটা কাঠের চক কম্পাস দিয়ে বাঘলান এয়ারপোর্টকে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকল, দূরত্ব দেখা গেল ১৪০ মাইল। আরেক হিসেবে চুরি যাওয়া জেটরেঞ্জারের এক ঘণ্টার পথ। এবার ফাইটার পাইলটের গ্রিড রেফারেন্স অনুযায়ী সঠিক জায়গায় হলুদ চায়নাগ্রাফ দিয়ে একটা ক্রস আঁকল। বৃত্তের সামান্য বাইরে পড়ল ওটা।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল কর্নেল। 'কোন রেসকিউ প্লেনের গাইডেন্স বীকনও হতে পারে ওটা।'

তাক্ লেগে গেল এইডের। 'তাই তো! এ কথা তো ভাবিনি!'

'ভুলও হয়ে থাকতে পারে আমার,' আরেকটা কেন্ট ধরাল কর্নেল। 'অনুমান করছি আজ রাতে হয়তো তেমন কিছু ঘটবে। তবু, দেখি একবার চেক করে।'

'আর ওই বাংলাদেশীর কি হবে?'

'ওর কি হবে তা বরকতী জানে। হাতের কাজ সেরেইনি,

তারপর যাব ব্যাটা মুখ খুলেছে কি না জানতে।'

'কি বললে?' বোকার মত হেকমত আলির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'জালাল-হামিদা আসেনি? শহীদও না?'

'না, বস্। আসেনি ওরা।' কপালের ঘাম মুছল ছোটখাট মানুষটা। সারাপথ ঝড়ের বেগে প্যান্থার ছুটিয়ে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছে সে। ক্লান্ত চেহারা, চোখ লাল।

'তুমি চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলে তো?'

'পাঁচ মিনিট বেশি অপেক্ষা করেছি, বস্।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ভীষণরকম অন্যমনস্ক। ওরা কেন এল না ভাবছে। কি কারণ থাকতে পারে? একের পর এক প্রশ্ন উদয় হচ্ছে মনে, একটারও উত্তর জানা নেই। শহীদের কথা ভেবে সবচেয়ে বেশি আফসোস হলো রানার। তার অভাব বহুকাল খোঁচাবে ওকে। বিসিআইয়ের অনেক দামী অ্যাসেট ছিল সার্জেন্ট।

'ঠিক আছে,' বলল ও সবার উদ্দেশে। 'সবাই বিশ্রাম করো এখন। সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতি আসবে মনে হচ্ছে।'

ওদিকে গাছের ছায়ায় স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা জাফর আহমেদের দিকে এগোল রানা। খন্দকার জাহাঙ্গীর তার ওপর ঝুঁকে বসে আছে। 'কেমন আছে ও?'

'ভাল, মাসুদ ভাই,' বলল নার্স। 'আর ভয়ের কিছু নেই। ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট করেছি নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এই সময় ওর পকেটফোনে ফয়েজ মোহাম্মদের উত্তেজিত গলা ভেসে এল, 'টেক কভার, বস্!'

ওদের সামান্য দূরের এক রিজের মাথায় বসে আছে লোকটা, নিচের উপত্যকার ওপর নজর রাখছে। সেদিকে তাকাল ও। 'কি

হয়েছে?'

'ভোরে যেখানে আপনাদের কপ্টার ক্র্যাশ করেছে, ওর কাছে একটা কপ্টার ল্যান্ড করেছে এইমাত্র।'

'নজর রাখো। সাইলেন্স।'

কিন্তু একটু পরই নির্দেশ ভঙ্গ করল সে। 'আরেকটা কপ্টার, বস্। ট্রুপস্ ড্রপ করছে, ছড়িয়ে পড়ছে ওরা।'

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করে বলে উঠল ও।

ডন এগিয়ে এল। 'কি হয়েছে, মেজর?'

'আমাদের ক্র্যাশড্ কপ্টারের খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা,' আরেকদিকে তাকিয়ে জবাব দিল ও। 'ট্রুপস ড্রপ করেছে ওখানে।' কি ভেবে হাসল ও। 'আপনাদের মায়া ছাড়তে পারছে না ব্যাটারা।'

ডনও হাসল, তবে সেটা হাসি হলো না, হলো মুখ ভ্যাংচানো। 'তাই তো দেখছি। বিপদের কথা হলো। আমাদের উদ্ধার করতে এসে দলের দু'জনকে হারালেন, একজন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। তারপর কপ্টার ক্র্যাশ...এখন আবার এই যন্ত্রণা। ভাবছি আসলে দেশে পৌঁছতে পারব কি না।'

জবাব একটু পরে দিল রানা। দৃঢ় আস্থার সাথে বলল, 'নিশ্চয়ই পারবেন! একবার যখন আপনাদের বের করে আনতে পেরেছি, দেশে অবশ্যই যেতে পারবেন।'

নিচু এক চৌকির ওপর বেঁধে রাখা হয়েছে জালালকে। পরনে কিছু নেই। সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে। চোখের ছয় ইঞ্চি ওপরে জ্বলছে জোরাল শক্তির ইন্টারোগেশন লাইট। চোখ মেলতে পারছে না সে। সারাদেহে অসংখ্য পোড়ার ক্ষত, জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে এই হাল করা হয়েছে।

অসহ্য যন্ত্রণায় গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছে সে। অথচ ওই গলা যে তার নয়, সে ব্যাপারে জালাল নিঃসন্দেহ। অমন কর্কশ, অমন বিকট গলা তার হতেই পারে না। অনেক মিষ্টি, ভরাট কণ্ঠ ওর। ছাত্র জীবনে চমৎকার গাইত। স্কুল-কলেজ জীবনের অনেক অনেক অনুষ্ঠানে গেয়ে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে। ওদের পোস্তগোলার বাড়িতে সে সব যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে, কাজেই ওর বিশ্বাস, এই গলা তার হতেই পারে না। এ নিশ্চই অন্য কারও হবে।

আলোর পিছনের অন্ধকার থেকে আবার বেরিয়ে এল সিগারেট ধরা তিন আঙুল। তারপর গোটা হাত। 'বাঁচতে চাইলে সত্যি কথাটা বলে ফেলো,' বলল হাতের মালিক। 'তাহলে ছেড়ে দেয়া হবে তোমাকে। যদি চাও, তোমাকে পাকিস্তান-ইরান, যে কোন বর্ডারে পৌঁছে দিয়ে আসব আমরা। কিছু বলবে না কেউ। কারণ তোমার সাথে কোন লেনদেনের ব্যাপার নেই আমাদের। আছে ওদের সাথে, দুই সাংবাদিক আর তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া কমান্ডোদের সাথে। ওদের চাই আমরা। এখন বলো, কোথায় ল্যান্ড করবে প্লেন?'

জবাব নেই।

'বলো, জালাল। বলে নিজেকে বাঁচাও। একবার যখন তোমার নাগাল পেয়েছি, ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি তো কোন্ ছার, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আমাদের হাত থেকে। যদি আমরা স্বেচ্ছায় না ছাড়ি। কাজেই বলে ফেলো, আমরা কথা দিচ্ছি ছেড়ে দেব তোমাকে। শুধু ল্যান্ডিং স্পটের নামটা বলো।'

জালাল নিরুত্তর দেখে গালের ওপর সিগারেট ঠেসে ধরল এবার হাতটা। আরও দুটো হাত মাথার দুপাশের চুল ঠেসে ধরে রাখায় প্রাণপণ চেষ্টা করেও মুখ সরাতে পারল না সে, ঘরদোর

কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আবার।

একটু পর জ্বালাপোড়া কমে যেতে থামল। হাপরের মত হাঁপাল জালাল খানিকক্ষণ, ঢোক গিলতে চাইল। কিন্তু শুকিয়ে কর্কশ কাঠের মত হয়ে আছে গলা, উল্টে ব্যথা লাগল। একটু একটু করে উত্তেজনা কমে এল। হামিদার সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ছবিটা পরিষ্কার নয়, একটু ধোঁয়াটে। তবু মোটামুটি চেনা যাচ্ছে, সেই পটলচেরা চোখ, মনকাড়া মিষ্টি হাসি, সেই...

পাতলা চিনামাটির পীরিচের মত ভেঙে খান খান হয়ে গেল ছবিটা, আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। এবার সিগারেট নয়, ব্যাটন ইলেক্ট্রোড প্রয়োগ করেছে ইন্টারোগেটর। ওটা জালালের অণ্ডকোষে ঠেসে ধরেছে। ওখান থেকে শুরু করে দেহে যত নার্ভ ট্র্যাক্ট আছে, সবগুলোর ওপর তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মত আছড়ে পড়ছে অসহ্য, অকল্পনীয় ব্যথার একের পর এক ঢেউ। অজস্র রঙের খেলা দেখিয়ে চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে যেতে চাইছে। এক সময় সরে গেল জিনিসটা, ব্যথা কমে এল ধীরে ধীরে।

কিন্তু জালাল জানে আবার শুরু হলো বলে। হলোও তাই। অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টা পর মুখ খুলতে বাধ্য হলো সে। 'গুড!' খুশি হলো অদৃশ্য ইন্টারোগেটর। পানি খাওয়ানোর নির্দেশ দিল। পানি খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করল জালাল।

'গারদেজ,' কোনমতে বলল, এতই আস্তে যে নিজেও ঠিকমত শুনতে পেল না। 'গারদেজ।'

'কোথায়?'

'খাইবার পাসে। ওখানে গারদেজে এক পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ আছে, সেখানে।'

একটু বিরতি। কারা যেন ফিসফিস করছে। তারপর কেউ ওঁর

কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'গুড বয়। নামটা আরও আগে বললেই পারতেন। অনর্থক এত কষ্ট সহ্য করলেন।'

ওরা নাম জেনেই খুশি। কল্পনাও করেনি জালাল এত নির্যাতনের পরও তাদের ভুল পথে পরিচালনার চেষ্টা করবে।

বড় এক গর্তে পড়ে জোর ঝাঁকি খেল মুড়ির টিন মার্কা ঝরঝরে বাসটা, তারপর থেমে পড়ল। সামনে কেবল ঊষর প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত হিন্দুকুশ আর উত্তাপের কাঁপা ধোঁয়া। সামনে পাহাড়ী, আঁকাবাঁকা রাস্তা বেশিদূর দেখার উপায় নেই। তবে যতদূর দেখা যায়, একদম ফাঁকা। শহীদের মনে হচ্ছে ভুল করে জনমানবহীন অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে ওরা, আর কেউ নেই এখানে।

আফগান-পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের জুরম নামের ছোট্ট এক শহরের কাছে জায়গাটা। বাঘলানের বাইরে থেকে কয়েকবার বাস বদলে খানাবাদ ও ফাইজাবাদ হয়ে এখানে পৌঁছেছে ওরা–শহীদ ও হামিদা। মোটামুটি ষাট মাইল পথ এরমধ্যে পেরিয়ে এসেছে, কোন সমস্যা হয়নি।

আরও ত্রিশ মাইলের মত যেতে হবে। সীমান্ত শহর জেবেক পর্যন্ত, হামিদার আরেক চাচা থাকেন ওখানে। তাঁর বাড়িতে উঠবে আজ রাতের জন্যে।

আষ্টেপৃষ্ঠে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকা হামিদাকে দেখল সার্জেন্ট। লালচে পাহাড়ী ধুলোয় ভুরু-পাপড়ি সব একাকার হয়ে গেছে তার। চোখ লাল। থেকে থেকে কাঁদছে মেয়েটা জালালের কথা ভেবে। যাত্রীরা সব নেমে যাচ্ছে দেখে ব্যাপার বোঝার জন্যে শহীদও উঠল। জানা গেল দুপুরের খানা এখানেই সেরে নেবে ড্রাইভার, তাই আধঘণ্টা পর বাস ছাড়বে।

'মন খারাপ করার কোন কারণ নেই,' মৃদু গলায় ওকে সান্ত্বনা

দিল সার্জেন্ট। 'সহজ হতে চেষ্টা করুন।'

ঘুরে তাকাল হামিদা। হাসল জোর করে। 'জালালের ভাগ্যে কি ঘটছে...'

'শুধু শুধু ভাবছেন। আমিও তো ধরা পড়েছিলাম, কি করতে পেরেছে ওরা? জালালেরও কিছু করতে পারবে না কেউ, শিওর থাকুন।'

ওর চোখে ভরসা খুঁজল মেয়েটি। 'সত্যি বলছেন?'

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল সার্জেন্ট। 'জালালও ট্রেনিং পাওয়া, অমন এক কুড়ি মোল্লাকে ঘোল খাওয়ানো বেশি কঠিন কিছু নয় ওর জন্যে।' বলল বটে, তবে এত আস্থা নিজের কানেও অতিরিক্ত ঠেকল।

বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠল হামিদার। 'আপনি খুব ভাল মানুষ। আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন।'

বাস খালি হয়ে গেছে। এক পাঠান বৃদ্ধ তখনও নামেনি। কাপড়-চোপড় দেখে অন্যদের তুলনায় বেশ গরীব মনে হলো তাকে। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কিছু বলতে চায়। বলছে না ভরসা পাচ্ছে না বলে। শহীদের সাথে চোখাচোখি হতে দ্বিধা কেটে গেল তার, লাঠিতে ভর দিয়ে এক পা দুপা করে এগিয়ে এল। ওদের দেখল কাছ থেকে।

'আপনারা খাবার কিছু আনেননি?'

'না, আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি বাসা ছেড়ে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল হামিদা। শহীদকে দেখাল। 'আমার স্বামীর ঘুম খুব গাঢ়, ওঁকে জাগাতে দেরি হয়ে গেছে। ব্যস্ততার জন্যে খাবারের ব্যাগ আনার কথা মনেই ছিল না।'

দাঁতহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসল বৃদ্ধ। জোব্বার পকেট থেকে বড় এক কাপড়ের পুঁটলি বের করল। 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে

আপনাদের! আমার ছেলের বউ একজনের তুলনায় বেশি খাবার দিয়ে ফেলেছে। বুড়ো মানুষ, এত খেতে পারি না।'

পোঁটলা খুলল সে পাশের সীটে রেখে। ভেতর থেকে বের হলো দুটো সেদ্ধ ডিম, দুটো যবের রুটি, দুটো সবুজ টম্যাটো ও খানিকটা বকরীর দুধের পনির। মুখ তুলে আবার হাসল বৃদ্ধ। 'নিন্, বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করুন। দেখবেন এতেই আমাদের সবার পেট ভরে যাবে।'

'কিন্তু আমরা...' না করে দিতে যাচ্ছিল সার্জেন্ট, মেয়েটির চোখের নীরব নিষেধ দেখে থেমে গেল।

'আপনি খুব দয়ালু,' হামিদা বলল বৃদ্ধকে। 'আল্লাহ্ চিরকাল পৃথিবীতে আপনার ছায়া বহাল রাখুন।'

চোখের পিছনে কেমন শিরশিরে অনুভূতি জাগল শহীদের। কান্না পেলে ওরকম হয়। বৈরী আফগানিস্তানের এক গরীব বুড়োর অযাচিত আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেল ও। মন কত বড় হলে মানুষ নিজের অন্ন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মুখে তুলে দিতে পারে?

কিছু বলতে ভরসা হলো না ওর, আবেগে গলা কেঁপে যেতে পারে। জাফর সেদিন ভুল বলেছে, ভাবল সার্জেন্ট। আবদুর রহমানরা এক-আধজন আজও আছে পাঠান মুলুকে।

নয়

রাত ঠিক দশটায় মৃদু গুঞ্জনের সাথে স্টার্ট নিল দুই ল্যান্ড রোভার।

এগজস্টের চাপা খাঁকারি এবং লম্বা ঘাসে টায়ারের খসখস আওয়াজ তুলে হাইড আউট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও দুটো। পিঙ্ক প্যান্থার ওয়ান আগে।

সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত উপত্যকার যতদূর পারা যায় সার্চ করেছে ট্রুপাররা, তারপর ফিরে গেছে। ফয়েজ নিজে দেখেছে ওদের চলে যেতে। কাজেই এ মুহূর্তে ভয়ের কিছু নেই। তবু মাসুদ রানা কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। নির্ধারিত রুট বাতিল করে অন্য পথে নির্দিষ্ট এয়ারস্ট্রিপে যাচ্ছে। গারদেজের ষাট মাইল উত্তরে জায়গাটা, নাম পারাচিনার। দুই জায়গাতেই এয়ারস্ট্রিপ আছে। অতীতে দুই অয়েল ফিল্ডের ছিল, বর্তমানে তেলের মজুদ নেই বলে সব পরিত্যক্ত।

কোনাকুনি যাবে ঠিক করেছে রানা। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে, ক্রস-কান্ট্রি অ্যাপ্রোচ ধরে। কয়েকটা রিজ পড়বে পথে, যাত্রা ধীর এবং কঠিন হবে। তবে সুবিধেও আছে তার। কেউ ওরকম বেপথে যেতে পারে, আফগানদের মাথায় তেমন সম্ভাবনার কথা ভুলেও জাগবে না।

সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল রানা।

ব্যাক-আপ টীম লীডার সদরউদ্দিনের নেতৃত্বে প্যান্থার ওয়ান রয়েছে আগে। ট্রুপার হেকমত আলি চালাচ্ছে ওটা। পিছনে আছে দু'জন, আলালউদ্দিন ও আহত জাফর। ওদের একশো গজ পিছনে রানার প্যান্থার টু। ড্রাইভ করছে ফয়েজ মোহাম্মদ। ডন-যূথীসহ অন্যরা রয়েছে ওটায়। কথা আছে, যদি 'পয়েন্ট' ভেহিকেল সমস্যায় পড়ে, ওদের নিয়ে ছুট লাগাবে 'ট্রেইল'। অবশ্য সুযোগ থাকলে কাউন্টার অ্যাটাক চালাতে ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছল ওরা জায়গামত, তবে সমস্যা বেধে গেল ওখানে।

'সামনে মনে হচ্ছে বিপদ দাঁড়িয়ে আছে, মাসুদ ভাই।' রানার ক্ল্যানস্‌ম্যান রেডিও হেডসেটে ভেসে আসা সদরউদ্দিনের বলার মধ্যে যে উদ্বেগ আছে, টের পেতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না।

ধক্‌ করে উঠল বুকের মধ্যে। 'কি হয়েছে?' বলল ও, গলা টান করে সামনের গাড়িটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

'এগিয়ে আসতে পারেন,' জবাব এল। 'এখানটা নিরাপদ।'

ফয়েজের কাঁধে টোকা দিল রানা। 'সাবধানে যাও।'

দুলে উঠে রওয়ানা হলো প্যান্থার টু। একটু একটু করে এগিয়ে প্রথমটার পাশে দাঁড়াল। প্রায় তিনশো ফুট উঁচু এক ক্লিফের আরেক মাথার ঢালের কাছে জায়গাটা। ঢাল বেয়ে নামলেই স্ট্রিপ। সদরউদ্দিনকে দেখা গেল ক্যানোপি ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সামনের সীটে, স্টারলাইট স্কোপ পরে স্ক্যান করছে এয়ারস্ট্রিপ। জায়গাটা ওদের থেকে অনেক নিচে। স্কোপ খুলে রানার দিকে এগিয়ে দিল সে। 'দেখুন, বস্‌। ঘড়ির কাঁটার হিসেবে দশটা, একটা, আর চারটার দিকে তাকান। অন্তত চারজন করে আছে প্রত্যেক দলে।'

কপাল কুঁচকে উঠল ওর। দুশ্চিন্তার মেঘে চেহারা কালো। স্ট্রিপটা এক পাহাড়ী উপত্যকায়, মোটামুটি সমতল একটা মাঠ। একদিকে অযত্নে পড়ে থাকা জীর্ণ এক কাঠের ঘর আর কয়েকটা খালি তেলের ড্রাম পড়ে আছে, অন্যদিকে আছে রাখালদের তৈরি দু'তিনটে ছাপড়া। গরমের সময় ওপরের উপত্যকায় পশু ছেড়ে দিয়ে এখানে বিশ্রাম করে ওরা।

তিন গ্রুপকেই যথেষ্ট সময় নিয়ে দেখল রানা। স্ট্রিপের প্রান্তে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। থেকে থেকে তারার আলোয় ভোঁতা ঝিলিক মারছে ওদের গান মেটাল। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে রানার সন্দেহ হলো লম্বা ব্যারেলের হেভি মেশিনগানও

আছে ওগুলোর মধ্যে। ঝাড়া পাঁচ মিনিট পর স্কোপ নামাল রানা, বাঁ চোখের নিচের একটা পেশী তিরতির করে কাঁপছে।

'অভ্যর্থনা কমিটি, বস্!' বলল ফয়েজ। নিবিষ্ট চোখে রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। 'কিন্তু জানল কি করে?'

কিছু বলল না ও। একই চিন্তা আর সবার মাথায়ও ঘুরছে। রানা সার্জেন্ট শহীদের কথা ভাবছে, শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে সে। মনে হয় খবরটা সেই বলে দিয়েছে। কিন্তু তার মত কঠিন মানুষ...মাথা দোলাল ও। আসলে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের সামনে মানুষ অসহায়। যত কঠিনই হোক, এক পর্যায়ে মুখ খুলতেই হয়। সার্জেন্টের ওপর কি ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে? আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল ওর। শহীদই তো, না জালাল? অস্বস্তি লেগে উঠল রানার।

আরেকবার স্ট্রিপ স্ক্যান করল। একঘেয়ে কণ্ঠে বলল, 'হতে পারে হয়তো অনুমান করে নিয়েছে ব্যাটারা।'

'শহীদ বা জালালও বলে দিয়ে থাকতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে এ হিসেব যে কেউ মিলিয়ে ফেলতে পারে। ওরা জানে আমাদের চপার ক্র্যাশ করেছে। অথচ খুঁজে একটা লাশও যখন পায়নি, তখন ওদের ধরে নেয়া স্বাভাবিক আমরা মরিনি, বেঁচে আছি। এবং পালাবার ধান্ধায় আছি। এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে ক্র্যাশের ঘটনা ঘটেছে, কাজেই কাছাকাছি এই স্ট্রিপ থেকে আমাদের পিক-আপের ব্যবস্থা হয়তো আছে ভেবে নিতে পারে ওরা সহজেই।'

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল। 'আর মাত্র পনেরো মিনিট পর আলফা পতেঙ্গার ল্যান্ড করার কথা।'

'যাহ্! তাহলে...কি করবেন এখন?'

'কি আর! এই আশঙ্কার কথা ভেবে যে কন্টিনজেন্সি প্ল্যান করেছি, তাই ফলো করতে হবে। প্ল্যান "বি" অনুযায়ী...'

'মরে গেছি, বস্, সে যে আড়াইশো মাইলের ধাক্কা!' চোখ কপালে তুলে বলল পিচ্চি হেকমত আলি। 'গাড়িতে করে এত পথ...মার্ডার কেস, বস্।'

'তোমার হেকমতির ওপর আমার খুব ভরসা ছিল, হেকমত,' খোঁচা লাগাল সদরউদ্দিন। 'এখন দেখছি...'

'অ্যাই সদরঘাট, চোপরাও!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ওস্তাদ-সাগরেদের মাঝখানে কথা বলতে এসো না!'

ওদিকে অবিশ্বাসে চোখ বড় হয়ে উঠেছে যূথীর। ধীরে ধীরে মাথা দোলাল সে ডানে-বাঁয়ে। যেখানে এমন জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে এই মানুষগুলো কি করে এমন ধীরস্থির থাকে, এত ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ভেবে পাচ্ছে না সে। ওরা কি আসলে মানুষ?

গোটা এস্কেপ প্ল্যান বরবাদ হয়ে গেছে, আর এরা কি না গল্প করছে বসে বসে! ঠাট্টা-কৌতুক করছে! ভয়ে-হতাশায় কাঁপুনি উঠে গেল মেয়েটির। কি হবে এখন?

ডন নড়েচড়ে বসল। 'আপনাদের কথার মধ্যে কথা বলা হয়তো ঠিক হচ্ছে না, তবু, কি ঘটেছে যদি জানান, খুশি হব আমরা।'

ঘুরে তাকাল রানা। চেহারা দেখে বুঝল ভয় পেয়েছে লোকটা, তবে প্রকাশ করতে চাইছে না। চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। খুলে বলল রানা। আগ্রহ নিয়ে শুনল সাংবাদিক, তারপর আপনমনে মাথা দোলাল। 'মনে হয় ওই দু'জনের একজনই বলে দিয়েছে এখানকার কথা।'

'মনে হয় না।'

'আমি শুনেছি আপনি তখন কি বলেছেন,' জোর দিয়ে বলল ডন। 'তবে আমার ধারণা, হাতের মুঠোয় জলজ্যান্ত সূত্র থাকতে কষ্ট করে কেউ অঙ্ক কষতে যাবে না। সোজা পথেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইবে। একটু চাপ দিলেই যখন ফ্যাক্টস্ জানা সম্ভব, তখন কেনই বা যাবে ওই ঝামেলায়?'

বিরক্ত হলো রানা। 'আমাদের প্রত্যেকের ইন্টারোগেশন রেজিস্ট করার ট্রেনিং নেয়া আছে, কাজেই...'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কর্নেল মুরাদের ইন্টারোগেশনের হাতিয়ারগুলো যদি একবার দেখতেন!' শিউরে উঠল সে। 'বাপ্‌রে!'

আর কিছু বলল না ও, ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে গেল। মাথা ঘুরতে শুরু করল প্ল্যান 'বি' কি করে সফল করবে ভাবতে গিয়ে। পরিকল্পনা যত সতর্কতার সাথেই করা হোক, যতই তার ওপর রিহার্সেল করা থাকুক, সত্যিকারের অপারেশন যে তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘামছে টের পেয়ে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল রানা। বিকল্প প্ল্যানের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে ভবিষ্যৎকে মেলাবার চেষ্টা করল। প্ল্যানিঙের সময় এমন কিছু নজর এড়িয়ে গেছে কি না; যার কথা আগে চিন্তা করা হয়নি, অথচ করা উচিত ছিল, সেসব নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল। না, মনে পড়ছে না তেমন কিছু।

প্ল্যান 'বি' আগাগোড়াই ছিল অ্যাকাডেমিক এক্সারসাইজ, রুটিন ট্রেনিং। এখন তাকে কার্যকর করতে হবে। ভীষণ কঠিন, প্রায় অসাধ্য এক কাজ। পারবে তো ওরা?

'মাসুদ ভাই!' সদরউদ্দিন বলে উঠল। 'আড়াইশো মাইল

দক্ষিণে যেতে হবে ভাবতে মাথা ঘুরছে আমার।'

'আমারও,' স্বীকার করল ও। ইঙ্গিতে লোকটাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে এল। 'ভেবো না, ঠিকই সফল হব আমরা শেষ পর্যন্ত। এখন এসো, একসঙ্গে সব সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে প্রথমটা নিয়ে ভাবা যাক্। প্রথমে আমাদের দেখতে হবে ওরা যেন আলফা পতেঙ্গাকে গুলি করে নামাতে না পারে। ওটা আফগানদের হাতে পড়লে ইন্টারন্যাশনাল স্ক্যান্ডালের শিকার হতে হবে আমাদেরকে। ওটাকে আমাদের ধার দেয়ার জন্যে আমেরিকাও নাজুক অবস্থায় পড়বে।'

'কি করবেন ঠিক করেছেন?'

হাত নেড়ে স্ট্রিপ দেখাল রানা। 'প্লেন ল্যান্ড করলে ওদের হাতে পড়বে। কাজেই ওটা যাতে না নামে সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কোন সমস্যা নয়। আমাকে কি করতে হবে বলুন।'

'প্যান্থার টু-র দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। ওদের সবাইকে নিয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে থাকো তুমি। আমি প্লেন ভাগিয়ে দিয়ে আসছি।'

'জ্বি।'

এগিয়ে এসে ওয়ানের সাইড বিনে হাত ভরে দিল রানা। কারবাইনের এক বাক্স গুলি, কয়েকটা গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ফিউজ ও সেফটি ফিউজের দুটো কয়েল ও এক কয়েল দড়ি বের করে পায়ের কাছে রাখল। সঙ্গে লাস্ট রিসোর্ট হিসেবে একটা ভেরি সিগন্যাল পিস্তল।

'সব নিয়েছেন, বস্?' বলল ফয়েজ।

'হ্যাঁ।' সদরউদ্দিনের দিকে ফিরল ও। 'তোমরা এবার রওনা হয়ে পড়ো। যদি আমি না আসি, যে করে হোক ওদের নিয়ে

উপকূলে পৌঁছতে হবে তোমাকে।'

'চেষ্টা করব, বস্।'

'শুধু চেষ্টা নয়,' মৃদু ধমক লাগাল ও। 'সফল হতে হবে তোমাকে।' পকেট থেকে যূথীর দেয়া খুদে ক্যাসেটটা তার হাতে তুলে দিল। 'এটা একমাত্র রাহাত খানকে দেবে তুমি, আর কাউকে নয়। এর জন্যেই এতসব।'

'আচ্ছা।' ওটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রাখল সে।

'ফয়েজ, ওয়ান নিয়ে ক্লিফের গোড়ায় অপেক্ষা করো তুমি। আমি কাজ সেরে আসছি।'

'রাইট, বস্!'

মিনিট পুরো হওয়ার আগে গড়াতে শুরু করল দুই পিঙ্ক প্যান্থারের চাকা। সবাইকে নিয়ে চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল রানা। খুদে ভরডিক পেন্সিল টর্চ জ্বেলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কয়েক টুকরো কর্ডটেক্স ফিউজ কাটল প্রথমে, তারপর ওগুলোর সামান্য দূরে দূরে ছাল ছাড়িয়ে সেখানে কারবাইনের ৭.৬২ এমএম কার্ট্রিজ বাঁধল কয়েকটা করে। কাজ শেষ হতে ওগুলোকে জুড়ে দিল ফিউজের সাথে। সব মিলিয়ে যথেষ্ট দীর্ঘ হলো বেল্ট।

ফিউজের এক মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলেই হয় এখন, বিরতি দিয়ে ফুটতেই থাকবে বুলেট। বেশ কিছু সময় চলবে ব্যাপারটা। আওয়াজ শুনে নিচের ব্যাটাদের মনে হবে শত্রু অনেক আছে বিপক্ষে! একইরকম তিনটে বেল্ট তৈরি করল রানা, দূরে দূরে ছড়িয়ে রাখল।

ওটা সেরে ট্রিপ ওয়্যার ও এল-টু ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড দিয়ে দুটো বুবি ট্র্যাপ তৈরি করল শত্রুর এদিকে তেড়ে আসার সম্ভাব্য পথের ওপর। ওয়্যার টান্ টান্ হয়ে থাকল হাঁটুর সামান্য নিচের

উচ্চতায়, একচুল প্রেশার পড়লেই গ্রেনেড ফাটবে। আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা কাজ সেরে। আলফা পতেঙ্গা যদি শিডিউল মত আসে, তাহলে আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে।

বসে পড়ল। কর্পোরাল সদরউদ্দিনের কথা ভাবল। রানার আস্থা আছে, ও যদি নতুন করে দলের দায়িত্ব নিতে নাও পারে, ক্ষতি নেই। ওই লোকই পারবে বাকি কাজ সামাল দিতে। সে যোগ্যতা সদরউদ্দিনের আছে। অবশ্য শহীদ থাকলে তাকে দায়িত্বটা দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

আবার ঘড়ি দেখল ও–হয়ে গেছে সময়। ভাবতে না ভাবতে আওয়াজটা কানে এল, দৈত্যাকার চার অ্যালিসনের একটানা গুরুগম্ভীর গুঞ্জন। আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় বেশ নিচু দিয়ে আসছে আলফা পতেঙ্গা। এ-চূড়া ও-চূড়ায় বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। খুদে রেডিও ট্রান্সমিটার মুখের কাছে তুলে ধরল রানা। 'থান্ডারবোল্ট টু আলফা পতেঙ্গা। স্পাইডার, আউট। রিপিট। স্পাইডার, আউট। ওভার।'

সাড়া নেই। তার মানে শুনতে পাচ্ছে না স্কোয়াড্রন লীডার কাজী আনিস। নিশ্চই কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে।

একঘেয়ে ছান্দিক আওয়াজ বেড়ে গেছে হারকিউলিসের, আরও গম্ভীর হয়েছে। তার মানে ওটা নামছে, নিশ্চিত হলো রানা। সিবিইউ পরে উল্টোদিকের অসংখ্য চুড়োর মধ্যে দিয়ে প্লেনটা দেখার মরিয়া চেষ্টা করল রানা, তখনও দেখা নেই। সতর্কবাণী আরও দু'বার আওড়াল ও, ফল হলো একই। সাড়া এল না।

তারপর হঠাৎ করেই ওটা দেখা দিল। দানবীয় এক কালো বাদুড়ের মত দুই চুড়োর মধ্যে দিয়ে ঘুরে এ মুখো হলো আলফা পতেঙ্গা। আরও অনেকটা নেমে অ্যাপ্রোচের সাথে সমান্তরাল হলো। অপূর্ব, শ্বাসরুদ্ধকর এক দৃশ্য, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু

এটা দৃশ্য দেখার সময় নয়, জান বাঁচানোর সময়।

পাইলটকে সতর্ক করার শেষ চেষ্টা করল ও, লাভ হলো না। হয় রেডিওতে কোন সমস্যা হয়েছে, নয়তো পাহাড়ী এলাকায় কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যে বাধা সবসময়ই দেখা যায়, তাই ঘটছে। সম্পূর্ণ নীরব রেডিও।

এমন সময় হঠাৎ আলো হয়ে উঠল স্ট্রিপের রানওয়ে। গাঢ় অন্ধকারে এত জোরাল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যেতে থতমত খেয়ে গেল রানা। ব্যাপার টের পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগল।

ইমার্জেন্সি রানওয়ে ফ্লেয়ার জ্বেলে দিয়েছে ওরা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'হারামজাদা!'

পুরো স্ট্রিপ দিনের মত আলো করে তুলেছে ওরা মার্কার ফ্লেয়ার জ্বেলে। ফাঁদে ফেলতে চাইছে প্লেনটাকে। এবং ফাঁদে পা দিয়েও ফেলেছে ওটা। আরও নেমে পড়েছে, হেভি আন্ডারক্যারিজ বেরিয়ে পড়েছে পেটের ফোকর ছেড়ে। মাটি ছুঁতে আর দেরি নেই। থাবা দিয়ে ভেরি পিস্তল তুলে নিল মাসুদ রানা, আকাশের দিকে তুলে ধরে ট্রিগার টেনে দিল। ফস্! করে আওয়াজের সাথে মোটা একটা ধোঁয়ার স্তম্ভ পাক্ খেতে খেতে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল।

একশো ফুট ওপরে টকটকে লাল রঙের বিশাল এক ফুলঝুরি হয়ে বিস্ফোরিত হলো ওটা। কি ঘটল বুঝে উঠতে সময় লাগল নিচের ওদের, তারপরই এদিকে মুখ করে ঝলসে উঠল অনেকগুলো গান মায্ল। শুধু ফ্ল্যাশই দেখতে পেল রানা, হারকিউলিসের বিকট হুঙ্কারের নিচে আওয়াজ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

ওদিকে ওটার ল্যান্ডিং হুইল একবার বাউন্স করল রানওয়েতে, পরক্ষণে আবার গুটিয়ে উঠে যেতে শুরু করল। একেবারে শেষ

মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে পাওয়ার লিভার টেনে দিয়েছে কাজী আনিস। ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লেও কর্তব্য ভোলেনি সে। এঞ্জিনের ভয়াবহ হুঙ্কারে কেঁপে উঠল হিন্দুকুশ পর্বতমালা, ক্রমেই বেড়ে চলেছে তা। বিপজ্জনক ধীরগতিতে, একটু একটু করে মাথা তুলল আবার আলফা পতেঙ্গা। ফিউজিলাজে আফগান ট্রুপারদের গুলির অসংখ্য ছিদ্র নিয়ে দ্রুত সরে আসছে স্ট্রিপ পাড়ি দিয়ে।

তাড়াহুড়োয় সবদিকে নজর রাখা বোধহয় সম্ভব হয়নি পাইলটের পক্ষে, মুহূর্তের জন্যে তাই একদিকে কাত হয়ে পড়েছিল হারকিউলিস, স্টারবোর্ড উইং মাটিতে ঘষা খেতে যাচ্ছিল আরেকটু হলে। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল।

মানুষটার মনের অবস্থা বুঝে নিতে দেরি হলো না ওর। এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেও যে ধাঁধা কাটিয়ে সময়োচিত কাজটা করতে পেরেছে, সে জন্যে মনে মনে হাজারবার তাকে ধন্যবাদ জানাল রানা। মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁ করে সামনে তাকিয়ে থাকল, মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে হারকিউলিসের আকার, সোজা ওরই দিকে আসছে। হাজারটা বজ্রপাতের মত কানের পর্দা ফাটানো শব্দ বাড়ছে তো বাড়ছেই।

প্রপেলারের বাতাসের প্রচণ্ড চাপ রানাকে বসে পড়তে বাধ্য করল, গাছের পাতা ছিঁড়েখুঁড়ে উন্মত্তের মত উড়ছে এদিক-সেদিক। ধুলোর ঝড় বইছে চারদিকে। উড়ন্ত দানবটাকে অনুসরণ করছে রানার চোখ, দেখতে দেখতে পুরো আকাশ ঢেকে ফেলল ওটা। এতই নিচ দিয়ে গেল যে ভয় পেয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো ও। পরক্ষণে সাঁ করে পিছনের এক চুড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আলফা পতেঙ্গা।

উঠে বসল ও। মুখে সন্তুষ্টির চওড়া হাসি ফুটল।

দশ

হালকা অস্ত্রের সাথে হেভি মেশিনগানের টানা ব্রাশ ফায়ারের শব্দে সচকিত হলো রানা, ফায়ার ক্র্যাকারের মত আওয়াজ করছে ওগুলো। আলফা পতেঙ্গার গুঞ্জন ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে দক্ষিণের আকাশ থেকে।

উঠে বসল ও, রানওয়ের আলোয় ছুটন্ত বেশ কয়েকটা কালো কাঠামো দেখতে পেল। সবার অস্ত্র অনুমানে রানার অবস্থানের দিকে তাক্ করা। নিজের তৈরি অ্যামিউনিশন বেল্টের মাস্টার সেফটি ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিল রানা, দড়ির কয়েল কাঁধে নিয়ে দৌড়ে একপাশের ঢালে এসে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। পিছনে বিরাট এক সব্জি বাগান। চারদিক দেখে নিয়ে বাগান মাড়িয়ে ঢাল বেয়ে উল্টোদিকে দৌড়ে নামতে শুরু করল।

বেশ খানিকটা সরে আসার পর ওর বেল্টের প্রথম গুলিটা ফুটল, তারপর শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ। এলোপাতাড়ি, লক্ষ্যহীন ছুটছে গুলি ঠুস্ ঠাস্ করে। কয়েক মিনিট একনাগাড়ে দৌড়ে সামনেই এক বড় গাছ দেখে থামল রানা। প্রায় তিনশো ফুট খাড়া এক ঢালের প্রান্তে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওর কাঁধে যে দড়ির কয়েল আছে, সেটার দৈর্ঘ্যও ঠিক তিনশো ফুট।

গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল রানা, দম নিল লম্বা করে।

স্টারলাইট স্কোপে কুলাচ্ছে না, কালির মত অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না নিচে। আচমকা ভয় গ্রাস করল ওকে। স্যাটেলাইটের ছবি দেখে এই ঢালের যে গভীরতা হিসেব কষে বের করেছিল বিসিআইয়ের বিশেষজ্ঞরা, তা ঠিক আছে তো? কোন ভুল ছিল না তো হিসেবে? দড়িতে যদি না কুলায়, ঝুলে থাকতে হবে ওকে? কিন্তু কতক্ষণ, যদি...

মন থেকে চিন্তাটা জোর করে ভাগিয়ে দিল রানা, এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। পিছনের ওরা প্রায় এসে পড়েছে, বেশ কয়েকটা টর্চলাইটের বীমের নাচানাচি দেখতে পাচ্ছে ও। অবশ্য যথেষ্ট নার্ভাস ব্যাটারা, ওর বেল্টের ব্রাশ ফায়ারের শব্দে একবার লাফিয়ে এদিকে পড়ছে, একবার ওদিকে।

কাজে লেগে পড়ল রানা, দড়ির এক মাথা গাছটার মোটা এক শেকড়ের সাথে শক্ত করে বাঁধল, অন্য মাথা কোমরের বেল্টের পিছনে আটকানো ইংরেজি আট সংখ্যার মত দেখতে ডিসেন্ডার ফ্রিকশন ব্রেকের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে নিচে ফেলে দিল। এবার ডান হাত পিছনে নিয়ে সুদীর্ঘ লেজের মত ঝুলন্ত দড়ি মুঠো করে ধরে লাফ দিল শূন্যে। তার আগে শেষবারের মত দেখে নিল একবার পিছনটা–গাঢ় অন্ধকার!

পর পর দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। মনে মনে ভাবল, ক'টা গেল?

ঝাঁপ দেয়ার সময় লাথি মেরে নিজেকে ক্লিফের দেয়াল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে নিয়েছিল রানা। দশ ফুট মত ওটার সাথে ওর ব্যবধান ক্রমশ বাড়ল, তারপর কমতে শুরু করল। বিশ ফুটের মাথায় দেয়ালের কাছে এসে পড়ল ও, আরেক লাথি মেরে সরিয়ে নিল নিজেকে। বিশ ফুট পরপর লাথি মেরে নেমে চলল নিক্ষিপ্ত ঢিলের মত, প্রতি মুহূর্তে ব্রেক গলে সরসর করে বেরিয়ে যাচ্ছে

দড়ি, ফুরিয়ে আসছে।

খাড়া দেয়ালে রানাকে খুদে এক মাকড়সার মত দেখতে লাগছে। নিচের ঘন আঁধার হাঁ-হাঁ করে উঠে আসছে ওকে গিলে খেতে। একটু পর গতি কমাল ও বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে ভেবে। গোড়ার দিকে এবড়োখেবড়ো রক ফেস থাকতে পারে, শেষ মুহূর্তে ওর কোন একটার সাথে গুঁতো খেয়ে হাঁটু ভাঙার ইচ্ছে নেই। অবশেষে নিচের শক্ত পাথরে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল লম্বা করে। দড়ি তখনও কয়েক ফুট রয়ে গেছে।

নিজেকে হার্নেসের বাঁধনমুক্ত করার ফাঁকে খেয়াল করল ও, ওপরের গোলাগুলি থেমে গেছে। কয়েকটা কণ্ঠের দূরাগত পশ্তু হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে শুধু।

ঘুরে দাঁড়াল ও। ঠিক তখনই নীরবতা খান্ খান্ করে দিয়ে কাছেই কোথাও তীক্ষ্ণ হুইসল্ বেজে উঠল। পরপর দু'বার। ফয়েজ আহমেদ ডাকছে ওকে। আওয়াজ লক্ষ্য করে লাফাতে লাফাতে ছুটল রানা। কয়েক গজ যেতে না যেতে স্কোপে প্যান্থার ওয়ানের পিছনটা দেখতে পেল। তার এপাশে বড় এক বোল্ডারের আড়ালে বসা দেখা গেল লোকটাকে, স্কোপ দিয়ে রানার বাঁ দিকে, পিছনে কিছু দেখছে।

'জলদি করুন, বস্, জলদি!' ব্যস্ত গলায় বলল সে। 'একটা গাড়ি আসছে স্ট্রিপের দিক থেকে।' এক দৌড়ে চালকের আসনে উঠে বসল লোকটা।

'তাই নাকি? কত দূরে?' নিজেকে সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে ছুঁড়ে দিল রানা। পিছনে তাকাল দরজা লাগিয়ে। 'কতজন?'

'দেখতে পাইনি, বস্!' দ্রুত ফার্স্ট গিয়ার এনগেজ করে বলল ফয়েজ। 'আওয়াজ শুনেছি কেবল।'

পরক্ষণে একযোগে চার চাকাই ঘুরতে শুরু করল প্যান্থার

ওয়ানের, একরাশ ধুলো-কাঁকড় ছড়িয়ে ভীতচকিত হরিণের মত লাফ দিল ওটা, ছুট্ লাগাল তুফান গতিতে। পিছনে জাফর ও আলালকে দেখল রানা। চোখাচোখি হতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল দু'জনেরই। 'আপনার স্পাইডারম্যান অ্যাকশন দারুণ লেগেছে, বস্!' পরেরজন বলল। 'ভিডিও ক্যামেরা থাকলে পুরোটা তুলে নিতাম। স্পাইডারম্যান আমার ছেলের খুব পছন্দের হিরো।'

'বাবা আলালের ঘরের দুলাল, আসল কাজ করো,' জাফর বলে উঠল। 'সদরউদ্দিন টেনশনে আছে।'

কোন দরকার ছিল না মনে করিয়ে দেয়ার, কেননা মন্তব্য সেরেই কাজে লেগে পড়েছে সে। 'প্যান্থার ওয়ান টু টু,' হেডসেটের মাধ্যমে বলল, 'মুভিং নাউ। কন্ট্যাক্ট। ওয়ান ভেহিকেল ফলোইং। আউট।'

হু-হু করে ছুটছে প্যান্থার ওয়ান অসমান সারফেসের ওপর দিয়ে, নৌকার মত দুলছে। থেকে থেকে লাফ দিচ্ছে। এক সময় পিছনের গাড়িটা আড়ালে পড়ে গেল, অনেকক্ষণ আর দেখা নেই। খসিয়ে দেয়া গেছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল ফয়েজ, এমন সময় হঠাৎ সামনের এক রকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওটা। ওদের মত ওটাও হেডলাইট অফ করে ছুটছে।

অনেক কষ্টে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াল ফয়েজ, ওটার নাকের সামনে দিয়ে কামানের গোলার মত আড়াআড়ি ছুটে গেল। ওটাও ল্যান্ড রোভার, তবে প্যান্থার ওয়ানের সাথে কোন তুলনাই চলে না। তিন আফগান রেগুলার বসা ছিল ভেতরে, নাকের সামনে দিয়ে কিছু একটাকে ভোঁ করে হাওয়া হয়ে যেতে দেখে ভয়ে, মহাবিস্ময়ে হাউমাউ করে উঠল সবাই।

ব্রেক কষে বড় এক লূপ তৈরি করে ঘুরল আফগান রোভার, পিছু নিল প্যান্থার ওয়ানের। ফয়েজ ততক্ষণে নেমে পড়েছে

খটখটে শুকনো এক নদীতে। অসমান, ফেটে চৌচির ওয়ে যাওয়া মাটির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটছে সিকি টন ওজনের দানবীয় পিঙ্ক প্যান্থার।

'ইয়া মাবুদ!' ক্রমাগত ঝাঁকি সামলাতে ব্যস্ত আহত জাফর অস্ফুটে বলে উঠল। 'মোল্লাদের হাতে না মরলেও ব্যাটা ফয়েজের হাতে আজ নির্ঘাত মরব আমি।'

'আরে চোপ্!' ধমকে উঠল সে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল পিছনে হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখে। আর লুকোচুরি খেলতে রাজি নয় আফগানরা। ওরাও নেমে পড়েছে নদীতে, তেড়ে আসছে। তবে আলোয় তেমন সুবিধে হচ্ছে না বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। গাড়ির দোলের সাথে মাতালের মত এদিক-ওদিক করছে বীম। সামনে নয়, ওপরে-নিচে আর ডানে-বাঁয়ে দেখছে কেবল ওরা।

সামনে থেকে এক পাহাড় এগিয়ে আসছে দেখে নদী ছেড়ে উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল ফয়েজ। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রায় খাড়া দেয়ালের মত উঠে গেছে, ঢাল চোখে পড়ছে না কোথাও যেখান দিয়ে সহজে ওঠা যায়। নিরুপায় ফয়েজ ব্রেক কষল, মাছের লেজের মত পিছনটা তুলে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল প্যান্থার।

'শা-লা!' বিড়বিড় করে বলল সে। গলা প্রায় অনুত্তেজিত।

'জল্‌দি!' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে বলল রানা। 'জলদি করো!'

রিভার্স গিয়ার দিয়ে এত দ্রুত গাড়ি পিছিয়ে নিল ফয়েজ যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। বেল্ট বাঁধা না থাকলে নির্ঘাত নাকমুখ থেঁতলে যেত। পিছন থেকে জাফর কাৎরে উঠল। ফের ব্রেক কষল ফয়েজ, খাড়া দেয়াল বেয়ে কোনাকুনি দৌড় শুরু করল।

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে ছুটল প্যান্থার, হাতের কাছে এটা-ওটা ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকল সবাই। গাড়ি উল্টে পড়তে পারে ভেবে আতঙ্কিত।

কয়েকবার হুমকি দিল ঠিকই প্যান্থার, তবে পড়ল না শেষ পর্যন্ত। চার হেভি থ্রেডেড স্যান্ড টায়ার মাটি কামড়ে ঠেলে তুলে নিয়ে গেল ওটাকে। ওপরে উঠেই লেজ দাবিয়ে দক্ষিণে ছুটল ফয়েজ। এরমধ্যে পিছনেরটা বেশ কাছে এসে পড়েছিল, আবার পিছিয়ে যেতে শুরু করল।

আপনমনে মাথা দোলাল ফয়েজ। 'ওটা আমাদেরটার চেয়ে অনেক হাল্‌কা, রাস্তায় কম্পিটিশনে পারব না আমরা, বস্‌।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'একটু স্লো করো। কাছে এগিয়ে আসতে দাও ওদের। আলাল, জিপিএমজি নিয়ে রেডি হও।'

'রাইট, বস্‌!' ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

রানা সীটের ওপর ঘুরে বসল। 'ওদের একশো মিটারের মধ্যে পৌঁছতে দাও। আমি বললে শূট করবে। হেডসেটটা দাও।'

বুড়ো আঙুল তুলল ব্যস্ত আলাল, নিজের ক্ল্যানসম্যান হেডসেট রানার হাতে তুলে দিয়ে চোখ রাখল সাইটে।

'ওয়ান টু টু,' বলল রানা। 'আমরা গতি কমাচ্ছি কন্ট্যাক্টের ব্যবস্থা করার জন্যে। এগিয়ে যাও। আর ভি অ্যাট ব্রিজ টু।' এখান থেকে আঠারো মাইল আগে জায়গাটা।

জবাব এল, 'রজার। গুডলাক।'

'আউট।' জাফরের হাতে হেডসেট ফিরিয়ে দিল ও। 'আলাল, রেডি?'

'জ্বি, বস্‌। একদম।'

চোখ কুঁচকে পিছনে তাকাল ও। বেশ দ্রুত মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনছে আফগান ল্যান্ড রোভার, হেডলাইটের আকার ক্রমে

বড় হচ্ছে। 'ফয়েজ, তোমার স্মোক গ্রেনেড রেডি?'

'রেডি, বস্।'

'গুড। তৈরি থাকো।'

দুই প্যান্থারের পিছনেই দুটো করে ফ্যান-শেপড্ ডিসচার্জার আছে, প্রতিটা হাউজিঙে আবার তিনটে করে টিউব আছে। এল-৭ ফসফরাস স্মোক গ্রেনেড ভরা আছে টিউবগুলোয়। ওর ধোঁয়া গায়ে লাগলে চামড়া পুড়ে যায়, বারোটা বেজে যায় ফুসফুসের। বোতাম টিপলে প্রায় একশো মিটার দূরে গিয়ে পড়ে ওগুলো।

এদিকে আলালউদ্দিন ব্রীচ লিড খুলে শেষমুহূর্তের ফীড ইন সেরে নিয়েছে। বেল্টের প্রথম দুই রাউন্ড কাজ সারতে সাহায্য করবে তাকে। ট্রেসার ওগুলো। ট্রিগার টানলেই বেরিয়ে গিয়ে চারদিক আলো করে পিছনের ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, একই সাথে আলালকে সুযোগ করে দেবে শত্রুর সঠিক অবস্থান ও হাই ভেলোসিটি জিপিএমজি শেল কোথায় পড়ছে, পরিষ্কার দেখে নিতে। ককিং হ্যান্ডেল টেনে সাইটে চোখ রেখে নিজেকে যথাসম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করছে সে।

ওদিকে তীব্র আলো পড়ায় রানার চোখ প্রায় বুজে এসেছে। আরেকটু। প্যান্থার ওয়ান এখন বেশ ধীরগতিতে এগোচ্ছে। ওর মনে হলো সময় থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি। মহাকাল থমকে দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ কিছু ঘটার আশঙ্কায়।

'আর কদ্দূর, বস্?' অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করল ফয়েজ।

'এসে গেছে,' ধ্যানমগ্নের মত বলল ও। ঠিক তখনই আনুমানিক একশো মিটার রেঞ্জে নাক ঢোকাল পিছনের ল্যান্ড রোভার।

কানের পর্দা ফাটানো শব্দে হুঙ্কার ছাড়ল আলালের জেনারেল পারপাস মেশিনগান। হঠাৎ করে আলো হয়ে উঠল পিছনের গোটা

এলাকা, পরমুহূর্তে বাঁকা এক রেখা ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে তপ্ত মৃত্যু ছুটে যেতে লাগল আফগান ল্যান্ড রোভারের দিকে। প্রথম দুই সেকেন্ডের মধ্যে হেডলাইট চুরমার হয়ে গেল ওটার, একটু পর ফ্লেয়ারও নিভে গেল। ফের গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল চারদিক।

ওদের কেউ আহত হয়েছে কি না বোঝা গেল না। তবে গাড়িটা যে পিছু ছাড়েনি, তা বোঝা গেল। শুধু আসছেই না, গোলাগুলি উপেক্ষা করে পাল্টা ব্রাশ ফায়ারও করছে। একটা প্যান্থারের সাইড বিনে লেগে 'টঙঙ!' শব্দ তুলল।

'ফয়েজ!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'গ্রেনেড!'

সুইচের ওপর থাবা মারল করপোরাল, একইসঙ্গে ছুটে গেল ছয়টা এল-৭, ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল প্যান্থার। দাহনকারী সাদা, ফসফরাস ধোঁয়া পলকে ঘন মেঘের মত ঘেরাও করে ফেলল পিছনের গাড়িটাকে। একদম গায়েব হয়ে গেল ওটা। ওরই মধ্যে আরেক দফা ব্রাশ ফায়ার করল আলালউদ্দিন, সশব্দে বার্স্ট করল ওটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক।

ফয়েজ আবার দৌড় শুরু করতে পিছন ফিরে বসা রানার থুত্‌নি আচমকা গেঁথে গেল সীটের ব্যাকে। ওই অবস্থায় মানুষের আবছা একটা কাঠামো দেখতে পেল ও, পিছনের রোভার থেকে নেমে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। মশালের মত জ্বলছে তার সারা শরীর। বেল্টের শেষ গুলি খরচ করে লোকটাকে মুক্তি দিল আলাল।

বাঁক নিল প্যান্থার ওয়ান, পিছনের দৃশ্য আড়াল করে থাকা ছোট এক পাহাড়ের ওপরের আকাশ তখনও লালচে আভায় উদ্ভাসিত। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে ষাট মাইল বেগে ছুটল ফয়েজ। ব্রিজ টুতে পৌঁছতে পনেরো মিনিট সময় লাগল ওদের।

গভীর এক গিরিখাতের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল

প্যান্থার টুকে। প্রাচীন একটা পাথরের ব্রিজ আছে খাতের দু'পারের যোগাযোগ রক্ষার জন্যে–ব্রিজ টু। গাড়ি তো দূরের কথা, দেখে সন্দেহ হয় কয়েকজন মানুষও বোধহয় একসাথে হেঁটে পার হতে পারবে না, এতই দুর্বল চেহারা। যদিও ওরা নিরাপদেই পার হতে পারল।

নিঃশব্দ হাসি দিয়ে পরস্পরকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করল দুই দল। কিন্তু রানার মুখে হাসি নেই। 'দলে ওরা আরও আছে,' বলল ও। 'কাজেই বেশি খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। আগে ব্রিজটা ওড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে, সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের দেরি করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

কাজটা শেষ করতে পনেরো মিনিট লাগল ওদের। প্যান্থার টুর নেতৃত্ব ও ক্যাসেট এরমধ্যে আরেক দফা হাতবদল হয়েছে। যাত্রা শুরু করার আগে সবার উদ্দেশে বলল রানা, 'প্রথম সমস্যা কাটিয়ে আবার আমরা এক হতে পেরেছি, এটা একটা সুখবর। এখন থেকে মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গেই থাকতে হবে। রাত এখন একটা, হাতে যথেষ্ট সময় আছে। এরমধ্যে যতদূর সম্ভব দক্ষিণে সরে যাব আমরা। আফগানদের সাথে যত ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে, ততই লাভ। যত দূরে যেতে পারব, ওদের সার্চ এরিয়াও ততই বড় হবে। এতে অনেক সুবিধে হবে আমাদের।

'এই পাহাড়ী পথ ধরে যাব আমরা। দশ মাইল দক্ষিণে পড়বে ব্রিজ থ্রী, ওটাও উড়িয়ে দিয়ে যেতে হবে। তারপর আরও ত্রিশ মাইল গেলে এক উপত্যকায় পৌঁছব আমরা। ওখানে ঘন বনের মধ্যে দিন কাটিয়ে আবার কাল রাতে রওয়ানা হব। ওকে, কারও কোন প্রশ্ন?'

পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল ও। 'চলো।'

ভোঁতা একটা বিস্ফোরণের সাথে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল

পাথরের ব্রিজ, কয়েক মুহূর্ত পর শুরু হলো দুই পিঙ্ক প্যান্থারের দীর্ঘ যাত্রা।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল জালালের। মনে হলো বহুদিন সাগরের অনেক গভীরে ছিল সে, এখন সারফেসের দিকে উঠছে একটু একটু করে।

চোখ মেলল সে, সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটল মাথার মধ্যে। চট্ করে আবার চোখের পাতা বুজে ফেলল, টিপে ধরে রাখল শক্ত করে। ইন্টারোগেশন ল্যাম্পের তাপে চোখমুখ পুড়ে যাচ্ছে। কারা যেন কি বলছে কানের কাছে। কেউ একজন থুত্নি ধরে নেড়ে দিল। তার আঙুলে তামাকের মিষ্টি গন্ধ পেল সে।

'চমৎকার, মিস্টার জালাল!' বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'চমৎকার! আপনার সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কথামত পারাচিনার এয়ার স্ট্রিপে ফাঁদ পেতেছিলাম আমরা। প্রায় সফলও হয়েছিলাম, কিন্তু...'

পূর্ণ সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল জালাল। বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল বুকের মধ্যে। পারাচিনার! পারাচিনারের কথা কি করে জানল ওরা? ভাবল সে, আমি বলেছি? নাহ্, আমি তো গারদেজের কথা বলেছি! হ্যাঁ, তাই তো! স্পষ্ট মনে আছে...!

'আপনি অবশ্য একটু চালাকি করেছিলেন,' ওর চিন্তায় বাধা দিল লোকটা। 'পারাচিনারের বদলে গারদেজের কথা বলেছিলেন। আমরা তাতে কিছু মনে করিনি। ভেবেচিন্তে দুই স্ট্রিপেই ফাঁদ পেতেছিলাম, কিন্তু... সে যাক্, প্লেনটার কোথায় নামার কথা ছিল সে তো আপনি জানতেনই। নেমেওছিল ওটা, বুঝলেন? কিন্তু আপনাদেরই কেউ সতর্ক করায় ভেগে গেছে শেষ মুহূর্তে, ধরতে পারিনি আমরা।'

বুকের মধ্যে চাপা উল্লাসবোধ করল জালাল। যাক্, তার মানে…

'কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন? প্লেনটা নেমেই সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেছে। আমরা ওটাকে ধরতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু রেইডিং পার্টিও ওঠার সুযোগ পায়নি। ওরা এখনও এ দেশেই আছে।'

'পানি!' শুকনো ঠোঁট চাটল জালাল। 'একটু পানি!'

'নিশ্চই! নিশ্চই পানি পাবেন, কিন্তু তার আগে আরেকটু সাহায্য করতে হয় যে! মানে রেইডিং পার্টির কন্টিনজেন্সি প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাইছি আর কি! প্লেন ধরতে ব্যর্থ হলে কিভাবে, কোন্ পথে পালাবে ওরা?'

অসুস্থ বোধ করল জালাল। যেন খুব কষ্ট হচ্ছে, এমনভাবে চেহারা বিকৃত করে অস্ফুটে বলল, 'পানি! একটু পানি!'

'ব্যস্ত হবেন না। আগে বলুন পারাচিনার পিক্-আপ ব্যর্থ হলে বিকল্প কোন্ উপায়ে পালাবে ওরা, তারপর…'

'আমি জানি না।'

'তাই কি হয়?' অমায়িক হাসি ফুটল প্রশ্নকারীর মুখে। 'নিশ্চই জানেন আপনি। বলে ফেলুন।'

'বললাম তো আমি জানি না।'

'জানেন না? নাকি মনে করতে পারছেন না? আচ্ছা, দেখি, ব্যাটন ইলেক্ট্রোডের ছোঁয়ায় কাজ হয় কি না!'

একটু পর, অসহ্য যন্ত্রণায় গলার সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল জালাল, অথচ কর্নেল মুরাদের মনে হলো দুর্বল গলায় চিঁ চিঁ করছে একটা ইঁদুর।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

শকুনের ছায়া

[দ্বিতীয় খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সাংবাদিক যুগলকে নিয়ে বিকল্প পথে পালাচ্ছে থান্ডারবোল্ট মিশন। মরুভূমি, বন-বাদাড় ভেঙে। পাক-আফগান বর্ডারের বিশেষ এক জায়গায় পৌঁছতে হবে ওদের, বিকল্প পিক্-আপ পয়েন্টে।

কিন্তু কর্নেল মুরাদ তা হতে দেবে না। আদাজল খেয়ে লেগেছে সে, ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। রানাও নানান কৌশলে ফাঁকি দিয়ে চলেছে, কিন্তু কতক্ষণ?

অবশেষে রেজিস্তানের মরুভূমিতে ওদের ঘেরাও করল মুরাদ। আর উপায় নেই। মিশন ব্যর্থ হতে চলেছে। এখন?

তুষার

মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

বেলাল

মাসুদ রানা

শকুনের ছায়া

[দ্বিতীয় খন্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সাংবাদিক যুগলকে নিয়ে বিকল্প পথে পালাচ্ছে থান্ডারবোল্ট মিশন। মরুভূমি, বন-বাদাড় ভেঙে। পাক-আফগান বর্ডারের বিশেষ এক জায়গায় পৌছতে হবে ওদের, বিকল্প পিক-আপ পয়েন্টে।

কিন্তু কর্নেল মুরাদ তা হতে দিবে না।

আদাজল খেয়ে লেগেছে সে, ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে।

রানাও নানান কৌশলে ফাকি দিয়ে চলেছে।

কিন্তু কতক্ষন ?

অবশেষে রেজিস্তানের মরুভূমিতে ওদের ঘেরাও করল মুরাদ। এখন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

বেলাল

ISBN 984-16-7287-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি, পি, ও, বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-287
SHOKUNER CHHAYA
[Part II]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আটাশ টাকা

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরু *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া।

এক

'সমস্যা, বস্,' বলে উঠল গ্যান্থার টুর পিছনে বসা খন্দকার জাহাঙ্গীর। ডন ও যূথী রয়েছে তার মুখোমুখি।

সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে বসা মাসুদ রানা ঘুরে তাকাল, নজর চলে গেল পিছনের ফেলে আসা পথের ওপর। ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে হেডলাইট দুটোকে খুদে দুই জ্বলজ্বলে পুঁতির মত দেখাচ্ছে। সামনে নজর দিল ও। চোখ কুঁচকে উঠল। 'কতদূরে ওরা, জাহাঙ্গীর? দু'মাইল?'

'তিন মাইলের মত, বস্।'

রেডিওর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল ওর হেডসেট। 'ওয়ান টু টু,' করপোরাল সদরউদ্দিনের গলা ভেসে এল। 'কন্ট্যাক্ট অ্যাহেড, বস্। মনে হচ্ছে রোড ব্লক, বোধহয় পুলিস। মাইল দেড়েক সামনে।'

'টু, রজার। তোমাদের সামনে কোথাও গা ঢাকা দেয়ার জায়গা আছে?'

'আছে, বস্,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। 'পুরনো এক পোড়ো বিল্ডিং আছে। বেশ বড়। ওভার।'

'ওকে, নেমে পড়ো রাস্তা ছেড়ে,' রানা নির্দেশ দিল। 'ওটার আড়ালে অপেক্ষা করো। এদিকে ফেউ লেগেছে আমাদের পিছনে।

আউট।' হেকমত আলির দিকে ঘুরল। 'আরও জোরে।'

পাঁচ মিনিট একটানা খিঁচে দৌড় লাগিয়ে বিল্ডিংটার দেখা পেল ওরা। মাটির তৈরি, আগাছায় ছাওয়া। পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগে। দেখে মনে হয় কোনকালে হয়তো চায়ের দোকান ছিল। ওটার পিছনে শুকনো, পুকুরের মত অগভীর এক গর্তে ঘাপটি মেরে বসে আছে প্যান্থার ওয়ান। না থেমে হেকমতও নেমে পড়ল। সদরউদ্দিনকে দেখা গেল বিনকিউলারে চোখ রেখে একভাবে তাকিয়ে আছে সামনের রোডব্লকের দিকে।

রানাও দেখল। বেশ কয়েকটা পুলিসের গাড়ি। হেডলাইট নেভানো হলেও ছোট ছোট টর্চলাইট জ্বলতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। এদিক-ওদিক ঘুরছে আলোর বীম। সামনের মিশমিশে কালো, ঢালু ল্যান্ডস্কেপের মাঝে ব্যাটাদের অবস্থান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে।

'তাও ভাল ওরা আমাদের দেখার আগে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি,' মন্তব্য করল ও।

'কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ছি, বস্,' কনুইয়ের কাছ থেকে হেকমত আলি বলে উঠল। 'ওরা যেভাবে পথে পড়ে যাওয়া সিকি-আধলির মত খুঁজছে আমাদের, তাতে মনে হয় কয়েক ঘণ্টা লাগবে এই জায়গা ক্রস করতে। এখনও পারাচিনারের অনেক কাছে রয়েছি আমরা। সকাল হয়ে গেলে...' থেমে গেল লোকটা। সেক্ষেত্রে কি ঘটবে তা সবাই বোঝে, তাই আর এগোল না।

'ডাইভার্শনের ব্যবস্থা করতে হয়,' নিজের মনে বলল চিন্তিত মাসুদ রানা। 'ম্যাপে দেখেছি কাছেই একটা গ্যাস পাইপলাইন আছে, একটু পিছনে ফেলে এসেছি ওটা।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল সদরউদ্দিনের। 'ঠিক, বস্। আমিও দেখেছি, মেইন গ্যাস লিঙ্ক। পুরোটাই প্রায় আন্ডারগ্রাউন্ড, তবে

এক মাইল আগের কালভার্টটা পেরিয়ে আসার সময় ওটাকে দেখেছি আমি। কালভার্টের নিচ দিয়ে গেছে, চার ফুট ডায়ামিটারের, একদম খোলা।'

'চমৎকার!'

সাংবাদিক কখন ওদের দলে ভিড়েছে কেউ খেয়াল করেনি। রানার উদ্দেশে বলল সে, 'মেজর, আপনি নিশ্চই মনে করেন না গ্যাস লাইনে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে ওরা আমাদের ধাওয়া করা ছেড়ে দেবে?'

মানসিক প্রস্তুতির সময় বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো ও। তবু গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মেইন গ্যাস পাইপলাইন ফাটলে কি হয় দেখেছেন কখনও?'

'না।'

'তাহলে চুপচাপ বসে থাকুন। দেখুন।'

সদরউদ্দিন ও আলালউদ্দিনকে কাজ সেরে আসার দায়িত্ব দিল রানা। এক পাউন্ড পিই-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর ফিউজ নিয়ে রওনা হয়ে গেল দু'জনে। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে কয়েক ফুট অতিরিক্ত ফিউজ নিতে বলেছিল রানা, যাতে বিস্ফোরণ খানিকটা দেরিতে ঘটে। দেখা গেল সেই দেরিটুকুর কারণেই প্রাণে বেঁচে গেল ওরা, নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যেত। হাড়-মাংসের একটা কণাও খুঁজে পাওয়া যেত না কারও।

আধঘণ্টা পর কাজ সেরে ফিরতে দেখা গেল দুই কমান্ডোকে। আলাল সদরউদ্দিনের কাঁধ ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। গর্তে পড়ে পা মচকে গেছে। এই জন্যে কম করেও পাঁচ মিনিট পিছনে পড়ে গেছে ওরা। এখনও বেশ দূরে আছে। মূল দল থেকে প্রায় দুইশো গজ দূরে আছে ওরা, এই সময় বিস্ফোরিত হলো লাইন। মনে হলো কোন থার্মো-নিউক্লিয়ার বোমা ফেটেছে বুঝি। কাছের

দুই শাট-অফ্ ভালভ স্টেশনের মাঝখানের ওই লাইনে এক মিলিয়ন কিউবিক ফুটেরও বেশি গ্যাস ছিল, আচমকা বিস্ফোরণের ধাক্কায় এবং তার ভয়ঙ্করত্ব দেখে আহাম্মক বনে গেল ওরা প্রত্যেকে।

কোনটা আগে ঘটেছে কেউই ঠিকমত মনে করতে পারল না পরে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকার আওয়াজের সাথে মাটি কেঁপে উঠল থর-থর করে, বেসামাল হয়ে পড়ল দলের সবাই, পরমুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো বিশাল, ভয়াবহ এক আগুনের কুণ্ড। প্রথমে তীব্র নীলচে আলোয় ঝল্‌সে উঠল আশপাশের দশ-বিশ মাইল এলাকা, তারপরই গাঢ় কমলা লাল রঙ ধারণ করল ওটা, ব্যাঙের ছাতার আকার ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল চারদিক আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে। মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দৌড় লাগাল দুই কমান্ডো।

তখনই শুরু হলো পরের ধাক্কা। বিরতিহীন দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ আর ভূমিকম্পের সাথে বিধ্বস্ত পাইপ থেকে ফোয়ারার মত দমকে দমকে উঠতে শুরু করল লিকুইড গ্যাস, প্রতিটা দমক আগের কুণ্ডের লেজের আগুনের ছোঁয়ায় পিলে চমকানো হুপ্! হুপ্! শব্দে জ্বলে উঠতে থাকল। থামার নাম নেই, চলছে তো চলছেই। প্রতিটা হুপ্! আগেরটার চাইতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

এরপর তৃতীয় এবং ফাইন্যাল ধাক্কা। হেভি আর্টিলারি ব্যারেজ চলার সময় যেমন গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে, তেমনি আওয়াজের সাথে রাস্তার দু'পাশের দীর্ঘ পাইপ লাইন মাটির বুক ছিঁড়েখুঁড়ে ছিট্‌কে শূন্যে উঠে পড়ল বিশাল একেকটা মাটির চাঁই আর পাথর সহ। দৈত্যাকার অজগর সাপের মত এঁকেবেঁকে, পাক্ খেতে খেতে রকেটের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। দু'পাশের

অনেকখানি রাস্তাও গেল তার সঙ্গে।

বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। আগুন ত্রিসীমানার পুরো অক্সিজেন শুষে নেয়ার ফলে ঠিকমত দম নিতে পারছে না কেউ, রীতিমত হাঁপানি রোগীর মত অবস্থা। কানের পর্দার ব্যথায় অস্থির।

পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতে গাড়ির দিকে এগোল মাসুদ রানা। শান্ত গলায় বলল, 'চলে এসো, সময় হয়েছে।'

ডন নড়ছে না দেখে দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হেকমত আলি। লোকটা কি পরিমাণ আহাম্মক হয়েছে আন্দাজ করতে গিয়ে হেসে উঠল নীরবে। 'আসেন, সাংঘাতিক ভাই। যেতে হবে।'

বাঘলান।

আধ ঘণ্টা পর টেলিফোনে খবরটা পেল কর্নেল নাজাফ মুরাদ। কিন্তু তেমন ব্যস্ততা দেখাল না, বরং ধীরেসুস্থে কেন্ট ধরিয়ে টানতে লাগল। নজর সিলিঙে নিবদ্ধ। বিস্বাদ লাগছে ধোঁয়া, তবু টেনে চলেছে। লোকাল পুলিস অফিসারের জানানো লোকেশন এবং তার আশপাশের এলাকা নিয়ে ভাবছে। ঘুমের অভাবে চোখ লাল।

একটু আগে পর্যন্ত জালালের সেলে ছিল সে, বিস্ফোরণের খবর পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। যা চাইছিল, জানা হয়ে গেছে। ওকে আর প্রয়োজন নেই তার। বাকি কাজ বরকতী করবে।

তার এইড সঙ্গে আনা ম্যাপ টেবিলে বিছিয়ে জায়গাটা পিন পয়েন্ট করে ফেলেছে ততক্ষণে। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। 'এই যে,' ম্যাপের গায়ে কয়েকটা টোকা দিয়ে বলল। 'এখানে আছে শয়তানের বাচ্চারা! স্যার, চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

নজর নামিয়ে তাকে দেখল কর্নেল। 'গিয়ে কি হবে?'

বিস্মিত হলো এইড। 'ওদের ধরতে হবে না?'

'নিশ্চই ধরতে হবে, তবে এখনই নয়।'

তার শান্ত গলা শুনে আরও তাজ্জব হলো যুবক। 'স্যার...?'

'এই মুহূর্তে আমি খুব ক্লান্ত, মাই ডিয়ার। এরকম অবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয়া উচিত নয়, বুঝলে? তাতে ভুলভাল হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তাই এখনই কিছু করতে চাই না,' কষে এক টান দিল সে সিগারেটে। 'আমাদের রহস্যময় অনুপ্রবেশকারী বন্ধুরা এর মধ্যে দু'বার ফাঁকি দিয়েছে, অতএব আর ফাঁকিতে পড়তে রাজি নই আমি। আগে বিশ্রাম নেব, তারপর...'

'কিন্তু, স্যার, ওখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল...'

'তাতে বরং লাভ হয়েছে আমাদের,' হাসল মুরাদ। সিগারেট মেঝেতে ফেলে জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে দিল।

'জ্বি!' বোকা বোকা চেহারা হলো এইডের।

'দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ওরা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে ওরা দক্ষিণে যাচ্ছে। প্রমাণ করে দিয়েছে যে এত অত্যাচারের পরও জালাল ছেলেটা ফের মিথ্যে তথ্য দিয়েছে আমাদের। ওদের গন্তব্য সম্পর্কে ছেলেটা কি বলেছে, মনে আছে তোমার?'

'জ্বি, স্যার। বলেছে পুবে যাবে ওরা। পেশোয়ারের দিকে।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'পাইপলাইন দুর্ঘটনার লোকেশন জেনে তোমার কি মনে হয়, সেদিকেই যাচ্ছে ওরা?'

চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবল সে। 'না, স্যার।'

'এই তো বুঝেছ। ওরা এখন লেজ দাবিয়ে দক্ষিণে ভাগছে, জেনে রাখো। কয়েক ঘণ্টা আগে ওদের এ দেশ ছেড়ে ভেগে যাওয়ার চান্স ছিল ষোলো আনা, এখন নেই এক আনাও। ঠেকিয়ে দিয়েছি আমরা। ওরা এতক্ষণ কোথায় ছিল একটু আগে পর্যন্তও

জানতাম না, এখন জানি। কোথায় যাচ্ছে তাও। কাজেই শুধু শুধু ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, ওরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল কর্নেল। ঠোঁট গোল করে ধোঁয়া ছাড়ল ম্যাপের ওপর, হালকা নীল রঙের একটা রিঙ ঘুরতে ঘুরতে এইড ওটার যেখানে পিন পয়েন্ট করেছিল, সেখানে গিয়ে পড়ল।

'রাত আর বেশি বাকি নেই, বেশিদূর যেতে পারছে না ওরা। আলো ফোটার আগেই কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। ওদের জায়গায় হলে কি করতে তুমি, কোথায় গা ঢাকা দিতে?'

'বনের মধ্যে, কর্নেল। ছায়া আছে ওখানে, নদীর পানি আছে।'

হাসি ফুটল মুরাদের মুখে। 'ঠিক বলেছ। গ্যাস লাইন নিয়ে এনার্জি মিনিস্ট্রি মাথা ঘামাক, আমি এদিকে একটু বিশ্রাম করি। তবে আগে রোডব্লকের ব্যবস্থা করতে হবে।'

টেলিফোনটা কাছে টেনে আনল সে। এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটা কপ্টার পৌঁছল দুর্ঘটনাস্থলে, অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘেরাও করে ফেলল দক্ষিণে যাওয়ার পথ। তালেবান গার্ড, রেগুলার আর্মি আর পুলিস মিলে কয়েকটা ব্লক খাড়া করল। পথের যেসব জায়গায় উঁচু এমব্যাঙ্কমেন্ট আছে, সেসব জায়গা বাছাই করে বসানো হলো ওগুলো। প্রতিটা এমব্যাঙ্কমেন্টের চূড়োয় থাকল দুটো করে মেশিনগান পোস্ট, সাপোর্টিং টীম। রাস্তা বন্ধ করা হলো কাঁটাতারের ব্লক আর বড় বড় তেলের ড্রাম দিয়ে।

ভোর হওয়ার খানিক আগে সেখানে পৌঁছল মুরাদ। বিস্ফোরণের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে জায়গাটা। তার অনুপস্থিতিতে যে আর্মি লেফটেন্যান্ট যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি জেনে নিল। অল্প সময়ের জন্যে হলেও বিশ্রাম পেয়ে বেশ তরতাজা অনুভব করছে এখন কর্নেল। ঝরঝরে লাগছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল। উত্তরদিকে, কাছের ছোট এক পাহাড়ে একজোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠেই নিভে গেল। এদিকে আসার হাইওয়ের ওপর।

শুধু মুরাদ নয়, প্রায় সবারই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। চারদিক থেকে নানান বিস্ময়ধ্বনি উঠল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল।

'নিশ্চই ওরা, কর্নেল!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল লেফটেন্যান্ট।

'কিন্তু ওরা তো ইনফ্রা-রেড হেডলাইটে চলছিল, হঠাৎ আলো জ্বালার কি এমন দরকার পড়ল?'

'মনে হয় আমাদের ভাল করে দেখার জন্যে, স্যার।'

'দুটো গাড়ি আর কিছু লোক নাও সঙ্গে, কুইক!' বলল কর্নেল। 'আমার সঙ্গে এসো। আর দয়া করে সবাইকে সতর্ক থাকতে বোলো। ওরা যা-তা নয়, তাছাড়া ওটা কোন ফাঁদও হতে পারে।'

'রাইট, স্যার।'

দু'মিনিটের মধ্যে গর্জন করে স্টার্ট নিল দুটো ল্যান্ড রোভার, মুরাদ উঠল প্রথমটায়। রহস্যময় হেডলাইট দুটো যেখানে দেখা গেছে, ঠিক দশ মিনিটের মাথায় সেখানে পৌঁছে গেল দলটা। গাড়ি একটু দূরে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল কর্নেল।

কিছু নেই।

কেউ একজন টর্চলাইটের ফোকাস ফেলল টারমাকের হাইওয়েতে, মুরাদ হাঁটু গেড়ে বসে তীক্ষ্ণচোখে জায়গাটা পরখ করল। কয়েক সেট হেভি ডিউটি স্যান্ড টায়ারের ছাপ চিনতে পেরে সিধে হলো, এদিক-ওদিক তাকাল। 'এখান থেকে রাস্তা ছেড়ে সরে গেছে ওরা। দশ মিনিটও হয়নি।'

লেফটেন্যান্টের চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটল। 'দুটো গাড়ি, স্যার।

বেশি দূর যেতে পারেনি এখনও।'

'লোকজন আর লং রানের উপযুক্ত যত গাড়ি আছে, সব রেডি করো তাড়াতাড়ি। সুইপ সার্চ শুরু করতে চাই আমি।'

'ইয়েস, কর্নেল!' খুশি হলো যুবক।

রানা সম্পর্কে যদি লেফটেন্যান্টের বিন্দুমাত্র ধারণাও থাকত, খুশি হওয়ার বদলে উদ্বিগ্ন হত। শত্রুকে ধাঁধায় ফেলার একেবারে লেটেস্ট টেকনিক খাটিয়ে গেছে রানা রোডব্লক দেখতে পেয়ে। এই পর্যন্ত এসে পিছিয়ে গেছে একই ছাপের ওপর দিয়ে। কাজটা কঠিন, সময়সাপেক্ষ, তবে অসম্ভব নয়। ও যা চেয়েছিল তাই হয়েছে, বিভ্রান্তিতে পড়ে প্রথমেই যে ভাবনা অনুসরণকারীর মাথায় আসা উচিত, তাই ভেবে বসে আছে মুরাদ।

খানিকটা পিছিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ভাগার সময় পলকের জন্যে এক সেট হ্যান্ড স্পটলাইট জ্বেলেছিল সদরউদ্দিন, হেডলাইট নয়। আফগানরা যখন উত্তর-পশ্চিমের বিশাল জায়গাজুড়ে ওদের গরু খোঁজা করছে, থান্ডারবোল্ট টীমের দুই পিঙ্ক প্যান্থার তখন পুবদিক থেকে রোডব্লক বাই-পাস করে সরে পড়েছে। ভোর ছটায় সূর্য উঠল, তার আগেই কান্দুজ রিভার ভ্যালির এক নির্জন আপার স্লোপে সারাদিনের জন্য আশ্রয় নিল ওরা। রাতের হিম পাহাড়ী বাতাস ততক্ষণে সূর্যের তাপে গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

মাথার ওপরের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সার্চলাইটের মত সোনালী আলো আসছে নিচে। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মাসুদ রানা, গাছের ছাউনি প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা পাতলা মনে হতে ক্যামোফ্লেজ নেটিঙের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল। শুরু হয়ে গেল কাজ। দুটো গাড়ি একটু দূরে দূরে রেখে প্রথমে আলোর প্রতিফলন ঠেকাতে হেসিয়ান দিয়ে সব কাঁচ ঢেকে ফেলা হলো। মাটিতে ছোট-বড় সাইজের ডাল পুঁতে তার ওপর বিছানো হলো

নেট, এর ফলে গাড়ির শেপ আর চেনার উপায় রইল না বাইরে থেকে। নেটের ওপর বিছিয়ে দেয়া হলো গাছের পাতার মত রাবারের ফয়লেজ। পাতাসহ কিছু গাছের ডালও।

কোন অনুসন্ধানী পাইলট যদি আকাশ থেকে এরকম জায়গায় লুকানো গাড়ি শনাক্ত করতে চায়, তাহলে এক মাইলের মধ্যে পৌঁছার আগেই তাকে সফল হতে হবে। নইলে কাছে এসে পড়লে প্লেনের গতির কারণে ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে যায় সব, নির্দিষ্ট কিছু দেখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য এ থিওরি সাধারণ ক্ষেত্রে খাটে, থান্ডারবোল্টের বেলায় নয়। পিঙ্ক প্যান্থারের ক্ষেত্রে সে সব যাতে কাজে না আসে, সে আয়োজন নিশ্ছিদ্র করে তবেই এসেছে রানা।

কাজ শেষ হতে সব চেক করল ও, তারপর সন্তুষ্ট হলো। একেবারে কাছে গিয়ে না দাঁড়ালে এমনকি গ্রাউন্ড লেভেল থেকেও ওগুলোকে গাড়ি বলে চেনার উপায় নেই এখন। কোন প্লেন যদি সে চেষ্টা করে গ্রাউন্ড সার্চ রাডারের সাহায্যে, নেটিঙের সাথে জুড়ে দেয়া রাবারের ফয়েলেজ তার সঙ্কেত হজম করে ফেলবে, কিছুই টের পাবে না ওটা। আফগানরা যদি গাড়ির হিট-স্পট শনাক্ত করার জন্যে ইনফ্রা-রেড সিস্টেমও ব্যবহার করে, তবু কাজ হবে না।

পিঙ্ক প্যান্থারের বিশেষ পেইন্ট পিগমেন্ট সত্যিকারের গাছের পাতার মত ক্লোরোফিল ছড়ায়, দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না ইনফ্রা-রেড।

এবার অন্য কাজে মন দিল রানা। ডন ও যূথী যাতে এটাকে কোন রোমাঞ্চকর অভিযান ভেবে বসে না থাকে, সে জন্যে ফয়েজের জিম্মায় ছেড়ে দিল ওদের, ঢালের আরও উঁচুতে সুবিধেজনক জায়গা দেখে সোলার স্টিল তৈরি করতে পাঠিয়ে দিল। পর্যাপ্ত খাবার পানি নেই, কাজেই এছাড়া উপায়ও নেই।

সদরউদ্দিন ও হেকমত আলিকে পাঠাল উত্তর আর পশ্চিম দিগন্তে কড়া নজর রাখতে। সামান্য ধুলো দেখলেও খবর দেবে ওরা। একই সময় আলালউদ্দিন ওরফে টাইগার এ-থার্টিন স্কাইওয়েভ ট্রান্সমিটারের ফোল্ড করা চল্লিশ ফুট দীর্ঘ হরাইজন্টাল এরিয়াল নিয়ে গাছে উঠে পড়ল। সেট করতে লেগে গেল। থান্ডারবোল্টের বার্তা ঢাকায় পৌঁছতে সাহায্য করবে জিনিসটা।

ওদিকে ফয়েজের দেয়া এক হাত লম্বা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল ডন। ভীষণ শক্ত মাটি, একেবারে পাথরের মত। গাঁথার চেষ্টা করলে ঠং করে শব্দ হয়, বাউন্স করে শাবল। অনেক কষ্টে, প্রচুর ঘাম ঝরিয়ে ছয়টা ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ল সে, তারপর করপোরালের ভাষণ শুনতে বসল। সে-ও ছয়টা খুঁড়েছে। বিশেষ কায়দায়, কাছাকাছি খোঁড়া হয়েছে ওগুলো ছয়টার একেক গ্রুপ করে।

গর্তের তলার মাটি থেকে আর্দ্রতা তুলে আনার জন্যেই এই বিশেষ কায়দা, ব্যাখ্যা করল সে। দিন শেষে নাকি প্রতি গর্ত থেকে এক লিটার করে মোট বারো লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া যাবে।

'কি করে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল যূথী।

'দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।' প্রতিটা গর্তে একটা করে ক্যান বসাল ফয়েজ, আধ লিটারের বেশি ওগুলোর ধারণ ক্ষমতা। ক্যান আর গর্তের দেয়ালের মধ্যিখানে গাছের পাতা ভরে ফাঁক বুজিয়ে দিল সে। এরপর খাকি রঙের বারোটা প্লাস্টিক শীট দিয়ে সবগুলো গর্তের মুখ সামান্য ঢিলা করে ঢেকে চারদিকে পেরেক মেরে মাটির সাথে আটকে দিল। সবশেষে প্রতিটা শীটের মাঝখানে একটা করে পোয়াটেক ওজনের পাথর চাপিয়ে দিল, ফলে ঢালু হয়ে থাকল ওগুলোর কেন্দ্র।

'এবার,' মাস্টারী ঢঙে শুরু করল সে। 'সূর্যের তাপে এই শীটগুলো উত্তপ্ত হয়ে গর্তের ভেতরটা গরম করে তুলবে, ফলে ভেতরের মাটিতে আর্দ্রতার সৃষ্টি হবে। বাষ্পের মত ওপরে উঠে আসবে তা, এই শীটের ভেতরদিকে বাধা পেয়ে তরল হতে শুরু করবে। বিন্দু থেকে একটু একটু করে ফোঁটার মত বড় হয়ে ঢাল গড়িয়ে পাথর বরাবর নিচে এসে থামবে, তারপর এক সময় আরও বড় হবে, ভার সইতে না পেরে পেতে রাখা ক্যানের মধ্যে পড়তে থাকবে। ব্যস্, হয়ে গেল পানি।' হাসল করপোরাল।

যূথীও হাসল। 'দারুণ আইডিয়া তো!'

ন'টার দিকে নাস্তা খেল ওরা। সবই শুকনো খাবার, কফি ছাড়া। গর্ত খুঁড়ে খটখটে শুকনো ডাল দিয়ে আগুন জ্বালল জাহাঙ্গীর। কফি তৈরি হতে বাকি জ্বালানি তুলে গর্তের পাশে রেখে দিল, নেভাল না। একসময় আপনিই নিভে গেল ওগুলো, সামান্যতম ধোঁয়াও উঠল না।

নাস্তার চেয়ে কফিতেই বেশি আগ্রহ দেখাল সবাই। দুই ওয়াচের নাস্তা করার সময় অন্য দু'জন ডিউটি করল তাদের বিকল্প হিসেবে। তারপর স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্রাম নিল কেউ কেউ, নয়তো গল্প করে সময় কাটাল। নার্স জাহাঙ্গীরের পরিচর্যায় এরমধ্যে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে জাফর আহমেদ, সে-ও থাকল সবার সাথে। দলের প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখে গর্ব হলো মাসুদ রানার।

ঠিক বারোটায় প্যান্থার ওয়ানে উঠে বসল ও আর টাইগার। এখনও একটু একটু খোঁড়াচ্ছে সে। গতরাতে পাইপ লাইন ওড়াবার কাজে ফিউজ যদি আরেকটু কম ব্যবহার করা হত, তাহলে কি ঘটত, এখনও থেকে থেকে সেই কথা ভাবছে

লোকটা। এমনভাবে পা মচকে গেল, সময় থাকতে ডেঞ্জার জোন ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসা কোনমতেই সম্ভব ছিল না ওদের, এবং রানার নির্দেশে বাড়তি ফিউজ না ব্যবহার করলে বোমাও অনেক আগেই ফাটত। ফল হত...

আরেকবার অজান্তে শিউরে উঠল আলালউদ্দিন, আড়চোখে পাশে বসা ধ্যানমগ্ন মাসুদ রানাকে দেখে নিয়ে হাত বাড়াল স্কাইওয়েভ ট্রান্সমিটারের দিকে। ঠিক ১২০৪ মিনিটের সময় থান্ডারবোল্ট মিশনের প্রথম হাই স্পীড মোর্স মেসেজ ভেসে পড়ল ইথারে, তারপর 'রিসিভ' সুইচ টিপে অপেক্ষার পালা।

দু'পাশের জানালায় ভিড় করা দলের অন্যদের দিকে তাকাল টাইগার, মুখে নার্ভাস হাসি। এর কারণ আছে। এরকম পরিবেশে এরিয়েল ইরেক্ট করা খুবই জটিল এক কাজ, তারওপর কাজটা ঠিক হয়েছে কি না বোঝার কোন তাৎক্ষণিক উপায় নেই। আবার হয়ে থাকলে ঢাকার সাথে সাথে কাবুলের কমিউনিকেশনস্ হেডকোয়ার্টার্সও মেসেজ পিক্ করেছে কি না, তাও বোঝার উপায় নেই।

হিন্দুকুশের মত মাউন্টেন রেঞ্জের কোন পাহাড়চূড়োর বনের মধ্যে থেকে মেসেজ পাঠানো যেমন কঠিন, তার জবাব রিসিভ করাও তেমনি। অথচ বসে থাকার উপায় নেই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঢাকা অ্যাকনলেজ না করলে আবার ট্রান্সমিট করতে হবে। প্রয়োজনে আবার। দলের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এতে। কিন্তু কিছু করার নেই।

আরেকবার রানাকে দেখল টাইগার। পেটের ওপর দু'হাত বেঁধে আয়েশী ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসে আছে ও, মাথা সীটের হেডরেস্টে। আফগান টুপিতে চোখ ঢাকা। ঠোঁটের কোণে সিগারেট পুড়ছে, নীলচে ধোঁয়া পাক্ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জানালা

দিয়ে। ওদিকে হেকমত আলি পরের শিফটের দায়িত্ব খন্দকার জাহাঙ্গীরের ওপর ছেড়ে ফিরে এসেছে, প্যান্থার টুর নিচে স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। থেকে থেকে স্ত্রীর মুখটা ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। ডাক্তারের হিসেবে গতকাল ছিল তার মা হওয়ার তারিখ। তাই ওদিকের খবর জানার জন্যে মনটা ছটফট করছে। একবার ভেবেছিল ট্রান্সমিশনের আগে টীম লীডারকে অনুরোধ করে খবরটা ঢাকাকে জানাতে। সাহস হয়নি। এরকম মুহূর্তে কোন ব্যক্তিগত বিষয় যোগ করে মেসেজ ভারী করার কথা চিন্তা করাও অন্যায়, তবু মন মানে না। পাশ ফিরে শুলো হেকমত আলি, এক হাত চোখের ওপর আড়াআড়ি রেখে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল।

তখনই শোনা গেল টাইগারের উল্লসিত চিৎকার। 'ইউরেকা, বস্! ঢাকা অ্যাকনলেজ করেছে। কাল বারোটায় আমাদের অনুরোধের জবাব দেবে ওরা।'

বাঘলান।

বসে আছে জালাল আহমেদ। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। পরনে জাঙিয়া ছাড়া কিছু নেই। তবে আজ একটু ভাল লাগছে তার, সুস্থ লাগছে। গায়ের বিষব্যথায় গতকাল নড়তেই পারেনি ও।

বারো ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে বরকতী বা কর্নেল মুরাদের দেখা নেই। কাল রাতের পর আর আসেনি তারা। আসবেও না আর। জালাল নাকি অনেক উপকার করেছে তথ্য দিয়ে, বলে গেছে মুরাদ। অনেক উপকার করেছে ওদের। কাজেই তার ওপর আর নির্যাতন করা হবে না।

কিন্তু জালাল তা বিশ্বাস করে না। ও জানে, মুরাদ না হোক, বরকতী হারামজাদা আসবেই, জালালের লাশ না দেখা পর্যন্ত শান্তি হবে না শয়তানটার। থমকে গেল সে, কি এমন উপকার হয়েছে ব্যাটাদের? কী এমন তথ্য জানিয়েছে সে? কি যেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে–বিকল্প এস্কেপ প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাইছিল ওরা। কিন্তু... জালাল নিজেই তো কিছু জানে না সে ব্যাপারে, তাহলে কী এমন তথ্য দিল যাতে উপকার হয়েছে আফগানদের?

চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করল ও। থান্ডারবোল্টের বিকল্প এস্কেপ প্ল্যান আছে, এইটুকুই কেবল জানা ছিল তার, কিন্তু সেটা যে কি, তার কিছুই জানত না। জানার কথাও নয়, কারণ সে ওই টীমের সদস্য নয়। জানত না প্রথমটার কথাও। হামিদার চাচার ওখানে মাসুদ রানা ও শহীদের আলোচনার সময় একবার 'পারাচিনার' শব্দটা শোনে সে, তাতে আন্দাজ করে নেয় ওখান থেকেই প্লেনে করে পালাবে ওরা। এক পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ ছাড়া কিছুই যেখানে নেই, অনর্থক সেখানকার নাম কেন উচ্চারিত হবে? এই ধারণার ওপর নির্ভর করে সম্ভাবনাটার কথা অনুমান করে নিয়েছিল জালাল আহমেদ।

স্রেফ অনুমান ছিল ব্যাপারটা। তবু, হাজারো নির্যাতনের মুখেও ও নাম মুখে আনেনি সে, পরিষ্কার মনে আছে। কর্নেলকে সে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করেছে রেইডার পার্টির সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। কানেই তোলেনি মানুষটা, নির্যাতন করে কবুল করিয়ে ছাড়ল, আছে। একইভাবে রেইডারদের ফিরিয়ে নিতে যে এয়ারক্র্যাফট আসবে, তাও কবুল করিয়ে নিল।

অস্বীকার করে সেবারও লাভ হয়নি, কারণ এরমধ্যে তার জানা হয়ে গেছে যে অমুক দিন ইরানীরা এক অজ্ঞাত ক্র্যাফটের অবস্থান শনাক্ত করেছিল ইরান-আফগান বর্ডারে। কর্নেলের দৃঢ়

বিশ্বাস, ওটায় করেই এসেছে রেইডার পার্টি। শেষ পর্যন্ত পথ নেই দেখে তাকে ভুল পথে চালাতে চেয়েছিল জালাল, কাজ হয়নি। ধূর্ত মুরাদ গারদেজের সাথে পারাচিনারেও ফাঁদ পাতে ওদের ধরার জন্যে।

সুযোগ ফস্‌কে যেতে ফের ওর ওপর শুরু হয় নির্যাতন। এবার দু'জনে একসঙ্গে লাগে জালালের পিছনে। গত ছত্রিশ ঘণ্টায় বহুবার নরক দর্শন করেছে সে, তবু মুখ খোলেনি। খুলবে কি, জানলে তো! বিকল্প প্ল্যান সম্পর্কে তো কিছুই জানে না ও। হামিদাকে নিয়ে অমুকখানে অতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে, গাড়ি থাকবে, তাতে চড়ে বসতে হবে, ব্যস্‌, এই পর্যন্তই ছিল ওর জানার দৌড়। তাই বলেছে।

অথচ কাল রাতে শেষবারের মত যখন ওর সেল থেকে কি এক জরুরী খবর পেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল কর্নেল, বলে গেল ওর দেয়া তথ্যে নাকি অনেক উপকার হয়েছে তার। কাজেই আর নির্যাতন করবে না সে জালালের ওপর। কথাটা কেন বলল কর্নেল, কিছুতেই তার মাথায় আসছে না।

এ নিয়ে অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে। তা হলো, কর্নেল ওকে নির্যাতন করবে না, কারণ ওকে আর দরকার নেই তার। কিন্তু বরকতীর? তার কাছে নিশ্চয়ই জালালের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি? তার মানে এবার এলে আসবে বরকতী, যা করার সে-ই করবে? ঝিম্‌ মেরে অনেকক্ষণ বসে থাকল জালাল। ঠিক তাই, বাকি কাজ বিচারমন্ত্রী করবে। সেটা কি? ফায়ারিং স্কোয়াড?

শিউরে উঠল যুবক। হামিদা...হামিদা কোথায় আছে? এদের ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে তো? বেঁচে আছে তো? ভিলাটা এত চুপচাপ কেন? তালেবান হারামজাদারা কোথায় সব, নেই নাকি? কাল অত ব্যস্ত হয়ে কোথায় গেল মুরাদ? কি খবর এসেছিল?

থান্ডারবোল্ট টীম ধরা পড়েছে? নাকি ওরা কোথায় আছে জানা গেছে?

মন বলল, না। মাসুদ রানাকে ধরা এইসব কাঠমোল্লার কম্ম নয়। জীবনভর ছুটে বেড়ালেও পারবে না ওরা। অবশ্য কর্নেল মুরাদ...জালালের ভাবনা হোঁচট খেল। এই মানুষটা অন্যরকম। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনি ধূর্ত ব্যাটা। এ যদি উঠেপড়ে লাগে...

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অবাক হয়ে গেল তেমন ব্যথা লাগল না বলে। পুরো এক রাত বিশ্রাম পেয়ে সেরে গেছে গায়ের ব্যথা। হাত-পা ছুঁড়ল সে, একদম ঠিক আছে। কোন অসুবিধে নেই।

তখনই অসম্ভব চিন্তাটা ঢুকল মাথায়–পালাতে হবে! পালাতে হবে এখান থেকে। এই একটা সুযোগ, বোঝা যাচ্ছে ভিলায় লোকজন তেমন নেই। এই সময় যদি...কিন্তু কি করে? উদভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাল সে–একটা অস্ত্র চাই, যে কোন একটা অস্ত্র।

কিন্তু সেল তো খালি, খড়ের এক ম্যাট্রেস ছাড়া কিছুই নেই। না, আছে! একটা চেয়ার আছে। কাল রাতে কর্নেল সেলে আসার পর ওটা এনে বসতে দেয়া হয়েছিল তাকে, আর ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। বোধহয় ভুলে গেছে গার্ড। কিন্তু চেয়ার দিয়ে কি...

ভাবনা থামিয়ে চট্ করে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল সে। স্টীল প্লেট দিয়ে দরজা মুড়ে রাখার ফলে বাইরের কিছু দেখা যায় না। অবশ্য কাছে গিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে তাকালে এক-আধটু দেখা যায়। গার্ড কি আছে ওপাশে? ফুটোয় চোখ রেখে ওর কার্যকলাপ দেখছে? পায়চারি করার ভঙ্গিতে সেদিকে এগোল জালাল, চট্ করে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল–নেই।

চেয়ারটা দরজার পাশের দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে এল সে এবার, এখন ফুটো দিয়ে তাকালেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ওটার পায়াগুলো পরখ করতে বসল। পিছনের একটা দুর্বল মনে হলো জালালের, তক্ষুণি ওটা নিয়ে পড়ল।

দশ মিনিট নিরলস চেষ্টা চালিয়ে আরও দুর্বল করে ফেলল সে পায়াটাকে, তারপর কয়েক হ্যাঁচকা টানে ভেঙে ফেলল। আরেকবার বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল–না, কেউ টের পায়নি ব্যাপারটা। চেয়ার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল জালাল। কেউ যাতে ঢুকেই ব্যাপার টের পেয়ে না যায়। এক হাত লম্বা, চৌকো, ভারী পায়াটা গুঁজে রাখল দেয়াল আর ম্যাট্রেসের ফাঁকে।

এইবার! দাঁতে দাঁত পিষল জালাল আহমেদ। গার্ড হারামজাদাকে ভেতরে আনার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর সুযোগ বের করে পায়ার এক বাড়িতে শুয়োরের বাচ্চার ঘিলু বের করে দেবে সে।

তারপর...

দুই

প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের মধ্যে পরদিন দুপুরে সীমান্তের কাছের বেলচিরাগ শহরে পৌঁছল সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ ও হামিদা গুলিস্তানী। ঝড় অবশ্য

সুবিধেই করে দিয়েছে ওদের, নইলে তালেবান গার্ড বা পুলিস, যে কারও হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সীমান্ত শহর বলে এদিকে কড়া পাহারা চলছে ওদের। রেল স্টেশন, বাস স্টপেজ, সবখানে গিজ গিজ করছে ওরা।

বাতাসে পাক্ খেতে থাকা ধুলোর সাথে তীক্ষ্ণধার বালির কণার আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে আর সবার মত ওরাও চোখমুখ ঢেকে কোনমতে দৌড়ে পালাল স্টপেজ থেকে। একই কারণে গার্ডরা আগে থেকেই হাওয়া, কাজেই কোন বাধা এল না। নইলে আসত। বেলচিরাগের কয়েক মাইল আগে দুটো তালেবান চেক পোস্ট অতিক্রম করেছে বাস, যাত্রীদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ওখানে। হামিদার বোবা স্বামীর অভিনয় করে বেঁচে গেছে শহীদ।

এখানে হয়তো তা হত না। নিশ্চই ভালমত চেক করা হত, শহরের কোথায় এসেছে ওরা, প্রয়োজনে তাও। সেক্ষেত্রে একজনেরও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। মিনিট পাঁচেক নীরবে হাঁটল দু'জনে। ছোট মফস্বল শহর যেমন অনগ্রসর হয়, এটা তার থেকেও বহুগুণ পিছিয়ে আছে। রাস্তায় তেমন মানুষজন নেই, ঘরবাড়ি ছাড়াছাড়া। সরু, খাওয়া খাওয়া রাস্তা। সবকিছুতে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

মুখ খুলল শহীদ, 'আর কতদূর?'

চোখ নাচিয়ে সামনের এক গলি নির্দেশ করল মেয়েটি। 'ওটায়।' পথচলার ক্লান্তি ছাপিয়ে স্বস্তি ফুটেছে তার চেহারায়। আর একটু গেলেই নিরাপদ আশ্রয়, কাজেই ফোটারই কথা। একটু বিশ্রাম, খাওয়া, তারপর...। শহীদের চিন্তার গাড়ি কড়া ব্রেক কষল হামিদাকে গলির মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে। সে-ও থেমে দাঁড়াতে যাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু কড়া ট্রেনিং সময় থাকতে সতর্ক

করল, হামিদার বাহু ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলল সে।

'থামবেন না, পা চালান!' বলল চাপা গলায়। কিন্তু কাজ হচ্ছে না দেখে মেয়েটিকে রীতিমত ফ্রগ মার্চ করিয়ে গলি বরাবর উল্টোদিকের ফুটপাথে এসে উঠল সে। ওপারের দৃশ্য দেখায় ব্যস্ত ছোট এক জটলার পাশ কাটিয়ে সামনের এক ঝুপড়ি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা একদম ফাঁকা, একজন খদ্দেরও নেই।

খুব সম্ভব ধূলিঝড়ের ফল, ভাবল শহীদ। আড়চোখে ওপারের গলির ভেতরে নজর বুলিয়ে বসে পড়ল সেদিক ফিরে। এক বাড়ির গেটে দুই পুলিস দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল। 'চাচার বাড়ি?' বলল ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলল হামিদা।

দোকানের পিছনের কিচেন থেকে এক বৃদ্ধ পাঠান বেরিয়ে এল। চওড়া গোঁফ তার। মানুষটাও কম চওড়া নয়। কাছে এসেই চেহারা বিগড়ে গেল তার মেয়ে দেখে।

'কিছু খাবার চাই,' বলল শহীদ। 'আর চা।'

মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'মেয়েমানুষ চায়ের দোকানে নিষিদ্ধ।'

'মাফ করবেন,' হাসির ভঙ্গি করে পকেট থেকে পুরু মানিব্যাগটা বের করল ও। প্রচুর আফগানিতে ঠাসা ওটা। 'আমরা মুসাফির, অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ, তাই বাধ্য হয়ে এখানে ঢুকেছি। তাছাড়া আর কেউ তো নেই, তাই...খেয়েই চলে যাব আমরা।' একটা পঞ্চাশ আফগানি লোকটার হাতে গুঁজে দিল ও। 'একটুও দেরি করব না।'

'কিন্তু মেয়েমানুষ খাইয়ে বিপদে পড়তে পারি আমি,' বলল বৃদ্ধ। তবে এবার যথেষ্ট দ্বিধার সাথে। 'মুসাফির' শুনেই আফগান অন্তর তরল হতে শুরু করেছে।

'মাত্র পাঁচ মিনিট।'

খানিক ইতস্তত করল পাঠান, তারপর শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল। 'ভাল কথা,' পিছন থেকে বলে উঠল সার্জেন্ট। 'ওই বাড়ির সামনে পুলিস দাঁড়িয়ে আছে কেন? কি হয়েছে?'

'ওরা?' চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল তার। পরক্ষণে গলা খাদে নেমে গেল। 'ওটার মালিক নাকি বিশ্বাসঘাতক, তাই কাল রাতে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে বাড়ির সবাইকে। তখন থেকেই আছে ওরা, বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।'

'ও!' হতাশ হয়ে পড়ল শহীদ। এ শহরের কয়েকজন পয়সাওয়ালার একজন হামিদার চাচা। ব্যক্তিগত-গাড়ি আছে। ওরা প্ল্যান করে এসেছে গাড়িটা ধার নিয়ে পালাবে, হলো না। হামিদার দিকে তাকাল শহীদ। চোখ টলটল করছে ওর।

'চাচা-চাচী...!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তিন ভাই-বোন...!' ঢোক গিলল। 'সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে? তাহলে নিশ্চই আমার মা, বড়বোনকেও...'

চুপ করে থাকল শহীদ। কি বলবে?

'আমার কাবুল ফিরে যাওয়া উচিত। নইলে সবাইকে মেরে ফেলবে ওরা।'

'ফিরে গেলে আপনাকেও ছাড়বে না,' বলল শহীদ। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, চট্ করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। দাউদ যখন আছে ওদের দলে, আমার মনে হয় না আপনার মা-বোনের কোন ক্ষতি হবে।'

দোকানের ভেতরে ভাঙাচোরা ক্যাশকাউন্টারে মালিকের রেডিও বাজছে। সন্ধের খবর হচ্ছে। আনমনে শুনছিল ওরা, হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে উঠল হামিদার। 'কি হলো?' ঝুঁকে বসল শহীদ।

ইশারায় ওকে রেডিও দেখাল মেয়েটি। 'খবর!' রুদ্ধশ্বাসে বলল। 'আপনাদের খুঁজছে সিকিউরিটি!'

'আমাদের?'

'হ্যাঁ। বলছে একদল বিদেশী স্যাবোটিয়ার বাঘলান এয়ারপোর্ট থেকে পরশু রাতে একটা কপ্টার নিয়ে পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, হিন্দুকুশের কোথাও ক্র্যাশ করেছে কপ্টার। জায়গাটার নাম শুনতে পাইনি।'

শক্ত হয়ে উঠল সার্জেন্টের সমস্ত পেশী। 'আর?'

'দলটাকে ধরা যায়নি, পালিয়ে গেছে সবাই। সরকার ওদের ধরতে জনসাধারণের সাহায্য চাইছে।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। আট-নয়জন পুরুষ আর একজন মেয়ের এক দল...'

বাকি কথা কানে গেল না সার্জেন্টের। অন্য কথা ভাবছে সে। ক্র্যাশ কোথায় ঘটেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। থান্ডারবোল্ট টাইট শিডিউলের মধ্যে কাজ করছে। এরকম মুহূর্তে হিন্দুকুশে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, নিঃসন্দেহে পুরো এলাকা জুড়ে কাল সারাদিন গিজগিজ করেছে পুলিস-তালেবান গার্ড। পারাচিনারও কাছেই, ওর মধ্যে আলফা পতেঙ্গা সেখানে ল্যান্ড করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে থান্ডারবোল্ট কন্টিনজেন্সি প্ল্যান অনুযায়ী...এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো সে। 'হামিদা! দক্ষিণে যাওয়া যায় কিভাবে?'

'দক্ষিণে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দক্ষিণে!'

'কেন?'

'আগে পথ বলুন, তারপর বলছি।'

কলম্বো, শ্রীলঙ্কা।

তিনদিন আগে 'শুভেচ্ছা সফরে' আসা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর গানবোট বিএনএস আলমগীরের রেডিওরুমে দাঁড়িয়ে আছে চিন্তিত ক্যাপ্টেন কামাল। এইমাত্র ঢাকার নির্দেশ পেয়েছে সে 'অপারেশন উদ্ধার' শুরু করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

ফল-ব্যাক প্ল্যান কার্যকর করতে হবে শুনে পরিস্থিতি সুবিধের মনে হচ্ছে না তার। এর অর্থ থান্ডারবোল্ট সমস্যায় পড়েছে। একইসঙ্গে স্বস্তিও পাচ্ছে ওই দলে সে ছিল না বলে। অথচ বাদ পড়ায় সেদিন তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ জানাল ক্যাপ্টেন।

'তার মানে ওরা লেজের সাথে গোবর মাখিয়ে ফেলেছে!' বলল দলের অন্য সদস্য, সার্জেন্ট হুমায়ুন আহমেদ।

'অবস্থা সেরকমই মনে হচ্ছে। পুরো ডিটেইল্‌স্ জানানো হয়নি, তবে দলের সদস্য একজন নিখোঁজ।'

চমকে উঠল সার্জেন্ট। 'কে, স্যার?'

'নাম জানি না। বলেনি ওরা। তবে মিশন সফল।'

'আমি তাহলে যাত্রার আয়োজন সেরে ফেলি।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'যাও।'

সার্জেন্ট বেরিয়ে যেতে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল কামাল। বন্দর ছাড়ার কাগজ-পত্র তৈরি করতে গেছে হুমায়ুন, সে ফিরলে বাকি প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে। কাল খুব ভোরে, 'বাংলাদেশের পথে' রওনা হয়ে যাবে বিএনএস তিতুমীর।

কলম্বো তাই জানবে। কিন্তু আসলে তা নয়, ভারত মহাসাগরের গভীরে পৌঁছে নাক ঘোরাবে সে, অনেকটা পথ ঘুরে এগোবে আরব সাগরের দিকে। তারপর পাক-আফগান বর্ডারের

বিশেষ এক জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষায় থাকবে থান্ডারবোল্ট টীমের।

নতুন কোন সমস্যা যদি না ঘটে, চারদিন পর সেখানে পৌঁছবে ওরা।

অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে আফগান এয়ারফোর্সের এক রিকনাইসন্স অরিয়ন এয়ারক্র্যাফট। পাইলট-ক্রু কেউ খুশি নয় ওটার, বরং বিরক্ত।

পৃথিবীর সব দেশের মত আফগানিস্তানেও আন্তঃবাহিনী রেষারেষি আছে। এক বাহিনী অন্য বাহিনীর মাতবরী সহ্য করতে পারে না, যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে পরস্পরকে। তারপরও যদি বাধ্য হয়ে একসঙ্গে কাজ করতেই হয়; কাজ যতটা না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় অকাজ।

তাই করছে এখন ওটার পাইলট-ক্রু। অন্তত ওদের সেরকমই ধারণা। কোথায় ইরান বর্ডারে থাকার কথা এখন ওদের, তা নয়, কোথাকার কোন আর্মি কর্নেলের অর্ডারে ভেরেন্ডা ভাজতে হচ্ছে। এই কি সহ্য করা যায়? ওদিকে যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা, কত উত্তেজনা-টেনশন, সব ছেড়ে কি না দেশের ভেতরে আকাশ পাহারা দেওয়া!

কি?-না, সন্দেহ করা হচ্ছে একদল ইরানী ইনফিলট্রেটর ঢুকে পড়েছে দেশের মধ্যে। স্যাবোটাজ ঘটাতে পারে গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ইনস্টলেশনে। ভাল কথা, তাই যদি হয়, সে সব আছে বড় বড় শহরে। বিরান হিন্দুকুশ রেঞ্জে আছে কোন্ কচু? ওখানে কেন চক্কর দিতে বলা? দেশের এমন চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অরিয়নের মত হাইলি এফিশিয়েন্ট এক ইনফ্রা-রেড নাইট সেনসরকে এমন এক কম গুরুত্বের কাজে আটকে রাখা ঠিক হয়েছে হাই কমান্ডের?

আপনমনে মাথা নাড়ল পাইলট–হয়নি।

ওদিকে লাইনস্ক্যান স্ক্রীন অপারেটর অপলক চোখে তাকিয়ে আছে পর্দার ইমেজগুলোর দিকে। থেকে থেকে এক-আধটা হীট-সোর্স ভেসে উঠছে। হিন্দুকুশ মাউন্টেন রেঞ্জের রাস্তায় চলাচলকারী ভেহিকেল ওসব। তাও খুবই কম। কিন্তু ওর কোনটা নয়, অপারেটর জানে। তাকে দেখতে হবে পথ ছেড়ে বেপথে চলছে কি না দুটো গাড়ি, পরিষ্কার নির্দেশ আছে কর্নেল মুরাদের। বেপথে এবং অস্বাভাবিক গতিতে ছুটছে কিনা, সেদিকে নজর রাখতে হবে শুধু।

পাগল আর কি! মনে মনে হাসল লোকটা। হিন্দুকুশে দিনের বেলাতেই ড্রাইভ করা কঠিন, সেখানে কি না রাতে চলবে গাড়ি? তাও বেপথে আর অস্বাভাবিক গতিতে? পাগল নয়, এই কর্নেল লোকটা আসলে উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ। নইলে এরকম...সিগারেট ধরাতে গ্যাস লাইটার জ্বেলেছিল সে, হঠাৎ জমে গেল। আড়ষ্ট হয়ে উঠল দু'কাঁধ। লাইটার জ্বলছে খেয়াল নেই, চোখ বড় করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারা হয়েছে আস্ত উজবুকের মত।

খুদে একজোড়া ডট দেখছে সে পর্দায়, দুটো হীট-সোর্স! কোন রাস্তার বাড়ির ধারেও নেই ওগুলো, একটানা দক্ষিণে চলেছে। গতি কম করেও ত্রিশ মাইল! এ কি অসম্ভব কথা! এমন অদ্ভুত...আঙুলে ছ্যাঁকা খেয়ে লাইটার ছেড়ে দিল অপারেটর, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মনিটরের ওপর।

এক মিনিট পর ইন্টারকমের সুইচের দিকে হাত বাড়াল সে, টিপে দিল। 'মনে হয় ও দুটোর দেখা পেয়েছি আমি।'

হিন্দুকুশ রেঞ্জ।

সন্ধের পর ক্যাম্প গুটিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা দিল

থান্ডারবোল্ট টীম। যাত্রার শুরু থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল রানার, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তা বেড়েই চলল। সুবিধের লাগছে না।

ও জানে এই লক্ষণটা ভাল নয়। অভিজ্ঞতা বলছে সামনে কোন ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে ওরা। এবং মাঝরাতের আগেই প্রমাণ হলো সবকিছু ঠিকঠাকমত চলছে না।

আগের মত আজও পিছনে রয়েছে পিঙ্ক প্যান্থার টু, ফয়েজ মোহাম্মদ চালাচ্ছে। এক ঢাল বেয়ে নামার সময় আওয়াজটা প্রথম কানে এল রানার। দূরাগত গুনগুন ধরনের। নামার সময় গতি কমিয়ে দিয়েছিল ফয়েজ, এঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় নেই হয়ে গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্যে, তাই শোনা গেল। নইলে কতক্ষণে টের পাওয়া যেত কে জানে!

ফয়েজকে থামতে বলবে বলে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু দরকার হলো না। এক মুহূর্ত পর সে-ও শুনল, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। এঞ্জিন অফ করে কান পাতল। 'বস্!'

'শোনো!' কান খাড়া করল রানা। এবার অনেক স্পষ্ট শোনা গেল আওয়াজ। প্লেন! দুই জানালা দিয়ে উঁকি দিল ওরা, পিছনের অন্যরাও। আকাশের বুক সার্চ করতে লাগল কয়েক জোড়া চোখ। কিছুই দেখা গেল না। বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করেও কাজ হলো না। আওয়াজ আছে, অথচ আওয়াজ সৃষ্টিকারীর দেখা নেই।

এক ঘণ্টার মধ্যে আরও দু'বার থামল ওরা। দু'বারই আওয়াজ পাওয়া গেল–দূরাগত, চাপা, তবে অদ্ভুতরকম ভীতিকর। এর কোন অর্থ খুঁজে পেল না মাসুদ রানা।

'কি মনে হয়, বস্?' একসময় প্রশ্ন করল ফয়েজ।

নাকের ডগা চুলকাল ও। 'টার্বো প্রপ মনে হয়, হেভি ট্রান্সপোর্ট।'

'ফলো করছে আমাদের?' যূথী জানতে চাইল।

'দৈব সংযোগও হতে পারে,' বলল ডন।

'না,' মাথা দোলাল রানা। 'অনুসরণই করছে।'

জাহাঙ্গীর ঝুঁকে বসল। 'আমারও তাই মনে হয়, বস্,' বলল সে। 'রিকনাইসন্স প্যাট্রল। হতেই হবে। ব্যাটা এক ঘণ্টারও বেশি আমাদের পিছু লেগে আছে।'

'হারকিউলিস...' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল ফয়েজ।

'অরিয়ন, হয়তো।'

'সেটা কি?' প্রশ্ন করল যূথী।

'ফরাসী মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্র্যাফট। কিছুদিন আগে ওর দুটো কিনেছে এরা।'

'আমাদের লেজে লেগে বিসমিল্লা করল নাকি?' বলল ফয়েজ। 'ভাল মুসিবতের কথা হলো তো!'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল ও। 'ইনফ্রা-রেড ব্যবহার করে অন্ধকারে ট্র্যাক করতে পারে ওগুলো। তবে আমাদেরগুলোর মত এত কার্যকর নয়, সবখানে ট্র্যাক করতে পারে না। এরকম খোলামেলা জায়গার কথা অবশ্য আলাদা। এখানে ওরা আমাদের স্পষ্ট দেখতে পাবে।'

রেডিওর দিকে তাকাল রানা। 'সদরউদ্দিনকে সতর্ক করা দরকার। বিপদের ভয়ে বসে থাকলে আমাদের চলবে না। ফয়েজ, জোরে চালাও। ওয়ানের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে সর্বনাশের ষোলো কলা পুরো হবে।'

গাড়ি ছোটাল ফয়েজ, দেখতে দেখতে ঝড়ের গতি পেল পিঙ্ক প্যান্থার টু। নিজেকে আফগান সার্চ পার্টির জায়গায় বসিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে খানিক মাথা খাটাল রানা, বুঝে ফেলল ওরা জাল

গুটিয়ে আনছে। ওর আগের সমস্ত ডাইভার্শনারি ট্রিক্ কাজে লাগলেও আজ লাগছে না, কর্নেল মুরাদ ধরে ফেলেছে ওর চালাকি, খুব সম্ভব। ওপরের প্লেনটা যদি সত্যিই অরিয়ন হয়ে থাকে, ওটা তাহলে তারই প্রমাণ।

থান্ডারবোল্টকে কেবল পিন-পয়েন্ট করা বাকি ওদের, সে কাজ সারা হলেই ইউনিটের পর ইউনিট আর্মি পাঠিয়ে সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দেবে কর্নেল। ওদের এগোবার কোন পথই রাখবে না। ওরা তখন কপ্টার মোবিলিটির সুবিধেও পাবে।

ঠিক পথেই যাচ্ছে কি না চেক করে দেখার জন্যে থামতে হলো ওদের নির্দিষ্ট সময়ে। সেক্সট্যান্ট আর ক্রোনোমিটার নিয়ে নেমে পড়ল মাসুদ রানা, পরেরটার নির্দিষ্ট সময় সঙ্কেত অনুযায়ী সেক্সট্যান্টে তিন-নক্ষত্রের 'নির্দেশ' নিল খুব সতর্কতার সাথে। হিসেবে একচুল হেরফের হয়ে গেলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে। এই সামান্য ব্যবধানই সকালে দেখা যাবে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কম করেও ত্রিশ মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওদের।

তার ওপর পাহাড়ী অঞ্চলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াও আরেক মহাসমস্যা। প্রতিটি নক্ষত্রের অ্যাঙ্গেল দিগন্তের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নইলে 'নির্দেশ' বেকার। কাজেই দু'বার কাজটা করতে হলো ওকে, যখন দেখা গেল ঠিক আছে, ভুল হয়নি কোন, আবার গড়াতে শুরু করল দুই বাহন।

কিছু সময়ের জন্যে ভাবনায় ডুবে থাকল ও। ভরসা করতে সাহস হয় না, তবু ভাবল প্লেনটা হয়তো এখনও লোকেট করতে পারেনি ওদের। হয়তো শেষ পর্যন্ত আফগানদের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে টীম। নইলে মহাবিপদ। যত বাধা বিপত্তিই ঘটুক, তিনদিন পর জায়গামত পৌঁছতেই হবে ওদের। যদি তা সম্ভব না হয়, কন্টিনজেন্সি প্ল্যানও মাঠে মারা যাবে।

একটা প্রশস্ত মুখের শুকনো নদীর মত ওয়াদিতে নেমে পড়ল ওরা। মেঝে প্রায় সমতল এটার, কাজেই তুমুল গতিতে ছুটল ল্যান্ড রোভার। যত এগোচ্ছে, দু'পারের তীরও ততই খাড়া হচ্ছে ক্রমে। থান্ডারবোল্টের প্রত্যেকের জানা আছে এর শেষ মাথা পাহাড়ে, সঙ্কীর্ণ এক ফাটলের মত। ওখানে পৌঁছে পাথরের উঁচুনিচু শেলফের মত রাস্তা ধরে আরও কয়েক মাইল গেলে তবে সমতল, হায়ার গ্রাউন্ড পাওয়া যাবে। অ্যামবুশের জন্যে ফাটলটা আদর্শ এক জায়গা।

পরিস্থিতি এতটা কঠিন না হলে বা হাতে সময় থাকলে অন্য ব্যবস্থা নিত মাসুদ রানা। ওয়াদির দুই তীর দিয়ে রিকনাইসন্স স্কোয়াড পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিত এগোবার আগে। কিন্তু এখন সে বিলাসিতার উপায় নেই। সমস্যাগুলো সদরউদ্দিনকে জানাতে তাজ্জব হয়ে গেল সে প্রথমে। 'এয়ারক্র্যাফট? কই, আমরা তো শুনিনি আওয়াজ!' সামলে নিয়ে আবার বলল, 'গুলি মারেন, বস্। ওয়াদি ছেড়ে বের হতে পারলে ভাল কাভার পাওয়া যাবে। আরেকটু ফাস্ট আসেন। আউট।'

আলাপ শেষ হয়েছে দেখে ওর দিকে ঝুঁকে বসল সাংবাদিক। 'কোন নতুন সমস্যা হয়েছে, মেজর?'

'নাহ্, কোন সমস্যা নেই। হলে সামনের ওরা জানাবে আমাদের, নিশ্চিন্ত থাকুন,' বলল বটে ও, তবে গলার স্বরে যে আগের আত্মবিশ্বাস নেই, তা-ও টের পেল।

নীরবতা নেমে এল টুর ভেতরে, ভারী পাথরের মত চেপে বসল। গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই, যেন পথের কোন শেষ নেই। যুগ যুগ ধরে ছুটছে ওরা, আরও যুগ যুগ যেতে হবে।

আধ ঘণ্টা পর সবাইকে চমকে দিয়ে খড়মড় করে উঠল রেডিও। 'ওয়ান টু টু!' ব্যস্ত গলা শোনা গেল সদরউদ্দিনের।

বিপদের আশঙ্কায় ঝট্ করে সোজা হয়ে গেল রানা, থাবা দিয়ে মাইকের সুইচ অন করল। 'টু, সেন্ড! ওভার!'

হঠাৎ ওয়াদির উঁচু দেয়াল ডিঙিয়ে একেবারে মাথার ওপর চলে আসা এক কপ্টারের বিকট আওয়াজের তলায় লোকটার গলা চাপা পড়ে গেল। আচমকা আপদটাকে দেখতে পেয়ে পয়লা চোটে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা, তাজ্জবও হলো একেবারে বিনা শব্দে ওটা এত কাছে কি করে পৌঁছল ভেবে। অবশ্য পরক্ষণেই বুঝল বাতাসের উল্টোদিক দিয়ে এসেছে চতুর পাইলট, তাই কিছুই টের পায়নি ওরা। ট্রুপ ট্রান্সপোর্ট ওটা।

ফড়িংটার রোটরের আওয়াজ ওয়াদির খাড়া দেয়ালে বাড়ি খেয়ে এত বিকট প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল যে মুহূর্তে কালা বনে যাওয়ার অবস্থা হলো সবার। ওটা উদয় হওয়ার পর দুই কি তিন সেকেন্ড পেরিয়েছে, এই সময় ওয়াদির ডানদিকের উঁচু দেয়ালের ওপরে অনেকগুলো অস্ত্র একযোগে ঝল্‌সে উঠল। দুটো মিলে শোনাল দূরাগত বরফধস আর ঘন ঘন বজ্রপাতের মিলিত আওয়াজের মত।

কয়েক মুহূর্ত মাথার ওপর ঝুলে থাকল কপ্টার, প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়ে অন্ধ হয়ে গেল সবাই। তারপর ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা, পরক্ষণে এল বুলেটের দ্বিতীয় পশলা। ছুটন্ত প্যান্থার টুর সাইড ঘেঁষে ওয়াদির বেডে লম্বা সেলাইয়ের ফোঁড় তৈরি করে দিয়ে গেল ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট। একটু পর অন্য পারেও অসংখ্য রাইফেলের গান ফ্ল্যাশ দেখা গেল। ঠক্-ঠক্ আওয়াজ উঠল গাড়ির বডিতে, কম করেও আধ ডজন বুলেট বিঁধেছে।

থামল না প্যান্থার, বরং আরও বেড়ে গেল গতি। নাইট স্কোপে চোখ রেখে তাকাল মাসুদ রানা, সামনের প্রতিরোধ বাহিনী কতবড় বোঝার চেষ্টা করছে। তুমুল গোলাগুলি চলছে। শুধু

রাইফেল নয়, ওর মধ্যে বেল্ট-ফেড মেশিনগানও আছে। ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট। ওয়াদির দুই তীরে ওরা এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে, অন্ধকারে এমনভাবে ফ্ল্যাশ করছে ওদের গান মায্‌ল্‌, মনে হয় জ্বলন্ত নেকলেস বুঝি।

এরকম মুহূর্তে প্রথম কাজ হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভাগা। হয় উল্টোদিকে, নয়তো সোজা অ্যামবুশের মধ্যে দিয়ে ফুল স্পীডে। পরেরটা করছে হেকমত ও ফয়েজ। আর্ফগানরা ভেবেছিল আচমকা হামলার মুখে পড়ে হতভম্ব হয়ে যাবে থান্ডারবোল্ট টীম, এগোবে না পিছাবে বুঝে উঠতে না পেরে অল্প সময়ের জন্যে হলেও দ্বিধায় ভুগবে। এই সুযোগে ওরা এগিয়ে আসবে।

কিন্তু ফল অন্যরকম হলো দেখে নিজেরাই দ্বিধায় পড়ে গেল। এই জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবিলার রিঅ্যাকশন-ট্রেনিং নিয়ে হাফেজ হয়ে গেছে হেকমত ও ফয়েজ, তাই বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না। আক্রমণ শুরুর দুই সেকেন্ড পুরো হওয়ার আগেই স্টিয়ারিং হুইল হাবে সেট করা স্মোক-বাটন টিপে দিল ফয়েজ, চোখের পলকে সামনের ও পিছনের স্মোক ডিসচার্জ ইগনাইটর ঝল্‌সে উঠল, ছয়টা করে এল-সেভেন গ্রেনেড ছুটে গেল দুদিকে। সবগুলো প্রায় একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো, শত্রু ব্যাপার টের পাওয়ার আগেই গাঢ় সবুজ ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেল পুরো ল্যান্ডস্কেপ।

প্যান্থার টু গায়েব হয়ে গেছে তার মধ্যে।

ওদিকে গুলি শুরু হওয়ামাত্র ডন ও যূথীকে টান মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে খন্দকার জাহাঙ্গীর, নিজেও শুয়ে পড়েছে পাশে। আর রানা স্কোপ ছেড়ে এক ঝটকায় বনেটে ফিট করা টুইন-মাউন্টেড জিপিএমজি পজিশনে নিয়ে এসেছে, ল্যান্ড

রোভারের উন্মত্ত লাফঝাঁপ সামলে সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই হুশ্ করে মেঘ পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল ওরা। সামনের ওয়াদি বেসিন দিনের মত আলো হয়ে আছে শত্রুর ছোঁড়া ফ্লেয়ারের আলোয়। সামনে ওয়ানকে দেখতে পেল রানা, তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত লেজ দাবিয়ে ভাগছে প্রাণপণে। ওদের একটু সামনে ওয়াদির শুকনো মাটি খুঁড়ে লাইন দিয়ে বসে আছে আরও একদল রেগুলার আর্মি, এখনই গোলাগুলি শুরু করবে।

সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে প্রায় দাঁড়িয়ে আছে সদরউদ্দিন, তার জিপিএমজির লম্বা ব্যারেল অনবরত আগুন উদগীরণ করে চলেছে। হেকমত আলিকে আচমকা শত্রু লাইনের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিতে দেখে গাল কুঁচকে উঠল রানার। তাড়াহুড়ো করে পজিশন নিতে হয়েছে বলে গর্ত তেমন গভীর করার সুযোগ পায়নি ওরা, সবারই পিঠ জেগে আছে সারফেসের ওপর। ওকে গাড়ি ঘোরাতে দেখে রানা যে আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটল। চোখের পলকে সবচেয়ে কাছের ট্রুপারের ওপর গাড়ি তুলে দিল হেকমত, দেহটাকে পিষে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দিয়েই আবার ছুট্। তার মেশিনগান উড়ে গিয়ে পড়ল পাশেরজনের মাথায়, হেলমেট-মাথা, দুটোই গুঁড়িয়ে গেল লোকটার।

ওদের মুখোমুখি পাল্টা আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ল বাকি ট্রুপাররা, দুই-একজন দাঁড়িয়ে পড়ল বোকার মত। রানার জিপিএমজির সংক্ষিপ্ত ব্রাশ পরমুহূর্তে শুইয়ে দিল তাদেরকে। বাকি সবাই অস্ত্র ফেলে ঝেড়ে দৌড় লাগাল ওয়াদির কিনারার দিকে, একজন টুর একেবারে সামনে পড়ে গেল। ফয়েজ চেষ্টা করলে হয়তো পাশ কাটিয়ে যেতে পারত, কিন্তু চেষ্টা করল না।

দড়াম করে তার মেরুদণ্ডের গোড়ায় গুঁতো মারল প্যান্থার টু,

লোকটাকে জাহাজের ফিগারহেডের মত নাকে বাধিয়ে নিয়ে ছুটল খানিকটা, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল ট্রুপার। গলা আর বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল ষোলো ইঞ্চি চওড়া হেভি স্যান্ড টায়ার। কিন্তু তেমন ব্যথা অনুভব করল না লোকটা, কারণ প্রথম ধাক্কায়ই মেরুদণ্ড পাটকাঠির মত ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল তার, ব্যথা টের পাওয়ার মত বোধ ছিল না। তাকে পিষে দিয়েই হাওয়া হয়ে গেল প্যান্থার টু।

কখন যেন মাথা তুলেছিল ডন, ফয়েজ মোহাম্মদের প্রথম পর্যায়ের ফিনিশিং টাচ্ দেখে আহাম্মক বনে গেল। হুঁশ হতে 'ইয়া মাবুদ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ধরে ঠেসে তাকে শুইয়ে দিল জাহাঙ্গীর। 'আরে শুয়ে থাকেন! দেশে ফিরতে পারলে জায়নামাযে বসে ওনাকে ডাকার অনেক সময় পাবেন।'

ওদিকে রানা সাইড বিন থেকে থাবা দিয়ে এক বাক্স গুলি বের করল। সীল ভেঙে নতুন বেল্ট বের করে জিপিএমজির ব্রীচে ভরে পরের রাউন্ডের জন্যে তৈরি হয়ে নিল।

সামনে, ওয়াদি থেকে বের হওয়ার সরু ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে প্যান্থার ওয়ান। উঁচু-নিচু পাথরের শেলফে ছড়িয়ে থাকা পাথরের টুকরো আর ছোট বোল্ডারের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ওপরদিকে উঠতে শুরু করেছে। ফয়েজ ওটাকে অনুসরণ করার জন্যে গিয়ার শিফট করল, ঠিক তখনই পিছন থেকে জাহাঙ্গীর চেঁচিয়ে উঠল, 'কপ্টার, বস্!' পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিছনের পিন্টল মাউন্টিং জিপিএমজির ওপর।

ঝুঁকে ওপরে তাকাল রানা—সেই ট্রান্সপোর্ট কপ্টার। দৈত্যাকার এক চিনূক। পিছন থেকে জাহাঙ্গীর এক পশলা গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু উচ্চতা বেশি বলে ওটার ধারেকাছেও পৌঁছল না বুলেট। তখনই

শেলফে উঠল টু, ঝড়ে পড়া নৌকার মত দোল খেতে খেতে টালমাটাল হয়ে ছুটল ওয়ানের পিছন পিছন। ওটাকে সোজা রাখার জন্যে হুইলের ওপর সর্বশক্তি খাটাতে হচ্ছে ফয়েজকে, চেহারা ঘেমে চক্‌চক্ করছে তার। শার্ট ভিজে সেঁটে আছে গায়ের সাথে। দাঁত বেরিয়ে আছে সার্বক্ষণিক জমাট বাঁধা হাসির মত।

ওদিকে পিছনে, আড়ালে চলে গেছে চিনূক। নিশ্চয়ই ট্রুপস্ নামাতে। হ্যাঁ, তাই। ওয়াদির কিনারায় কয়েকটা ছায়া দেখা গেল একটু পর। আকাশের গায়ে ওদের কাঠামো গোনার চেষ্টা করল রানা, প্রথমে মনে হলো তিনটে। তারপরই আরও কয়েকটা যোগ হলো। এরমধ্যে একটু দূরে সরে আসায় জাহাঙ্গীর অ্যাঙ্গেলে পেয়ে গেছে ব্যাটাদের, কিন্তু প্যান্থারের লাফালাফির জন্যে কিছুই করতে পারছে না।

ঢাল পার হয়ে উঠতে প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে, মনে হলো যেন যুগ যুগ লেগে যাচ্ছে এই সামান্য জায়গা অতিক্রম করতে। পিছনের শত্রু বাহিনী ততক্ষণে পজিশন নিয়ে ফেলেছে। উঁচুতে থাকার অ্যাডভান্টেজের সাথে পাথরের শেল্টারও পাচ্ছে, অতএব বিপুল বিক্রমে কাজে লেগে পড়েছে।

অন্ধকারে ঘন ঘন ফ্ল্যাশ করছে তদের গান মায্‌ল্, তির্যক রেখা ধরে দুই প্যান্থারের দিকে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। ঠুস্ ঠাস্ করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে বডিতে, কাঁচ চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। একটুপর হঠাৎ টুর নিচে দুটো চাপা ফুট! আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে ডান দিকে অনেকটা কাত হয়ে গেল গাড়ি। মনে হলো সাসপেন্নশন ভেঙে গেছে।

'যাহ্!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলে উঠল ফয়েজ। 'টায়ার...!'

'এটার মায়া ছাড়তে হয় এবার,' মরিয়া হয়ে শান্ত গলায় বলতে চাইল রানা। কিন্তু শোনাল একেবারে উল্টো। 'আউট!

জলদি শেল্টার নাও সবাই!'

লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল জাহাঙ্গীর, ডনকে নিয়ে একছুটে ওয়াদির দেয়াল আর ল্যান্ড রোভারের মাঝের সরু ফাঁকে ঢুকে পড়ল। রানা বেরিয়ে এসে থাবা দিয়ে ধরল যূথীকে, কয়েক হ্যাঁচকা টানে ওকে ডনের কাছে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে হেকলার অ্যান্ড কচ্ তুলে ওপরদিকে তাকাল। বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়ছে আফগানরা, মাথার ওপরের এখানে ওখানে আছড়ে পড়ছে বুলেট, ছিট্‌কে উঠে দিগ্বিদিক ছুটছে। পাথরের টুকরোও আছে তার সাথে।

অস্ত্র নামিয়ে নিল রানা। ওদের ঠেকাতে অন্য কিছু লাগবে, এতে কাজ হবে না। পাথরের আশ্রয় ছেড়ে বের হতে বাধ্য করতে হবে ব্যাটাদের। সামনের আড়াল থেকে প্যান্থার ওয়ান সে চেষ্টা করছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না।

ওদের চাইতে উঁচুতে উঠতে হবে, ভাবল রানা। কিন্তু কি করে? জায়গা ছেড়ে নড়াই যাচ্ছে না গুলির ঠ্যালায়। তবু ভাগ্য ভাল যে নাইটসাইট নেই ব্যাটাদের, থাকলে এতক্ষণে পাখির মত একজন একজন করে টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করে দিত ওদের ওপর। কি করা যায়? মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল ও। হঠাৎ সাইড বিনে রাখা খুদে ফিন গ্রেনেডগুলোর কথা খেয়াল হলো। এত হুলস্থূলের মধ্যে ওগুলোর কথা মনেই ছিল না।

সাবধানে মাথা তুলল ও, বিনে হাত ভরে কয়েকটা গ্রেনেড আর পিচ্চি লঞ্চার বের করে আনল। ব্যস্ত হাতে ওটায় গ্রেনেড ভরে উঁচুতে টার্গেট করল, সৈন্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে। পরমুহূর্তে টিপে দিল ট্রিগার। জোর এক 'টং!' শব্দের সাথে উড়ে গেল ফিন গ্রেনেড, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

একটুপরই জায়গামত বিস্ফোরিত হলো ওটা। শূন্যে আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠতে দেখা গেল, একই সঙ্গে কয়েকটা কাতর

ধ্বনিও উঠল, গোলাগুলির তেজ কমে এল ঝপ্ করে। তৃপ্তির সাথে আরেকটা ছুঁড়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার তৈরি হয়ে নিল রানা। দ্বিতীয়টা ফেটেছে এরমধ্যে, সব অস্ত্র থেমে গেছে আফগানদের, চিৎকার আর গোঙানির দূরাগত আওয়াজ আসছে কেবল। মনে হলো কয়েকজন পালাচ্ছে।

তৃতীয়টাও ছুঁড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় আওয়াজটা শুনতে পেয়ে থমকে গেল রানা। চিনূক! আবার আসছে। লঞ্চার আকাশে তাক্ করে স্থির হয়ে থাকল ও। সঙ্গীরাও অনড়, হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে।

পনেরো সেকেন্ড পর দেখা দিল টুইন রোটরের অতিকায় দানব, ওয়াদি পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছে। আপনাআপনি ট্রিগারে তর্জনী চেপে বসল রানার, নাক প্রায় কিনারা পেরিয়ে গেছে ওটার, এইসময় হঠাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠল, পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। কান ফাটানো বিকট আওয়াজের সাথে হাজার টুকরো হয়ে চতুর্দিকে ছুটল চিনূক ও তার যাত্রীদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিছু পড়ল ওয়াদির ভেতরে, তবে বেশিরভাগ বাইরে। এক সৈনিকের গোটা একটা পা পাক্ খেতে খেতে নেমে এল, থপাস্ করে আছড়ে পড়ল যূথী আর ডনের ঠিক মাঝখানে। ছিট্‌কে উঠল রক্ত।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠে দৌড় লাগাতে যাচ্ছিল মেয়েটা, টেনে ধরে ঠেকাল ফয়েজ আহমেদ। রানার এদিকে খেয়াল নেই, চোখ কপালে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কপ্টারের একটা রোটর ব্লেড স্লো-মোশনে, বাতাসে কাস্তের মত কোপ মারতে মারতে নেমে আসছে, সম্মোহিতের মত ওটার পতন দেখছে ও। সোজা এদিকেই আসছে।

সবাইকে সতর্ক করার জন্যে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু

শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ওটাকে দিক্ বদল করতে দেখে। প্যান্থার টুর ওপর দিয়ে বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কেটে ছুটে গেল রোটর ব্লেড, জোর ঠং! শব্দে প্রথম আছাড় খেল পাথরে; আর দেখা গেল না কিছু। অন্ধকারে ভাঙাচোরার আওয়াজ শোনা গেল কেবল। তারপর সব চুপচাপ।

অসহ্য, অখণ্ড নীরবতা।

উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে শুরু করল ফয়েজ, জাহাঙ্গীর, ডন ও যূথী। সবাই চুপ। মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে যেন।

এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সচকিত হলো মাসুদ রানা। হাত তুলে পকেট ফোন অন করে বলল, 'টু টু ওয়ান। তোমরা ঠিক আছ? ওভার।'

'ওয়ান টু টু!' সঙ্গে সঙ্গে সদরউদ্দিনের উল্লসিত গলা শোনা গেল। 'একদম ঠিক আছি, বস্! ওভার।'

'আউট।' গ্রেনেড-লঞ্চার বিনে রেখে ফয়েজের দিকে তাকাল ও। 'গাড়ি খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এখানে টায়ার বদলানো সম্ভব না, উচিতও হবে না।'

মাথা দোলাল লোকটা। আবার ফোনে কথা বলতে শুরু করল রানা।

তিন

বাঘলান। ভোর পাঁচটা।

রহস্যময় রেইড়ার পার্টির হাতে সরকারী বাহিনীর নাস্তানাবুদ হওয়ার খবর পেয়ে চুপ করে থাকল কর্নেল নাজাফ মুরাদ। খবরটা জানিয়েছে তার এইড। সুইপ সার্চ ব্যর্থ হওয়ায় মিশনের দায়িত্ব সেই লেফটেন্যান্টকে দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক আগে ফিরে এসেছে সে। এইডকেও রেখে এসেছে।

একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চিন্তা ভাবনা করছিল কর্নেল ওদিকের কোন খবর নেই দেখে। সবে চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। আর এল তো এল, তা-ও এই খবর। উপায় নেই দেখে এত ট্রুপার আর চিনূক হারানোর দুঃখ দ্রুত হজম করে ফেলল সে, বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসল।

লড়তে গেলে ক্ষয়ক্ষতি হবেই, তা নিয়ে হায় আফসোসের কোন অর্থ হয় না। কিছু সেনা সদস্য মরেছে মরুক, একটা কপ্টার গেছে যাক্, ওসব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই প্রথমবারের মত শয়তানের দলের সাথে সরাসরি মোলাকাত ঘটেছে। পালিয়ে গেলেও মাঠ যে একেবারে ফাঁকা নয়, ওরা চাইলেই যে ইচ্ছেমত গোল করতে পারবে না, সেটা বুঝিয়ে দেয়া গেছে ওদের। সেই সাথে এটাও আরও পরিষ্কার হয়েছে যে কর্নেলের ধারণা ঠিক।

দক্ষিণেই যাচ্ছে ওরা।

তার মানে পাক-আফগান বর্ডার হয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে, নিশ্চয়ই সাগরে অপেক্ষমাণ শিপে চড়ে ভাগবে। সেটি হচ্ছে না। কিন্তু এদিকে আরেক সমস্যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় জটিলতর হয়ে উঠছে। কয়েকজন ইরানী কূটনীতিক কাবুল থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে বলে কাবুলের ওপর খেপে গেছে তেহরান। হুমকি-ধমকি দিয়ে অস্থির করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, সীমান্তে প্রচুর সৈন্য-সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি জড়োও করেছে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছে ওরা।

এই জন্যে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে আফগান সেনাবাহিনীকে। ওদের সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আরও আছে, এ মুহূর্তে ওদের যে ইউনিটকে কাজে লাগাচ্ছে কর্নেল, উল্টে তাদেরও যে কোন মুহূর্তে হাতছাড়া হওয়ার ভয় আছে। আছে মানে ছিল, এখন নেই। সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে মুরাদ।

একটামাত্র রেডিও দিয়েছে সে ওদের, তাও এইডের হাতে, এবং কর্নেলের নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা আছে ওটা। এতে করে কাবুল হাই কমান্ড চাইলেও সরাসরি ওদের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারবে না, ফ্রন্ট্রের দিকে মার্চ করার নির্দেশ দিতে পারবে না। ভেবেচিন্তে ঠিক করল কর্নেল, ইরানকে পুঁজি করেই কাজ সারবে সে। নইলে বাংলাদেশের কথা বলে নতুন কোন সুবিধে আদায় করা যাবে না। অন্তত এই ব্যাপারে তাকে আর সুযোগ দেবে না বরকতী।

এইডকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল মুরাদ। অন্য কোন মিলিটারি ইউনিটের সাথে যোগাযোগ না করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে অফ করে দিল রেডিও। কিছু ভাবল, তারপর ফোন করল কাবুলের জেনারেল স্টাফ সার্ভিসের ইমার্জেন্সি নাম্বারে।

'কনেল মুরাদ বলছি, চীফ অভ স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিট, অ্যাটাচড্ টু তালেবান রেভলিউশনারি কাউন্সিল,' গম্ভীর গলায় বলল সে।

'ইয়েস, কর্নেল! স্যার?'

'আমার কাছে হাইলি ক্লাসিফায়েড ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট এসেছে। ওটায় বলা হয়েছে, একদল ইরানী ইনফিলট্রেটর দেশের দক্ষিণ সীমান্তের কোথাও ল্যান্ড করেছে। ওদের ধরতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কপ্টার সাপোর্টসহ এক কোম্পানি ক্র্যাক ট্রুপস চাই আমি।'

'কিন্তু এ অসম্ভব, স্যার!' রিসিভার বলে উঠল। 'আমাদের সমস্ত ইউনিট বর্ডারের দিকে যাচ্ছে। ওখান থেকে...'

'আপনি চান ইরানী স্যাবোটিয়াররা দেশের মধ্যে ঢুকে নাশকতামূলক কাজ করুক, আমাদের ক্ষতির বোঝা আরও ভারী করুক?'

'না, কর্নেল। আমি বলতে চাইছি আপনার দাবি পূরণ করা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।'

আরও গম্ভীর হলো মুরাদ। 'আপনি কি জানেন আমি এ ব্যাপারে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিয়ে তবে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছি?'

বিষম দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা। 'না, কর্নেল, স্যার!'

'ওকে। প্রয়োজন মনে করলে তাঁর সাথে যোগাযোগ করে শিওর হয়ে নিয়ে নিন, তারপর যা বললাম, ইমিডিয়েটলি তাই করুন।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ফোন রেখে দিল কর্নেল। নিজের নাকেমুখে মিথ্যে বলায় পারঙ্গমতা দেখে মনে মনে হাসল। এতবড় এক মিথ্যে বলল, অথচ জেনারেল স্টাফের তা ধরার ক্ষমতা নেই,

ভাল করেই জানে সে। এমন জরুরী মুহূর্তে এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহসই হবে না ওদের।

ব্যাপারটা হঠাৎ করেই ঘটল। রানাসহ প্রায় সবার চোখ-মন, দুটোই ছিল গাড়ির দিকে, তাই খেয়ালই করেনি কখন একদল সশস্ত্র, পাহাড়ী আফগান এসে হাজির হয়েছে। ওর টনক নড়ল পকেটফোন মাইকে হেকমত আলির চাপা সতর্কবাণী শুনে। একটু তফাতে সরে তলপেটের চাপ খালাস করতে গিয়েছিল লোকটা।

'পিছনে দেখুন, বস্।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল ও, অস্ত্রের দিকে হাত চলে গিয়েছিল আপনাআপনি, কিন্তু সামাল দিল এখনই তার দরকার নেই দেখে। গাধার পিঠে বসে আছে মানুষটা। কম করেও ছয় ফুট চার ইঞ্চি হবে, পাশেও তেমনি। মুখ বিরাট, প্রায় গোল। গাল ভর্তি দাড়ি। দেখতে আস্ত এক দানবের মত। তার ভার বইতে গিয়ে পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে গাধাটার। দানবের কাঁধের ওপাশ থেকে মাথা তুলে আছে হেভি কালাশনিকভের নল। ওদের ওপর চোখ রেখে সিগারেট তৈরি করছে সে। খালি পা।

তার পিছনে আরও তিনটে গাধা, প্রতিটার পিঠে একজন করে সওয়ারী। দানবের মত তাদের পিঠেও কালাশনিকভ। এক এক করে প্রত্যেককে দেখল রানা। কারা এরা?

'দারুণ ওস্তাদ তোমরা, মাই ফ্রেন্ড!' গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল প্রথমজন, শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হাসল খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আর মাটির বড় জোর এক ইঞ্চি ওপরে ঝুলন্ত দুই গদার মত পা দুলে উঠল তার। 'এতবড় ক্ষতি করে দিলে ওদের?' মাথা ঘুরিয়ে কন্টারের ধ্বংসস্তূপ আর মৃতদেহগুলো দেখাল। 'তা ভালই করেছ। কিন্তু...তোমরা কারা বলো দেখি! দেখে তো মনে হয়

আর্মি!'

'ভুল হয়নি আপনার,' রানা বলল। 'আমরা আর্মিই।'

প্রকাণ্ড মাথা ওপর-নিচে দোলাল সে, যেন বিশ্বাস করেছে নির্দ্বিধায়। 'আমরাও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু আর্মি হয়ে আর্মির কপ্টার, ট্রুপার...ইয়ে, ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা।'

'কমান্ডিং অফিসারের সাথে গণ্ডগোল হয়েছে আমাদের।'

'আহ্, আই সী, মাই ফ্রেন্ড!' সিগারেট ধরিয়ে টানল লোকটা, পরক্ষণে কেশে উঠল ভীষণভাবে। কাশির দমক দেখে রানার মনে হলো এবার নির্ঘাত বসে পড়বে তার গাধা। 'তার মানে তোমরা বিদ্রোহী?'

জবাব দিল না ও। সতর্ক চোখে লোকগুলোকে মাপছে, অস্ত্র তোলার প্রয়োজন পড়বে কি না বোঝার চেষ্টা করছে।

'ভাল, ভাল!' মাথা দোলাল লোকটা। 'তোমরা তাহলে আমাদের বন্ধুই।' ফের হা-হা করে হেসে উঠল। আগ্নেয়গিরির মত ভয়াবহ আওয়াজ উঠল, গোটা ল্যান্ডস্কেপ কাঁপিয়ে দিল। অস্বস্তি লেগে উঠল রানার।

'আপনারা...?'

'আমরা?' হাসি থামিয়ে আরেক দম দিল সে সিগারেটে। কাশল। 'এই...তোমাদের মতই বলতে পারো।'

'মুজাহেদিন?'

'হ্যাঁ।' একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল, 'তোমরা এতগুলো শয়তানকে কচু-কাটা করেছ দেখে আমরা ভারি খুশি হয়েছি, মাই ফ্রেন্ড। সত্যি ভারি খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

'না না, ধন্যবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওটা বরং তোমাদেরই প্রাপ্য।'

দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল মাসুদ রানা। 'এই অসময়ে কি করছেন আপনারা এখানে?'

সিগারেটের গোড়ার দিকের খানিকটা লূজ তামাক দাঁত দিয়ে কেটে 'থোক্' করে ফেলল দানব, ঠিক রানার একহাত সামনে। 'তুমি বেশি প্রশ্ন করো, স্ট্রেঞ্জার।' ফের কষে ধোঁয়া টানতে গিয়ে কেশে উঠল।

'দুই স্ট্রেঞ্জার যদি পরস্পরকে প্রশ্ন না করে, তাহলে একজন অন্যজন সম্পর্কে জানবে কি করে!' এমনভাবে বলল ও, প্রশ্ন হলেও শোনাল মন্তব্যের মত।

মনে মনে ওর যুক্তি স্বীকার করে নিলেও প্রকাশ করল না লোকটা, স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বাতাসে হাই ভোল্টেজ কারেন্টের মত টেনশন বিরাজ করল কিছু সময়ের জন্যে। মেঘ সরে যেতে চাঁদ বের হলো। তার নিস্তেজ, ঠাণ্ডা আলোয় দু'চোখ চকচক করে উঠল পাঠানের। তিন সঙ্গী নড়েচড়ে বসল বাহনের পিঠে।

তারপর হঠাৎ করে দানবের ঘন দাড়ির মধ্যে একটা ফাঁক দেখা দিল। হাসছে। 'ভাগ্যগুণে আজ এক বুদ্ধিমান মানুষের সাথে পরিচয় হয়ে গেল বলে আমি খুশি হয়েছি।' বাঁ পা গাধার মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে রেখে দাঁড়াল লোকটা।

ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি সালামতউল্লাহ্।'

নিজের হাতের দ্বিগুণ বড়, থাবার মত হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল ও, নাম ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে করল না।

ওর দিকে তাকিয়ে আরেকবার দাঁত দেখাল সালামত। 'এবার আমি কিছু প্রশ্ন করি, কেমন? তোমরা কাদের সমর্থক, আমাদের, না তালিবানদের?'

'কারও না। আমরা স্বাধীন।'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি এমন ঘটল...'

'কমান্ডিং অফিসারের সাথে মতের মিল হচ্ছিল না অনেকদিন থেকে, তাই সরে পড়ব ঠিক করেছিলাম। আজ সুযোগ এসে গেল।'

মাথা দোলাল সালামতউল্লাহ। 'ভালই করেছ, মাই ফ্রেন্ড। এবং সঠিক জায়গাতেই এসেছ। এখানে আমাদের মধ্যে থেকে যত খুশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে তোমরা। আমরাও তোমাদের চমৎকার গাড়ি দুটো কাজে লাগাতে পারব।'

প্যান্থার ওয়ানের দিকে এগিয়ে গেল সে। চোখ কুঁচকে ওটার ভেতরে-বাইরে দেখল। 'অস্বাভাবিক,' মাথা দোলাল আপনমনে। 'খুবই অস্বাভাবিক জীপ তোমাদের, সোলজার বয়। এমন গাড়ি আগে কখনও দেখিনি আমি। ভেরি ইমপ্রেসিভ। ডেঞ্জারাস!' শেষ উপমাটা পছন্দ হওয়ায় মাথা দোলাল। 'রিয়েলি ডেঞ্জারাস।'

সদরউদ্দিন ছাড়া থান্ডারবোল্ডের অন্য সদস্যরা কাজে ব্যস্ত, এদিকে বিশেষ নজর নেই কারও। করপোরালের সতর্ক চোখ পড়ে আছে সালামতউল্লাহ ও তার তিন সঙ্গীর ওপর। ওদের সবাইকে দেখল লোকটা, তারপর চেহারা বিকৃত করে হাসির ভঙ্গি করল।

'তোমার সঙ্গীরা,' গাল চুলকাল। 'মূক ও বধির রেজিমেন্টের সদস্য নাকি, মাই ফ্রেন্ড?' সদরউদ্দিনকে উদ্দেশ করে প্রশ্নটা করল সে।

'ওরা কাজে ব্যস্ত দেখতেই পাচ্ছেন,' জবাবটা রানা দিল, এবং খুব দ্রুত। কারণ ও ছাড়া দলে ভাল পশতু জানত একমাত্র সার্জেন্ট শহীদ। এরা যা জানে, তা কোনরকমে ঠেকা চালানোর জন্যে শেখা। মুখ খুললে কে কোন ভুল করে বসে, তাই কাটাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কাজ হলো না। পরের প্রশ্নটা আবারও সদরউদ্দিনকে করল সে। 'আমরা তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি?'

মুখ খোলার আগে চট্ করে রানাকে দেখে নিল সে একপলক। বলতে চাইল 'কোন দরকার নেই, ধন্যবাদ,' কিন্তু ভুলে বলে বসল, 'আমরা ভাল আছি, ধন্যবাদ।'

গাল কোঁচকাল রানা। আহাম্মকটা কেন মুখ খুলতে গেল? না হয় না শোনার ভানই করত। সালামতউল্লাহর ভুরু কুঁচকে উঠল দেখে শান্ত গলায় রানা বলল, 'সরি। ও কানে ভাল শোনে না। বুঝতে ভুল করেছে।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'আজকাল এইসব অচল মালও চলে তাহলে আফগান সেনাবাহিনীতে!'

ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার ধ্বংস হলেও বেশি আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, জানে রানা। ডিটাচমেন্টের সবাই মারা গেছে বলে মানতে রাজি নয়। কিছু নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। ধারেকাছেই হয়তো ওত পেতে আছে রিইনফোর্সমেন্টের আশায়, ওরা এসে পৌঁছলেই ফের শুরু করে দেবে। কাজেই তাড়াতাড়ি গাড়ি মেরামত করে ভাগতে হবে।

উটকো সালামতউল্লাহ এসে দেরি করিয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবে তাকে মনে মনে স্বাগতও জানাল রানা গাধাগুলো কাজে লাগানো যাবে ভেবে। প্যান্থার ওয়ানের একটা টায়ার গেছে, তবে ওপরের নিরাপদ জায়গাতে আছে ওটা। সমস্যা হয়েছে টু-কে নিয়ে। একদিকের দুটো টায়ার তো গেছেই, তারওপর ট্র্যাকের কিনারায় এমনভাবে হেলে আছে ওটা যে ওদের পক্ষে ঠেলে ওপরে তোলা ভীষণ কঠিন। গাধার সাহায্যে ওটাকে তোলার আয়োজনে লেগে পড়ল আলালউদ্দিন ও জাহাঙ্গীর।

ওদিকে সালামতউল্লাহ সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েও বলতে গেলে কিছুই করল না হুকুমদারী ছাড়া। বড় এক বোল্ডারে বসে সিগারেট

টানা আর খানিক পরপর বিচ্ছিরি কাশির সাথে সঙ্গীদের উল্টোপাল্টা নির্দেশ দিয়ে সহজ কাজ বরং জটিল করে তুলল সে। দলের সবচেয়ে হীনস্বাস্থ্যের লোকটিই যা একটু ঘাম ঝরাল ওদের জন্যে। বাকি দু'জন যা করল, তা শুধু দেখানোর জন্যে। টানা বিশ মিনিট পরিশ্রম করে টু-কে ওপরের খোলা জায়গায় নিয়ে আসা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফর্মুলা ওয়ান পিট স্টপ ক্রুদের মত তুফান বেগে টায়ার বদলের কাজে লেগে পড়ল ওরা।

ওদিকের কাজ শুরু হতে আর কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে চেক্ করতে লেগে পড়ল রানা ও সদরউদ্দিন। চারদিক একদম নীরব, মৃদু বাতাস ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। চাঁদ পশ্চিম আকাশে হলুদ আভা ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে এখন। ভোর হতে আর দেরি নেই।

ক্ষয়ক্ষতির হিসেব দ্রুত সেরে নিল ওরা। প্যান্থার ওয়ানের একটা চাকা ছাড়া লং রেঞ্জ স্কাইওয়েভ সেটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর গেছে হেডল্যাম্পের কিছু বালব্। কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, কারণ ওটার ডুপ্লিকেট আছে রানারটায়। টায়ার আর বালব্ বদলে নিলেই হবে।

আসল চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল টায়ারের স্টক। প্রতিটার সাথে দুটো করে এক্সট্রা ছিল, এক ধাক্কায় তিনটেই গেছে। আর একটা মাত্র বাকি থাকল। যদি এরকম আরেকটা অ্যামবুশে পড়তে হয়, তাহলে হয়তো একটা গাড়ির মায়া অন্তত ছাড়তে হবে। আরেকটা বড় ক্ষতি হয়েছে প্যান্থার টুর বিশেষ ওয়াটার জ্যাকেট ফুটো হয়ে। রেডিয়েটরের সামনে ফিট্ করা ছিল পানি ভরা জিনিসটা, রেফ্রিজারেশন ইফেক্টের মাধ্যমে রেডিয়েটরের পানির গরম হয়ে ওঠা ঠেকানোর কাজ করত। ওটা ছাড়া দিনের বেলা

মরুভূমিতে ছুটতে গেলে মাত্রাছাড়া গরম হয়ে উঠবে পানি, কিছু করার থাকবে না।

কোনমতে সামাল দেয়া হলো অবশ্য ফুটোগুলোকে, কিন্তু ততক্ষণে যে পরিমাণ পানি পড়ে গেছে, তা পূরণ করতে গিয়ে দলের খাবার পানির রিজার্ভ আশঙ্কাজনক মাত্রায় নেমে গেল।

চার

'তোমাদের দলে মেয়েও আছে দেখছি, মাই ফ্রেন্ড!'

সালামতউল্লাহর বিস্মিত প্রশ্নে সচকিত হলো মাসুদ রানা। আর সবার মত যূথীও ফেটিগ পরে আছে, তারওপর আলোও অপর্যাপ্ত, তাই ব্যাপারটা ওদের চোখে পড়বে না ধরে নিয়েছিল ও, এরা না যাওয়া পর্যন্ত ওর সাথে সবাইকে পুরুষ সঙ্গীর মত আচরণ করতে বলে ভেবেছে তাতেই কাজ হবে। কিন্তু হলো না। নিজেকে পুরুষ প্রমাণ করার জন্যে সমানতালে কাজ করতে গিয়েই ধরা পড়ে গেছে মেয়েটা। ঝুঁকে বসে হেকমত আলির সাথে টায়ার মেরামত করার ফাঁকে খেয়ালই করেনি ওপরের বোতাম খোলা থাকায় বুক দেখা যাচ্ছে তার।

রানা মুখ খোলার আগেই লোকটা আবার বলে উঠল, 'আমিও একসময় আর্মিতে ছিলাম। কিন্তু তখন মেয়ে ছিল না। সময় সত্যি বদলে গেছে। যদি জানতাম আর্মিতে আজকাল মেয়ে নেয়া হয়,

তাহলে হয়তো আবার যোগ দিতাম।'

হা-হা করে হেসে উঠল সে। তারপর হঠাৎ করেই চাউনি কঠোর হয়ে উঠল। 'কিন্তু তালিবানদের হঠাৎ এই মতিভ্রম কেন হলো বলো তো, ফ্রেন্ড? মেয়েদের বেলায় এই সরকারই সবচেয়ে কঠোর, অথচ তারাই...তারওপর তোমাদের এই টিউনিকও আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ওগুলো ডেজার্ট ব্যাটেল টিউনিক।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের এটা স্পেশাল ইউনিট,' বলল বটে, তবে লোকটাকে যে বিশ্বাস করাতে পারেনি, তা-ও বুঝল। 'গাড়ির উইঙে ওই ইনসিগনিয়া, ওগুলো হচ্ছে...'

মাথা দুলিয়ে বাধা দিল সালামতউল্লাহ। 'বুঝেছি। কিন্তু, ফ্রেন্ড, আমার বাহুতেও ঈগলের টাট্টু আঁকা আছে। কিন্তু তাতে আমি আমেরিকান হয়ে যাইনি। এ ধরনের ট্রিক্ ইরানী ইনফিলট্রেটররাও ঘটাতে পারে।'

রেগে উঠল রানা। অন্যরাও কাজ থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটার কথার ধরণ যে বদলে গেছে, সবাই বুঝে ফেলেছে।

'মন্তব্যটা করে নিজেকে তুমি আস্ত এক আহাম্মক প্রমাণ করলে, সালামতউল্লাহ!' বলল রানা। 'একজন রেগুলার সৈনিককে এত ছোট করে দেখা উচিত হয়নি তোমার।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ধোঁকায় কাজ হয়েছে। বিশ্বাস করেছে সে। কিন্তু না, বসে থেকেই চোখের পলকে রানার বুকে কালাশনিকভের নল ঠেকিয়ে ধরল লোকটা। 'ওসব বুঝি না। এখন থেকে আমাদের সাথে থাকবে তোমরা, আমাদের হয়ে লড়াই করবে। নইলে গাড়ি আর মেয়েটার আশা বাদ দিতে হবে।'

আড়চোখে দেখল রানা, কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে

লোকটার তিন সঙ্গী। উঠে পড়েছে, এক পা-দু'পা করে সালামতউল্লাহর দিকে এগোচ্ছে। একই সাথে, 'ও কিছু নয়' গোছের ভাব করে ধীরেসুস্থে নিজেদের অস্ত্র নামাচ্ছে কাঁধ থেকে। হাসি জমাট বেঁধে আছে ঠোঁটে।

নিয়ম এক, ভাবল মাসুদ রানা, অস্ত্র ধরার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কখনও শত্রুর হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়াবে না। সালামতউল্লাহকে তা এবার শিখিয়ে দেয়া উচিত। বাঁ হাতের এক ধাক্কায় কালাশনিকভের নল সরিয়ে দিল ও, পরমুহূর্তে ডান হাত চালাল বিদ্যুৎগতিতে। দানবের নাক-মুখ সই করে মারল প্রচণ্ড ঘুসিটা। এক ডিগবাজি খেয়ে বোল্ডারের ওপাশে গিয়ে পড়ল সে, অন্তিম চাঁদের আলোয় একবার ঝিকিয়ে উঠে উড়ে গেল রাইফেল।

কিন্তু আশ্চর্য, এক মুহূর্ত পরই সবাইকে অবাক করে দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ল সালামতউল্লাহ, শীপস্কিন কোটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করল। এই সময় আলালউদ্দিনের হাতের পাম্প অ্যাকশন শটগান গর্জে উঠল সবার পিলে চমকে দিয়ে। সালামতউল্লাহর দুই সঙ্গী অস্ত্র তুলেছিল রানাকে সই করে, পেন্সিল স্কেচের ওপর জোরে ইরেজার ঘষলে যেমন মুহূর্তে তা মুছে যায়, ল্যান্ডস্কেপ থেকে ঠিক তেমনি মুছে গেল লোক দুটো। পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

ওদের পিঠ মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, এমন সময় মৃদু দুপ! দুপ! করে উঠল রানার ওয়ালথার পিপিকে। পিস্তল বের করে এনেছিল সালামত, তুলতে যাচ্ছিল, বুকে আর গলায় গুলি খেয়ে দুই দফায় তিন-চার হাত পিছিয়ে গেল। চোখ কপালে তুলে উল্টে পড়ে গেল ধপাস্ করে।

শেষ লোকটা কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর কালাশনিকভ ফেলে ঘুরেই দে দৌড়। তিন পা যাওয়ার

আগেই আবার গুলি করল আলালউদ্দিন। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত পায়ে টান খেয়ে আছড়ে পড়ল সে।

হঠাৎ করে গভীর নিস্তব্ধতা চেপে বসল পরিবেশে।

'পিছন থেকে ওকে মারার কি দরকার ছিল?' অনেকক্ষণ পর শেষ লোকটিকে দেখিয়ে বলল সাংবাদিক। 'ও তো পালিয়েই যাচ্ছিল।'

'সেই জন্যেই তো পিঠে গুলি করা হয়েছে,' সদরউদ্দিন বলল জবাবে। 'নইলে বুকে করা হত।'

আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যার জন্যে রানার দিকে ফিরল লোকটা। প্রশ্ন মুখে করল না, করল চোখ দিয়ে।

শ্রাগ করল ও। 'ওরা ফ্রেন্ডলি থাকলে এসবের দরকার পড়ত না। ওরাই আমাদের এ কাজে বাধ্য করেছে। আর পিছনে শত্রুকে জ্যান্ত রেখে যাওয়া আমাদের মিশনের জন্যে বিপজ্জনক হতে পারত। কাজেই...।'

আরও আধ ঘণ্টা পর গড়াতে শুরু করল দুই ল্যান্ড রোভার। দেরি পুষিয়ে নিতে এবং আলো ফোটার আগে নতুন আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে বলে ঝড়ের গতিতে ছোটাল ফয়েজ ও হেকমত। ভালই এগোল দল। রেঞ্জের এই অংশের মাটি অন্য সব জায়গার তুলনায় যথেষ্ট সমতল, কাজেই উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এল ওরা।

ভোরের প্রথম আলোর আভাস যখন ফুটল, রণক্ষেত্র ছেড়ে দক্ষিণে পঁয়তাল্লিশ মাইল সরে এসেছে ওরা। জালালাবাদ শহর বিশ মাইল ডানে রেখে ছুটছে। একেবারে বিরান এলাকা এটা, যতদূর চোখ যায় পাথুরে মাটি আর পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই। ফসলের মাঠ দূরের কথা, সবজি খেতও নেই। শুধু হালকা বাদামী রঙের মাটি।

রানার ধারণা এই একটি জায়গায় দিনের বেলা খালি চোখেই ওদের দেখতে পাবে যে কেউ। কারণ মাটি আর পাহাড়ের রঙের সাথে ওদের গাড়ির ক্যামোফ্লেজ রঙের বড় এক তফাত আছে। অল্প হলেও প্যান্থারে পিঙ্ক শেড আছে, ওই রঙের জন্যে খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যাবে ওগুলোকে।

হিন্দুকুশ রেঞ্জ ছেড়ে এসেছে ওরা, সামনে খাইবার পাস, এইজন্যে রঙের এই হেরফের। যাত্রাবিরতির সময় হয়েছে। দিনটা এখানে কোথাও কাটিয়ে কাল রাতের মধ্যে শর্টকাট পথে মারুফ পৌঁছতে হবে। কিন্তু হেকমত আলি আকারে যাই হোক, দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। থামার আগে আরও প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গুমাল নদীর উপত্যকায় থামল সে। ঘন বনের ভেতরে ঢুকে দিন কাটাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল টীম।

দৌলত ইয়ার পর্যন্ত পথে বেশ কয়েকটা রোডব্লকে দাঁড়াল বাস, সমস্ত যাত্রী নামিয়ে ভেতরের মালপত্র, গাট্টি-বোঁচকা, সব তন্ন তন্ন করে সার্চ করল পুলিস আর আর্মি। ব্যাপার কি প্রথমে বুঝতে না পেরে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিল সার্জেন্ট শহীদ, একটু ভয় ভয়ও লাগছিল।

পরে কারণ জানা গেল। সীমান্তের ওপারে ইরান সৈন্য জড়ো করেছে, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র, ট্যাঙ্ক-প্লেন ইত্যাদি সামরিক মহড়া দিচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালাতে পারে ওরা। ইরানী ফিফথ্ কলাম ঢুকে পড়েছে বলে গুজব রটেছে, স্যাবোটাজ ঘটাতে চেষ্টা করবে ওরা, তাই জনগণের জানমালের হেফাজতের জন্যে...ইত্যাদি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সার্জেন্ট। মাইমানা থেকে খুব ভোরে ছেড়েছে ওদের বাস। ওখানে রাত কাটানো নিয়ে বড় সমস্যায়

পড়ে গিয়েছিল। পরে সাহস করে এক বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। মুসাফির জেনে সাদরেই থাকতে দিয়েছে ওরা। শুধু কোত্থেকে এসেছে ওরা, কোথায় যাবে, এইটুকুই জানতে চেয়েছে, আর কোন বেয়াড়া প্রশ্ন করেনি।

কাছের এক গ্রামে ওদের বাড়ি, হামিদা গর্ভবতী, পেটের ব্যথায় অস্থির হয়ে স্বামীর সাথে শহরের হাসপাতালে ভর্তি হতে এসেছে, কিন্তু পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে বলে আজ ভর্তি হতে পারেনি, কাল হবে, এইসব বলে পার পেয়েছে। এরমধ্যে অবিশ্বাস করার কিছু নেই, এমনটা হতেই পারে। তাই এ নিয়ে কোন কথা তোলেনি ও বাড়ির কেউ। আগের রাতটাও এই কথা বলেই বেলচিরাগের কাছে এক গ্রামে রাত কাটিয়েছে ওরা।

পর পর দু'রাত স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে, একই বিছানায় ঘুমিয়েছে দু'জনে, অথচ ওর মত এত সুন্দরী যুবতী নাগালের মধ্যে থাকতেও সার্জেন্ট হাত বাড়ায়নি, ভাবতে বেশ আশ্চর্যই লাগছে হামিদার। মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা যেমন জমেছে তার মনে, তেমনি ভক্তিও।

একটু পর বাস ছাড়ল। কুশক হয়ে হিরাত যাবে ওটা, ওখান থেকে দৌলতাবাদ হয়ে কান্দাহার যাবে শহীদ ও হামিদা। পথে অন্য কোন সমস্যা যদি না ঘটে, আশা করা যায় দু'দিন পর...

বন্ধ চোখের পাতা কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। একটা ছায়া পড়েছে। আগেও কয়েকবার পড়েছে। ওটা হেকমত আলি। লোকটা কেন যেন ঘুরঘুর করছে ওর সামনে দিয়ে। মনে হয় কিছু বলতে চায়, অথচ বলছে না। রানা চোখ মেললেই অপ্রস্তুত হয়ে সরে পড়ে। এবার সে সুযোগ দিল না ও, ডেকে বসল, 'হেকমত আলি!'

'জ্বি?'

'কিছু বলবে?'

'জ্বি, মাসুদ ভাই। মানে, ইয়ে...বস্!'

'বলে ফেলো, কি?'

দ্বিধার সাথে ওর দিকে দু'পা এগোল মানুষটা, আড়চোখে দলের অন্যদের দেখে নিল। তিন ভাগ হয়ে বসে আছে সবাই, গল্প করছে, নয়তো ঝিমাচ্ছে। এক দলে আছে থান্ডারবোল্টের চারজন, অন্য দলে সাংবাদিক যুগল। এদিকে রানা একা। গাছের ছায়ায় একটু দূরে দূরে বসে আছে ওরা। বাকি দুই কমান্ডো ওয়াচের দায়িত্বে আছে।

'না, মানে, আজ রাতের ট্রান্সমিশনের ব্যাপারে বলছিলাম,' নিচু গলায় বলল ট্রুপার। 'ওর সাথে যদি আমার...'

'তোমার কি?'

চেহারায় কিছুটা লালের আভাস ফুটল তার। 'মানে...ওর সাথে একটা ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠানো যায় কি না, তাই ভাবছিলাম।'

গাছের সাথে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে ছিল রানা, উঠে বসল। কপাল কুঁচকে আছে। 'কি সেটা?'

চোখ-কান বুজে হড়বড় করে বলে গেল হেকমত আলি, তারপর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল আড়ষ্ট হয়ে। চেহারা দেখে ভয় হলো এই বুঝি দাবড়ি লাগিয়ে বসল লোকটা। কিন্তু না, তেমন কিছুই করল না রানা। বরং হাসল মিটিমিটি।

'আশ্চর্য! তোমার গিন্নির বাচ্চা হবে, এমন একটা সুখবর এত দেরিতে দিচ্ছ! কালকেই বলতে পারতে!'

বোকা হয়ে গেল ট্রুপার, আর যাই হোক, এই প্রতিক্রিয়া আশা

করেনি সে মাসুদ রানার কাছ থেকে। ধমক না হোক, অন্তত ওর আবেদন যে মেজর কানে তুলবে না, সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। অথচ ঘটল কি না উল্টো!

'না, বস্, মানে...'

'ঠিক আছে, আর মানে মানে করতে হবে না।'

বুদ্ধিটা সার্জেন্ট শহীদের মাথায় হঠাৎ করেই গজাল। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বেশ কিছু সময় ভাবল সে ওটা নিয়ে, তারপর সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল–চলবে। সুযোগ মত হামিদাকে খুলে বলল সব। হাঁ হয়ে গেল মেয়েটা। 'কি বলছেন?' চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'এ ছাড়া তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছার কোন উপায় দেখছি না, হামিদা। কাজটা করতেই হবে যেভাবে হোক।'

'কিন্তু তাই বলে ভলান্টিয়ার ব্যাটল পার্টি! ইরানের সঙ্গে লড়াই করার কথা বলে দল তৈরি করবেন! পাগল হয়েছেন আপনি?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল সার্জেন্টের নকল দাড়ি ভর্তি মুখে। 'না, হইনি। হওয়ার কোন কারণও নেই,' ইঙ্গিতে ওর ফোলা তলপেট দেখাল। 'আমার ব্যাগে এ দেশী ব্যাটল ড্রেস আছে, দুটো ইনগ্রাম আছে। একটু আড়াল পেলেই তৈরি হয়ে নিতে পারব আমি, তারপর মানুষ জড়ো করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।'

'কিন্তু ওরা প্রশ্ন করবে, আমাদের পরিচয় জেনে যাবে। তখন?'

'কিছুই করবে না ওরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'আপনি শুধু আমার নির্দেশ মেনে চলবেন, বাকি সব আমি ম্যানেজ করব।'

রাজ্যের অবিশ্বাস ভরা চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হামিদা, মাথা নাড়ছে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ও

যা বলছে তা সত্যি, নাকি ঠাট্টা।

'সময়মত ওখানে পৌঁছতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই আমাদের, হামিদা। রোডব্লকে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শেষে কুলিয়ে ওঠা যাবে না।'

ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে শহীদ, প্ল্যান সফল হলে সোজা নওযাদ চলে যাবে। ওখান থেকে কান্দাহার, তারপর রেজিস্তানের মরুভূমি পাড়ি দিয়ে লান্ডি মোহাম্মদ আমিন খান হয়ে সোজা পাকিস্তানের চাগাল পর্বতমালায়। পরের রোডব্লকে সার্জেন্টের হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকল। তার পরিকল্পনা যে সফল হতে চলেছে, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না। হামিদাও টের পেল তা।

রাস্তার পাশের বড় এক মাঠে সমাবেশ চলছে ওখানে। লাউডস্পীকারে কেউ একজন চ্যাঁচাচ্ছে, 'ঈমানদার মুসলমান জাগো! সাচ্চা মুসলমান জাগো! অত্যাচারী ইরানী শিয়া গোষ্ঠীর আগ্রাসী হাত গুঁড়িয়ে দাও। ওরা শয়তান, ইসলামের নামে ধোঁকাবাজি করে। ওদের ছেড়ে দেয়া যায় না। কোন সাচ্চা মুসলমান ওদের এই অন্যায় মেনে নিতে পারে না!'

মুখ টিপে হাসল শহীদ। 'কেমন বুঝছেন?'

হামিদা জবাব দিল না, তবে চাদরের নিচে ওর চোখ যে হাসছে, তা বোঝা গেল।

'শয়তানের দল সাচ্চা আফগানদের উত্থান ভাল চোখে দেখছে না, তাই এ দেশের ওপর আগ্রাসনের পাঁয়তারা করছে। এ সময় দেশপ্রেমিক নাগরিকদের ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। সবাই জাগো, এক হও। সব গাড়ি, বাস-লরি যা আছে জড়ো করো, যার যা অস্ত্র আছে, তাই নিয়ে উঠে পড়ো। ফ্রন্টে চলো! শয়তানের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে! ওয়াতানকে রক্ষা করতে হবে!'

জনতার আকাশ ফাটানো চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল ওদের।

'চলে এসো! সক্ষম সবাই উঠে পড়ো, তোমরা সবাই এখন দেশরক্ষা বাহিনীর সদস্য!' নীল ব্যাটল ড্রেস পরা এক দীর্ঘদেহী আফগান সার্জেন্ট চ্যাঁচাচ্ছে। কাঁধে ইনগ্রাম। তার সঙ্গে এক মেয়ে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাও আছে।

জাম পাহাড়ের হতচ্ছাড়া এক গ্রামের বাজার। চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক লরির ওপর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে লোকটা। ফলের চালান পৌঁছে দিতে এসেছিল ওটা, সরকারের নামে, দেশের নামে মুখে মুখে 'রিকুইজিশন' করে ফেলেছে সার্জেন্ট।

তার হাঁকডাকে এরমধ্যেই ছোটখাট ভিড় জমে গেছে, জনতা অবাক চোখে তাকে দেখছে। কেউ জানে না কোত্থেকে এসেছে ওরা দু'জন। চায়ের দোকান মালিক বা লরি চালক, তারাও না। গাড়ি বেহাত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে টেইলবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চালক, সার্জেন্টের নকল দাড়ির নাচন দেখছে অসহায়ের মত।

'সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াও!' হাঁক ছাড়ল সে। 'কেউ ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করবে না। আর্মিতে ডিসিপ্লিন মেনে চলা একান্ত জরুরী।'

দেখতে দেখতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন যুবক-মাঝবয়সী লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজনকে 'আনফিট' বলে বাতিল করে দিল সার্জেন্ট। ঘোষণা দিল যদি মা-বোনেরা কেউ লড়তে চায়, দলে নাম লেখাতে পারে। এল না কেউ, বরং 'ফিট'দের মা-বোনেরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল দূরে দাঁড়িয়ে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশজন বাছাই করা যোদ্ধা হুড়োহুড়ি করে

বেঁধে আনা গাট্টি আর বন্দুকসহ উঠে পড়ল লরির পিছনে। টেইলবোর্ড লাগিয়ে দেয়া হলো। সঙ্গিনীসহ ক্যাবে উঠে স্টার্ট দিল সার্জেন্ট, একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল ওটা অজ্ঞাত 'রিক্রুটিং সেন্টারের' উদ্দেশে।

অজ্ঞাত, কারণ ওটা যে কোথায়, কেউই তা লোকটাকে জিজ্ঞেস করেনি। আসলে তার ভাবভঙ্গি আর কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ দেখে সে সাহসই কারও হয়নি।

রাত এগারোটায় শুরু হলো থান্ডারবোল্টের যাত্রা। গতরাতের দেরি পুষিয়ে নিতে হবে আজ। মরিয়া হয়ে ছুটতে হবে, নইলে দ্বিতীয় এস্কেপ প্ল্যানও বরবাদ হয়ে যাবে।

পাহাড়-মরুভূমি পেরিয়ে তুমুল গতিতে ছুটে চলেছে দুই পিঙ্ক প্যান্থার, দু'পাশের ল্যান্ডস্কেপও একই গতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়া, তাতে বরং রানার টেনশন আরও বাড়ল। প্রতিটা নার্ভ ছিলার মত টান্‌টান্ হয়ে থাকল ওর। অন্যদেরও একই অবস্থা।

হাইওয়ে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছে ওরা। শুধু এড়িয়ে নয়, যত দূর দিয়ে সম্ভব ওগুলোকে পাশ কাটানো যায়, সেই চেষ্টা করছে। কারণ হাইওয়ে সব ব্যস্ত আজ, যেখানে যত আর্মি ইউনিট আছে, সবখান থেকে কিছু কিছু করে ইরান বর্ডারের দিকে যাচ্ছে। প্রচুর ট্রাক-লরি চোখে পড়েছে ওদের।

কিন্তু এত সতর্কতার পরও বিপরীতমুখী এক আর্মি বোঝাই ট্রাকের সামনে পড়ে গেল প্যান্থার টু। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। একেবারেই যে ছিল না তা নয়, ছিল, তবে তাতে পুরো দশ মিনিট নষ্ট হয়, ওরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাই ঝুঁকি নিয়ে ওটার মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা।

ট্রাক অতিক্রম করার সময় হর্ন বাজিয়ে, হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল। ট্রুপাররাও মাথার ওপর অস্ত্র দুলিয়ে নাচল খানিক।

দু'বার বিচ্ছিন্ন দুই পেট্রল পাম্পে থামল ওরা বাড়তি জ্বালানি স্টক করার জন্যে, কিন্তু কাজ হলো না। বন্ধ ওগুলো, নোটিস ঝুলছে, 'তেল নেই'। হতাশ হলো না রানা, তেল সঙ্গে যা আছে, তাতে এখনও বহুদূর যাওয়া যাবে।

ভোর পর্যন্ত একটানা ছুটে পাকিস্তানের ফোর্ট স্যান্ডেলম্যান বরাবর এপারের ছোট শহর মারুফের কাছে থামল ওরা। শহরের দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের হাই গ্রাউন্ডে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে তেলের মজুত তলানিতে ঠেকেছে প্রায়।

বিনকিউলারে ভোরের হালকা কুয়াশার মধ্যে শহরটার ওপর নজর বোলাল রানা। বোঝা গেল মারুফ ন্যাশনাল গ্রিডের অধীনে। এয়ারপোর্ট আছে, ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনও আছে দুটো। তার মানে তেলের ডিপোও থাকা উচিত। কিন্তু খুঁজে পেল না ও, হয়তো কোন উঁচু বিল্ডিঙের আড়ালে আছে বলে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

পাশে দাঁড়ানো সদরউদ্দিনের দিকে ফিরল ও। 'পেট্রল দরকার আমাদের, করপোরাল। ওখানে মজুদ আছে। আজ তুমি সারাদিন নজর রাখবে শহরের ওপর, প্রয়োজন মনে করলে দুই-একজনকে শহরে পাঠাতেও পারো। ওরা কাছে থেকে পরিস্থিতি দেখে আসবে। অয়েল ট্রান্সপোর্ট মুভমেন্টের ডিটেইলড রিপোর্ট চাই আমি। তুমি মুভমেন্ট নোট করবে। রাতে ফুয়েল না হলে চলবে না আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'কিন্তু, বস্, আজ যেভাবে বাধাহীন আসতে পেরেছি, তাতে মনে হয় ওরা আমাদের হারিয়ে ফেলেছে। শহরে গেলে কেউ যদি চিনে ফেলে, নতুন করে ফ্যাসাদে পড়ে

যাব না?'

'এ দেশ ছেড়ে যতক্ষণ বের হতে না পারছি, ফ্যাসাদ ততক্ষণ আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকবে,' শান্ত গলায় বলল ও। 'আর এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ও নেই। নাকি আছে?'

শ্রাগ করল সদরউদ্দিন। 'না, বস্।'

সকাল দশটায় প্রথম রিপোর্ট করল করপোরাল। এ পর্যন্ত মোট পাঁচটা অয়েল ট্যাঙ্কার পশ্চিমে যেতে দেখেছে সে, গড়ে ঘণ্টায় একটা করে। খুব সম্ভব কান্দাহারের দিকে যাচ্ছে। আফগান থার্ড আর্মি করপসের হেডকোয়ার্টার্স ওখানে, নিশ্চয়ই ওদের প্রয়োজনে। ফ্রন্টিয়ারের দিকে মুভ করছে ওরা। তবে মুশকিল যে শুধু ট্যাঙ্কারই যাচ্ছে না, সাথে এসকর্টও।

রাস্তা থেকে ওর একটাকে ছিনতাই করার প্ল্যান শুরুই করে দিয়েছিল মাসুদ রানা, এসকর্টের কথা শুনে ক্ষ্যান্ত দিয়ে অন্য লাইনে মাথা খাটাতে লাগল।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি!' বলে উঠল হেকমত আলি। 'মনে হয় কাজ হবে।'

'কি বুদ্ধি?' প্রশ্ন করল সদরউদ্দিন।

প্রত্যেকের নজর ওর ওপর সেঁটে আছে দেখে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেল সে, আমতা আমতা করতে লাগল। 'না, মানে...'

'আহা, বলোই না।'

রানাও উৎসাহ দিল মাথা ঝাঁকিয়ে। 'বলো।'

'মানে, আমরা তো ইনফ্রা-রেড হেডলাইটে চলছি, বালবের দরকার হচ্ছে না। তাই ভাবছি ওর কয়েকটা খুলে কোন পথের মোড়ে ব্যাটারি দিয়ে জ্বালাবার ব্যবস্থা করব কি না।'

'কি করতে চাইছ?' চোখ কুঁচকে বলল ও।

খুলে জানাল হেকমত আলি ; সবার পছন্দ হলো তার প্ল্যান, অনুমোদনের জন্যে রানার দিকে ঘুরে গেল সব ক'টা মাথা।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মাথা দোলাল ও। 'ঠিক আছে।'

রাত সাড়ে দশটা। মারুফ-জালালাবাদ হাইওয়ে।

ট্যাঙ্কার ড্রাইভার জানতেও পারল না বাঁক ঘুরতেই তার পিছনের দুই চাকায় গুলি করা হয়েছে। গুলির আওয়াজ হয়নি, কারণ সাইলেন্সার পরানো ছিল অস্ত্রে। ট্যাঙ্কারের গতি পড়ে আসছে দেখে বিস্মিত হলো কেবল লোকটা। পিছনের চারটে হেভিডিউটি টায়ারই গেছে, মনে হচ্ছে খামোকাই ঘুরছে রিয়ার অ্যাক্সেল।

তার এটাও জানা হলো না যে তাকে অনুসরণরত এসকর্ট লরিও পড়েছে আরেক যন্ত্রণায়। ট্যাঙ্কারের গজ ত্রিশেক পিছনে ছিল ওটা, ঢিপির মত বড় এক বোল্ডারের পাশ ঘেঁষে বাঁক নিতেই ব্যাপারটা ঘটল। এক্কেবারে থুতনি বরাবর সামনে, মাত্র কয়েক গজ দূরে আচমকা একজোড়া শক্তিশালী হেডলাইট জ্বলে উঠতে দেখে সশব্দে আঁতকে উঠেই সজোরে ব্রেক কষল লরির ড্রাইভার। আত্মা উড়ে গেছে।

ওটা যাই হোক, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর যে কোন উপায়ই নেই, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল সে। তবু শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না, দাঁতমুখ খিঁচে বন্-বন্ করে হুইল ঘোরাল ডানদিকে, রাস্তা ছেড়ে মরুভূমিতে নেমে পড়ল। বিনা নোটিসে ঘুরে যাওয়া ড্রাইভারের বাঁ দিকে বসা দুই সশস্ত্র এসকর্টের বাইরেরজনের মাথা দরজার ফ্রেমে বাড়ি খেল দড়াম করে। মুহূর্তে মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে গেল।

পরক্ষণে উঁচু রাস্তা থেকে মরুভূমিতে ল্যান্ড করল সামনের দুই

চাকা, ভয়াবহ আওয়াজ উঠল সংঘর্ষের। এই চোটটা গেল মাঝখানের এসকর্টের ওপর দিয়ে। সঙ্কীর্ণ ক্যাবে দু'পাশের চাপে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল সে, প্রথমবার তাই হেলে পড়ার হাত থেকে বাধার কারণে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু এবার পেল না। লরি আছাড় খাওয়ামাত্র তার মাথাও ভীষণভাবে ঠুকে গেল স্টিয়ারিং হুইলের সাথে। সামান্য 'আঁ!', 'ওঁ!' করার সময়ও পেল না সে, জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে ক্যাবের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

ধাক্কা সামলে ওঠার সময় পেল না ড্রাইভার, হেডলাইটের আলোয় তিন-চারজন দেশী সৈনিক সাব-মেশিনগান তাক্ করে ছুটে আসছে দেখে অবাক হয়ে ভাবল, কি হচ্ছে এসব? একজন ঝট্‌কা মেরে খুলে ফেলল ক্যাবডোর। অনেক চেষ্টা করল ড্রাইভার যে ওদের বলে, ভুল করছেন আপনারা। আমি আপনাদেরই একজন। কিন্তু লোকগুলোর চেহারা দেখে মুখ খুলতে সাহস হলো না। মাথার পাশে বাড়ি খেয়ে ঢলে পড়ল সে।

একই ব্যাপার ঘটল ট্যাঙ্কার ড্রাইভার ও তার সহকারীর বেলায়।

আধঘণ্টা পর, দুই পিঙ্ক প্যান্থারের ট্যাঙ্ক আর এক্সট্রা জেরি ক্যান ভর্তি পেট্রল নিয়ে নিজেদের পথে ছুটল থান্ডারবোল্ট টীম।

বাঘলান। এক ঘণ্টা আগের কথা।

ভেতরে ভেতরে আবার কোন্ খেলা শুরু হয়েছে বুঝতে পারছে না জালাল আহমেদ। গার্ডরা হঠাৎ ওর ওপর এত সদয় হলো কেন ভেবে পাচ্ছে না।

চেয়ারের পায়া ভাঙার পর ওটা ব্যবহারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু হারামজাদা গার্ড সেদিন আসেইনি ভেতরে। তার পেট ব্যথার অভিনয়, অসুস্থতার ভান ইত্যাদি দেখেও না

দেখার ভান করেছে। এতদিন ভেতরে এসে খাবার রেখে যেত শালারা, সেদিন তাও করেনি। দরজার নিচে ছোট এক ফাঁক আছে, সেখান দিয়ে ঠেলে দিয়েছে ভেতরে।

কাল দুপুর পর্যন্ত একই আচরণ করেছে ব্যাটারা, তারপর কেন কে জানে, বিকেলে ভোল একেবারেই পাল্টে ফেলল। খাবার ভেতরে এসে তো দিয়েইছে, দু'তিন ঘণ্টা পর পর চা-ও দিয়ে গেছে। অবশ্য একটু সমস্যা হয়েছিল। চেয়ারের একটা পা যে ভাঙা, তা আবিষ্কার করে হাসি মুছে গিয়েছিল গার্ডের মুখ থেকে। অবশ্য তা নিয়ে কিছু বলেনি সে, আরেক গার্ডকে ডেকে এনে ভাঙা পায়া খুঁজে বের করে নিয়ে গেছে। চেয়ারটাও।

রাতে কর্নেল মুরাদ এসেছিল, জালাল জানে, তার গলা শুনেছে সে। অথচ তার সেলে আসেনি লোকটা। ওপরতলায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে খাতির আরও বেড়ে গেছে তার। কেন? শেষ খাওয়া খাইয়ে নিচ্ছে? তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে?

কিন্তু সে-ও এত সহজে হাল ছাড়ার বান্দা নয়। দুপুরে সন্দেহটা মনে জাগার পর অনেক ভেবে আরেক ফন্দি এঁটেছে জালাল, এখন সেটা কার্যকর করতে যাচ্ছে। অন্ধকার সেল থেকে হাঁক ছাড়ল সে, 'গার্ড! গার্ড!'

ওপাশ থেকে ঘুম জড়ানো জবাব এল, 'কি হয়েছে?'

'তোমাদের ইন-চার্জ কে আছে, তাকে একবার আসতে বলো।'

'কেন?'

'আমি আমার অপরাধ কবুল করে জবানবন্দি দেব।'

'কি!'

'হ্যাঁ, সত্যি। জলদি ডাকো তাকে। নয়তো কর্নেল মুরাদ বা

মন্ত্রী বরকতী, যাকে হোক খবর দাও।'

'কিন্তু...'

'কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট কোরো না!' ধমকে উঠল জালাল। 'রেইডার পার্টি এখন কোন এলাকায় আছে আমি জানি। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো ওদের ধরতে পারবে তোমরা। এখনও সময় আছে।'

বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, সাড়া নেই গার্ডের। তাই দেখে অস্থির হয়ে উঠল সে। 'কি হলো! তাড়াতাড়ি করো!'

'কিন্তু...তেমন কেউ তো নেই এখানে। আমরা কয়েকজন মাত্র গার্ড...' মাঝপথে থেমে পড়ল সে।

হতাশ হলো যেন জালাল। 'দূর! তাহলে?' একটু বিরতি। 'তাহলে...তুমিই এসো বরং, শুনে যাও। তাড়াতাড়ি...'

'আমি!' শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। 'আপনি পাগল হয়েছেন? আমি শুনে কি করব?'

'বোকার মত কথা বোলো না!' জরুরী গলায় বলল জালাল। 'সব জেনে যদি টেলিফোনেও অন্তত খবরটা কর্নেলকে বা আর কাউকে জানাতে পারো, যদি ধরা পড়ে ওরা, তোমার ইজ্জত কত বাড়বে ভাবতে পারো? তার ওপর প্রমোশন, আরও কত কিছু...!'

'কিন্তু...আপনিই বা এমন অসময় কেন ব্যস্ত হলেন জবানবন্দি দিতে?' দ্বিধা কাটছে না লোকটার। 'এতদিন ধরে কতরকম...'

এবার মোক্ষম অস্ত্র ঝাড়ল জালাল। রাগ-বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, 'আমি তোমাদের এতবড় এক সহযোগিতা করতে চাচ্ছি, অথচ তুমি অবহেলা করে অনর্থক সময় নষ্ট করছ। এই সুযোগে ওরা যদি পালিয়ে যায়, কর্নেলকে বা মন্ত্রী বরকতীকে জানাতে বাধ্য হব আমি। তখন যেন আমাকে দোষ দিয়ো না।'

লোভ, সন্দেহ, ভয় আর দ্বিধা; এতকিছুর চক্করে পড়ে দোল

খেতে লাগল গার্ড। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম রিপুর কাছে আর সব হার মানতে বাধ্য হলো। সিদ্ধান্ত পাকা করার আগে প্রশ্ন করল সে, 'কিন্তু আপনার কি লাভ হবে তাতে?'

'আমি মুক্তি চাই। এই জন্যেই...'

'তার নিশ্চয়তা কি? যদি তারপরও ফায়ারিং...'

'নিশ্চয়তার দরকারটাই বা কি? তোমার সরকার যা জানতে চায়, তা জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেয়া হবে আমাকে, কেন শুধু শুধু মারবে? এতে অবশ্য নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করা হবে। কিন্তু প্রাণ চলে গেলে ঈমান দিয়েই বা কোন্ ঘণ্টা করব আমি?'

সামান্য বিরতি। 'ঠিক আছে, আমি আসছি। কিন্তু খবরদার, অন্য কোন মতলব করে থাকলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে রাখছি।'

'সন্দেহ থাকলে তোমার সঙ্গীদের কাউকে ডেকে নিয়ে এসো না হয়,' জালাল বলল। 'তোমরা দু'জন মিলে...' স্নটে চাবি ঢোকার শব্দে থেমে গেল। বুকের মধ্যে লাফ দিল এক ঝলক গরম রক্ত।

সঙ্গীদের ডাকার কথা ভুলেও মনে ঠাঁই দিল না গার্ড। এ জন্যে বলা যায় না নগদ পুরস্কারও কিছু জুটতে পারে, তাতে কাউকেই ভাগ বসাতে দিতে রাজি নয় লোকটা। টাকা না হোক, ইজ্জত তো বাড়বে তার। ওখানেও থাবা বসাতে দেবে না সে ওদের।

'আমি আসছি,' বলল লোকটা। 'দু'হাত কোলের ওপর রেখে চুপ করে বসে থাকুন কটে।'

'তাই তো আছি।' মনে মনে বলল, আয়, কুত্তার বাচ্চা!

ভারী স্টীলের দরজা খানিকটা ফাঁকা হলো, পরক্ষণে বিস্মিত গলায় বলে উঠল গার্ড, 'এ কি! সেল অন্ধকার কেন?' বলতে

বলতে দ্রুত টর্চলাইট জ্বালল। চেপে রাখা দম ছাড়ল বন্দীকে ভদ্রলোকের মত কটে বসা দেখে। 'আলো নেভানো কেন?'

গলা টান করে করিডরের আলো দেখল জালাল। যেন কিছু জানে না, এমনভাবে বলল, 'আরে! বাইরে দেখছি লাইট জ্বলছে! আমি তো ভেবেছি বুঝি ইলেক্ট্রিসিটি ফেল করেছে আবার। তাহলে নিশ্চয়ই বালব্ গেছে। যাক্‌গে, এসো। দেরি করা ঠিক হবে না।'

এক হাতে কারবাইন, অন্য হাতে আলো, দুটোই ওর দিকে ধরে এক পা এগোল সে ভয়ের কিছু নেই দেখে। পরক্ষণে নাক কুঁচকে উঠল। 'কি ব্যাপার, কিসের গন্ধ? পেশাব...!'

ব্যাটার আলো নিচের দিকে নামছে না দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল জালাল। সেলের আরেক মাথা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'দুঃখিত, পায়ে লেগে পড়ে গেছে পট। অন্ধকারে দেখতে পাইনি।' আর এক পা আয়, হারামজাদা!

এগোল লোকটা, পরমুহূর্তে কিসের থেকে যে কি ঘটে গেল, টের পাওয়ার আগেই ওলট-পালট হয়ে গেল সব। দুপুরে কটের দুটো স্প্রিঙ কয়েল ছিঁড়ে বের করে টেনে লম্বা করে রেখেছিল জালাল। পরে বালব্ খুলে দুটোরই এক মাথা করে জুড়ে রাখে সকেটের সাথে। একটার অন্য মাথা ছিল দরজার সামনেই ফেলে-রাখা সারাদিনের পেশাবের পুকুরে, দ্বিতীয়টার অন্য মাথা বাঁধা ছিল তার লোহার কটের পায়ায়। নজর ওর ওপর রেখে এগোতে গিয়ে দুটোই মাড়িয়ে দিয়েছে গার্ড, সঙ্গে সঙ্গে স্পার্ক করেছে লাইন।

তীব্র নীল আলোর ঝলকানি আর ২২০ ভোল্ট বিদ্যুতের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। ঠিক তখনই বাঘের মত লাফ দিল জালাল। মাথা পেঁচিয়ে ধরে এক ঝট্‌কায় ঘাড় ভেঙে দিল তার।

দশ মিনিট পর গেটের ঘুমন্ত গার্ডকে পরপারে পাঠিয়ে দিল ও, তারপর আঙিনার পিছনের ব্যারাকের গার্ডরা ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাঁচ

উন্মত্তের মত গাড়ি চালাচ্ছে হেকমত আলি।

এবং পাশে বসা করপোরাল সদরউদ্দিন রীতিমত উপভোগ করছে তা। একটুও ভয় করছে না। অথচ করার কথা, কারণ সে অন্ধের মত বসে আছে। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দেখার দরকারও নেই, এর মধ্যে হেকমতকে চেনা হয়ে গেছে তার। গাড়ি চালানো কাকে বলে, লোকটা তা ভালই জানে।

সদরউদ্দিনের নিশ্চিত ধারণা, একে যদি ওয়ার্ল্ড কাপ রেসে অংশ নিতে দেয়া হয়, নির্ঘাত হাতিয়ে নেবে কাপটা।

আহত জাফর আহমেদ অবশ্য খেপে ব্যোম হয়ে আছে ট্রুপারের ওপর। ঝাঁকিতে ব্যথা লাগছে তার। কষ্ট হচ্ছে। কয়েকবার লোকটাকে বলেও কাজ হচ্ছে না দেখে রেগে উঠেছিল সে, খেঁকিয়েছিল। পাল্টা দাঁত খিঁচানি মেরে ওকে থামিয়ে দিয়েছে হেকমত আলি। তার দেশে ফেরার তাড়া আছে।

ঢাকা থেকে আজ ব্যক্তিগত বার্তা এসেছে ওর নামে। বার্তাটা এরকম: তোমাদের প্রথম সন্তান ছেলে হয়েছে। সময়মতই জন্মেছে সে। ওজন ৭ পাউন্ড ৬ আউন্স। ছেলে তোমাকে

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে। স্ত্রী জিনাত বলেছে, ফেরার আগে কোলিগদের কাছ থেকে শিশু পালন সম্পর্কে ইন্টেনসিভ ট্রেনিং নিয়ে রাখতে। ফেরার পর কাজে লাগবে।

জিনাতের সমস্যা ছিল, প্রসবে জটিলতা দেখা দেয়ার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় মিটে গেছে সব। তার ওপর ছেলের বাপ হয়েছে হেকমত আলি, অতএব তাকে আর পায় কে! তাছাড়া গন্তব্য ক্রমে এগিয়ে আসছে, এদিকে শত্রুরও দেখা নেই, কাজেই ছুটবে নাই বা কেন? ড্রাইভিঙের ফাঁকে বেসুরো শিসও বাজাচ্ছে লোকটা

দিগন্ত বিস্তৃত এক মাউন্টিন বেসিন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে অতিক্রম করছে এখন দুই প্যান্থার। এখানে সারফেস মৃদু ঢেউয়ের মত, তবে মসৃণ। ঢেউগুলো অনেকটা জায়গা নিয়ে, উত্থান বা পতন প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে অবশ্য অগভীর, শুকনো ওয়াদি পার হওয়ার জন্যে গতি কমাতে হচ্ছে, তবে গড়পরতা ত্রিশেই রাখার চেষ্টা করছে দুই চালক।

আজ যেন প্রকৃতিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ, ক্রুদ্ধ ড্রাগনের মত মোচড় খাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝেমধ্যে, ঝিকিয়ে উঠছে চারদিক–পাহাড় চুড়ো, মরুভূমি। বাতাসে ডালপালা দুলিয়ে ওদের বিদায় জানাচ্ছে গাছগাছালি। যদি ঝড় শুরু হয়, অথবা বৃষ্টি নামে, শত্রুকে ফাঁকি দেয়া আরও সহজ হয়ে যাবে থান্ডারবোল্ট টীমের।

আরও পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে এসে পশ্চিমদিকে ঘুরে গেল দুই ল্যান্ড রোভার, এক মাউন্টিন রিজের পাশ কাটিয়ে ধুলোমোড়া সমতল প্রান্তরে উঠে শুরু করল আরেক দীর্ঘ দৌড়। আরও ত্রিশ মাইল যেতে পারলে পড়বে রেজিস্তান মরুভূমি, তারপর লান্ডি মোহাম্মদ আমিন খান হয়ে চাগাল পৌঁছতে পারলেই হলো। আর

কিছু করার থাকবে না আফগানদের।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। প্রায় একটা। পেট্রল ছিনতাইয়ের পর পুরো দুই ঘণ্টা হয়ে গেল একটানা চলছে ওরা। এরমধ্যে ষাট মাইল পেরিয়ে এসেছে, এই গতি বজায় রাখা সম্ভব হলে দুটোর মধ্যে রেজিস্তান পাসে পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।

মরুভূমির যে অংশ সবচেয়ে কম চওড়া, সেখান দিয়ে পাড়ি ধরবে, তাতে অনেকটা সময় বাঁচবে। তবু রেজিস্তান হয়ে লান্ডি মোহাম্মদ আমিন খানকে পাশ কাটিয়ে চাগাল পৌঁছতে কম করেও দু'ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ আলো ফোটার বাকি থাকবে আর এক ঘণ্টার মত। ওই সময়টাই হবে থান্ডারবোল্টের সবচেয়ে কঠিন সময়, ওর মন তাই বলছে।

ওই এক ঘণ্টাই চলতে হবে ফ্রন্টিয়ারের পাহাড়ী ফার্মল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে। পাক বর্ডারের যেখান দিয়ে ক্রস করবে ওরা, সেখানে পৌঁছার পথ ওই একটাই। অপ্রশস্ত স্ট্রিপ। প্রচুর খামার এবং ছোট ছোট গ্রাম আছে দু'পাশে। পথে যদি কিছু না-ও ঘটে, রানা প্রায় নিশ্চিত জানে ওখানে ঘটবে। ঘটতেই হবে। কারণ ওটাই কর্নেল মুরাদের নতুন ফাঁদ পাতার একেবারে আদর্শ জায়গা।

জানে, অথচ ওই জায়গা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই আগেই এ ব্যাপারে সদরউদ্দিনের সাথে আলোচনা সেরে রেখেছে ও। সাহসিকতা, পাল্টা হামলা এবং গতি, এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে ওই ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে দলকে।

পেট্রলের জন্যে কম করেও এক ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে ওদের, নইলে রানার ধারণা, এতক্ষণে আরও অন্তত ত্রিশ মাইল এগিয়ে থাকতে পারত। হয়তো এখন আমিন খানের কাছাকাছি থাকত দল।

ক্যাপ্টেন কামালের কথা ভাবল রানা। কোথায় আছে এখন

আলমগীর? উপকূলের কত মাইল দূরে? বাতাস ভেজা ভেজা লাগছে টের পেয়ে মুখ তুলে আকাশ দেখল। মেঘ আরও গাঢ়, আরও কালো হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। পিছনে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হয়তো শুরুই হয়ে গেছে ওদিকে কোথাও।

চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব এক এক করে মনে পড়ছে ওর। খারাপ লাগছে সার্জেন্ট শহীদুল্লাহর কথা ভেবে। অন্তত ওর মত একজনকে হারাতে হবে, ভুলেও কখনও কল্পনা করেনি রানা। ওরকম সর্বগুণে গুণী কমান্ডোকে হারিয়ে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল বিসিআইয়ের। সে ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে কি না, হলে কবে, কত যুগ পরে, কে জানে?

তার সাথে আছে জালাল আহমেদ। ওই ছেলেও কোন অংশে কম ছিল না। হামিদার কথা ভাবল ও। ভারি মিষ্টি চেহারার মেয়ে ছিল, চোখ দুটো কি আশ্চর্য মায়াভরা। দু'জনকে পাশাপাশি ভালই লাগছিল দেখতে, চমৎকার মানিয়েছিল। কি ঘটেছে ওদের ভাগ্যে? আসেনি কেন? ধরা পড়েছে? নাকি...

গাড়ির জোর ঝাঁকিতে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল, নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল রানা। সামনে মন দিল।

বাঘলান। রাত তিনটা।

ভিলার নিজের অফিসে চুপ করে বসে আছে কর্নেল নাজাফ মুরাদ। কপাল কুঁচকে আছে, চেহারায় ক্লান্তি আর বিরক্তি। ভেতরে ঢোকার সময় একটা লাশ ডিঙিয়ে এসেছে সে, ওদিকে আরেক লাশ পড়ে আছে বাংলাদেশী স্পাইটার সেলে। তাও কি না পেশাবের মধ্যে! আশ্চর্য!

এক আধমরা বন্দীকে আটকে রাখার যোগ্যতাও এদের নেই,

আছে কি তাহলে? এই সমস্ত পাগল-ছাগল, ভেড়ার রাখাল করবে দেশ শাসন? ইয়া আল্লাহ, রক্ষা করো তুমি আফগানিস্তানকে।

কেন্ট ধরাল কর্নেল। মুখোমুখি বসা এইডকে দেখল। দৌড়ঝাঁপ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, ডিমে তা দেয়া মুরগির মত ঝিমাচ্ছে, ঢুলছে। একটু একটু করে চিন্তার লাইন ঘুরে গেল মুরাদের। একদিকের দেয়ালে আগেরবার টাঙিয়ে রেখে যাওয়া প্রকাণ্ড ক্লোজ ডিটেইল ওয়াল ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে আছে আনমনে। বাংলাদেশী রেসকিউ টীমটার কোর্স লাল মাথার পিন দিয়ে দেখানো আছে ওটায়।

ওই দলের সদস্যদের কথা ভাবল কর্নেল, দলনেতার কথা ভাবল। দেখতে কেমন সে? তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর ধূর্ততার যে কোন তুলনা হয় না, তাতে কোন সন্দেহ নেই মুরাদের। এ পর্যন্ত যা দেখিয়েছে, শত্রু হলেও তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। লোকটার সঙ্গীদেরও প্রশংসা করতে হয়। দুই রাত আগে তার এত যত্নে পাতা অ্যামবুশ যে ভাবে ব্যর্থ করে দিয়ে গেছে ওরা, কোন তুলনা হয় না তার। সেদিনের ব্যর্থতার জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, মুরাদ জানে।

তাই প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করছে না এখন। বরকতীকেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ দিচ্ছে না। প্রায় গোপনেই কাবুল-বাঘলান করছে সে। আশা ছিল, দেরি কিছুটা হলেও একবারে রেইডার পার্টিকে পাকড়াও করে বুক ফুলিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যাবে, কিন্তু...আজ আবার যে নতুন দুর্ঘটনা ঘটে গেল এখানে, তাতে আত্মবিশ্বাস অনেকখানি টলে গেছে কর্নেলের।

ঘুরেফিরে আবার রেইডার পার্টির লীডারের কথা খেয়াল হলো। দেখতে কেমন সে? কোন ধাতুতে গড়া? রেইডের দিন যে

লোকটা ধরা পড়েছিল, সেই কি লীডার? গার্ডের তৈরি গরম চায়ে চুমুক দিল কর্নেল, মগ হাতে উঠে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাপটার সামনে। ওদের এস্কেপ কোর্সের দিকে তাকিয়ে থাকল চিন্তিত চেহারায়। চোরাই জেট রেঞ্জার যেখানে ক্র্যাশ করেছিল, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ওটা। তারপর এঁকেবেঁকে দক্ষিণে গেছে ওয়াদির সেই অ্যামবুশ স্পটের দিকে। ওখানে টাইপ করা লেবেল সাঁটা আছে। লেবেলের তারিখ ২১/৯/১৯৯…। গতকালকের আগের দিনের তারিখ ওটা।

কর্নেলের নতুন নির্দেশ পালিত হয়েছে সময়মত। চিনূকের রিপ্লেসমেন্ট আর এক প্লাটুন ক্র্যাক ট্রুপ সম্পূর্ণ তার অধীনে আছে এখন। অ্যাকশনে আছে। হাই কমান্ডের ওদের সাথে যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছে কর্নেল, চেষ্টা করলেও ওই প্লাটুনকে কোন নির্দেশ দিতে পারবে না এখন ওরা। ওদিকে সে রাতের অ্যামবুশে প্রাণহানী বা ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও চেপে রেখেছে কর্নেল, জানায়নি। জানতে চায়ওনি হাই কমান্ড, সীমান্ত নিয়ে অনেক ব্যস্ত ওরা, এদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। ভালই হয়েছে।

এইডের দিকে ঘুরল সে। 'ওপরে যাও, দেখো কোন নতুন খবর আছে কি না।'

'ইয়েস্, স্যার,' উঠে পড়ল সে। দ্রুত চলে গেল কমিউনিকেশনস রুমের দিকে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে ফের ম্যাপে মন দিল মুরাদ। কিন্তু আপন চিন্তায় ডুবে যাওয়ার সময় পেল না, মাত্র দু'মিনিটের মাথায় ফিরে এল এইড। চেহারায় হাসি হাসি ভাব। ঘুম উবে গেছে।

'আছে কোন খবর?'

'মনে হয়, স্যার।'

খালি মগ রেখে নতুন সিগারেট ধরাল মুরাদ। খেয়াল করল হাত কাঁপছে অল্প অল্প। 'কি?'

'মারুফের বাইরে একটা ফুয়েল ট্যাঙ্কার ছিনতাই হয়েছে, স্যার। কয়েক ঘণ্টা আগে। ওটার এসকর্ট ভেহিকেলও।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওটার দুই ট্রুপার, ড্রাইভার, এদিকে ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার-হেলপার, সবাইকে অজ্ঞান করে অনেকখানি তেল নিয়ে গেছে কারা যেন।'

'তারপর?'

'ওরা বলছে লোকগুলো নাকি আমাদের ব্যাটল ড্রেস পরা ছিল।'

মাথা দোলাল অন্যমনস্ক কর্নেল। 'খুব স্বাভাবিক।' কয়েক পা গিয়ে ডেস্ক থেকে একটা লাল পিন নিয়ে ফিরে এল সে, মারুফের ওপর গেঁথে দিল। ওটার কাছেই একটা নীল পিন গাঁথা–কর্নেলের আগের আর্মি প্লাটুনের বেঁচে যাওয়া সদস্যরা আছে ওখানে। ওটার খানিকটা বাঁয়ে আছে আরও এক নীল পিন। নতুন ক্র্যাক প্লাটুনের অবস্থান দেখাচ্ছে ওটা।

পিন স্থির হলেও ওরা স্থির নেই, চলার ওপর আছে। হিসেবে কোন ভুল হয়নি, কর্নেল ভাবল সন্তুষ্ট হয়ে, তার অনুমান করা পথ দিয়েই যাচ্ছে ওরা।

তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিনগুলো দেখল এইড, তারপর, অনিশ্চিত চোখে কর্নেলের দিকে তাকাল। 'আপনার কি মনে হয়, স্যার, ওদের ধরা যাবে তো?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' হেসে বলল সে। 'ধরা দেয়ার জন্যেই এই পথে এগোচ্ছে ওরা, মাই ডিয়ার।'

'জ্বি, স্যার?'

'এবার আমাদের ফাইনাল ফাঁদে ধরা দিতে যাচ্ছে ওরা। আগেরবার যা ঘটেছে ঘটেছে, এবার আর রেহাই নেই।'

'তাহলে...আমাদের যাওয়া উচিত না এখন?'

'উঁহুঁ, আরেকটু অপেক্ষা করা উচিত।'

বিরান প্রান্তর মুহূর্তে মুহূর্তে পিছিয়ে যাচ্ছে। ডানা গজিয়েছে যেন দুই পিঙ্ক প্যান্থারের, সাঁ-সাঁ করে উড়ে চলেছে। পিছনে কালির মত দিগন্তে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে আফগান মেইনল্যান্ড। যাত্রীদের কারও মুখে কথা নেই।

মাটি এদিকে বেশ ঢালু। এতে আরও সুবিধে হয়েছে ওদের, গতি বেড়ে গেছে। বাতাসের আর্দ্রতা অনেক বেশি এখানে, টের পেল মাসুদ রানা। গাছপালাও ঘন। এখানে-ওখানে ছোট, পানি ভর্তি ডোবা-নালা দেখা যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। আকাশের মুখ এখনও ভার, বৃষ্টি নামব নামব করছে বহু আগে থেকে। নামছে না।

একটু পর ফার্মল্যান্ডে ঢুকে পড়ল ওরা। সবার চোখ একেকটা দূরবীন হয়ে গেল বিপদের আশঙ্কায়। পুব আকাশে সবে ভোরের আলোর আভাস দেখা দিতে শুরু করেছে তখন।

'অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না, বস্,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল সদরউদ্দিন। 'সামনে অনেক লোকজন চোখে পড়ছে। ওভার।'

সত্যিই তাই, রানাও দেখতে পাচ্ছে বিদ্যুৎ চমকের আলোয়। ভোর হয়ে আসছে বলে চাষীরা একজন-দু'জন করে ঘর ছাড়তে শুরু করেছে, মাঠের দিকে যাচ্ছে। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ঘরে বসিয়ে রাখতে পারেনি ওদের।

'চালিয়ে যাও, করপোরাল,' গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল ও। 'এ ছাড়া উপায়ও নেই। তাছাড়া ওরা সাধারণ,

আমাদেরকে নিজেদের রিইনফোর্সমেন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাববে বলে মনে হয় না।'

'আরেকটা কথা, বস্। আপনার ডিরেকশনে মনে হয় কোন ভুল আছে। বোধহয় ভুল পথে যাচ্ছি আমরা।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল ও। 'টেকনিক্যালিটি, প্যান্থার ওয়ান, আ টেকনিক্যালিটি। জাস্ট পুশ অন। আউট।'

পিছনে মেঝেতে বসা যূথী উঠে বসে রানার দিকে ঝুঁকল। 'দিন হওয়ার আগে জায়গামত পৌঁছতে পারব তো আমরা, মেজর?'

'মাথা যদি উইন্ডো লেভেলের নিচে না রাখেন, তাহলে সম্ভাবনা কম,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল ও। 'আফগান রিইনফোর্সমেন্টে মেয়ে নেই, সবাই জানে। পরেরবার মাথা তোলার দরকার হলে দয়া করে চুল সামলে নেবেন।'

লজ্জা পেয়ে নাক কোঁচকাল মেয়েটি। ঠোঁট টিপে হাসল। 'ইয়েস, বস্!'

হঠাৎ কড়া ব্রেক কষল ফয়েজ আহমেদ, কয়েক গজ স্কিড করে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যান্ড রোভার। 'শা-লা!' বলল সে।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল রানা, তবে জবাব শোনার দরকার হলো না। নিজের চোখেই দেখতে পেল।

হেভি আর্টিলারির মত গুড় গুড় মেঘ ডাকছে সামনে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে একটু পরপর। সে আলোয় কয়েকশো গজ সামনে প্যান্থার ওয়ানকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বড় এক পাল গরু ওটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘের ডাকে ভয় পেয়ে উল্টোপাল্টা আচরণ করছে পশুগুলো, রাখালের নির্দেশ মানছে না। পুরো ট্র্যাক বন্ধ করে দিয়েছে।

গ্রামের পথে এ দৃশ্য সাধারণ, সন্দেহের কিছু নেই। তবু

সন্দেহ হলো রানার। ওদিকে সদরউদ্দিনেরও একই সন্দেহ জাগল। বুঝে ফেলল এটা ছদ্মবেশী হোল্ড-আপ ছাড়া কিছু নয়। বিপদ টের পেয়ে রেডিওতে কথা বলতে শুরু করেছে, তখনই কমপক্ষে আধডজন ট্রুপারের ওপর চোখ পড়ল তার। আরও প্রায় দুশো গজ সামনের একটা মাটির ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

রানাও দেখল ওদের, সঙ্গে সঙ্গে ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। একই মুহূর্তে আরও একটা জিনিস দেখতে পেল। ট্রুপাররা যে ঘর থেকে বেরিয়েছে, তার পিছনের বড় এক বাগানের গাছ পালার আড়ালে আরেকটা চিনূক দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জোর বাতাসে ঝোপ দুলে ওঠায় পলকেরও কম সময়ের জন্যে দেখা গেছে ওটার লেজ, নইলে...

ফয়েজের পাঁজরে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো মারল ও। 'কুইক। ব্যাক করো, গাড়ি ঘোরাও, হারি আপ্!' পরক্ষণে সদরউদ্দিনের সবে আরম্ভ হওয়া সতর্কবাণীতে বাধা দিল। 'জানি, করপোরাল। দেখতে পেয়েছি আমি। আমরা পিছাচ্ছি, ফলো করো। আউট!'

ততক্ষণে নিপুণ দক্ষতার সাথে প্রায় জায়গায় গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছে ফয়েজ, পুরো থেমে দাঁড়ানোর আগেই উল্টোদিকে ছুটিয়ে দিয়েছে।

'বস্!' চেঁচিয়ে বলল জাহাঙ্গীর। 'আধ মাইল আগে একটা ব্রিজ পেরিয়ে এসেছি আমরা, একটা ওয়াদির ব্রিজ। ওই ওয়াদি ব্যবহার করা যায় না?'

মাথা দোলাল রানা। 'তাই করতে যাচ্ছি।'

চাগাল পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত খনির বাতাস চলাচলের শ্যাফট ওদের এপারের শেষ গন্তব্য। প্রায় তিন মাইল লম্বা শ্যাফট ওটা, অন্য মাথা পাকিস্তানে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওটাও চাগাল

পাহাড়েরই অন্য মাথায়। ওই পথে বেরিয়ে ঘুরপথে ও দেশের উপকূলীয় গ্রাম গদার হয়ে বিএনএস আলমগীরে উঠবে ওরা।

শ্যাফটটা অনেক পুরানো, সন্দেহ ছিল এতদিনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্ল্যান চূড়ান্ত করার আগে রানা খবর নিয়ে জেনেছে খোলাই আছে। পাকিস্তান প্রান্ত অবশ্য পাথর ধসিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার, পরে চোরাচালানীরা আবার চালু করেছে। এই পথে যাওয়া গেলে অল্প সময়ে ওখানে পৌঁছানো যেত, কিন্তু হলো না। এখন যেতে হবে অনেক ঘুরপথে।

তা হোক, ভাবল রানা, তবু আফগানদের বাই-পাস করা গেলে হয়।

ব্রিজে উঠে গাড়ি দাঁড় করাল ফয়েজ, গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল। বারো ফুট নিচে পাথুরে ওয়াদি বেডের ওপর দিয়ে পানির ক্ষীণ একটা ধারা বয়ে চলেছে। তার মধ্যে দিয়ে তলা দেখা যায় পরিষ্কার। পানি দুই কি তিন ইঞ্চির বেশি গভীর বলে মনে হয় না।

'মনে হচ্ছে অসুবিধে হবে না,' বলল ফয়েজ। 'যাওয়া যাবে।'

'চলো তাহলে,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'আমরাই আগে থাকি এবার।'

ফার্স্ট গিয়ার দিল লোকটা, ব্রিজ পার হয়ে কিনারা বেয়ে নামতে শুরু করল। কিছুটা এঞ্জিনের শক্তি, বাকিটা ঢালু কিনারা দ্রুত গড়িয়ে নিয়ে চলল ভারী পিঙ্ক প্যান্থার টুকে।

বাঘলান। ভোর সাড়ে পাঁচটা।

এইডের ব্যস্ত গলার ডাকাডাকিতে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল কর্নেল মুরাদের। মাথা তুলে পায়ের কাছে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো এইডকে দেখল সে চোখ কুঁচকে। উত্তেজিত দেখাচ্ছে যুবককে।

'খবর এসেছে, স্যার!' চ্যাঁচাল সে। 'জরুরী খবর এসেছে রেইডার পার্টি সম্পর্কে!'

কর্নেল খুব একটা ব্যস্ততা দেখাল না। হাত তুলে ঘড়িতে চোখ বোলাল একবার, খাটের বাইরে পা ঝুলিয়ে বসে হাই তুলল মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে। 'খুব খুশি মনে হচ্ছে? কি খবর এসেছে?'

'মাত্র কয়েক মিনিট আগে ওদের লোকেট করেছি আমরা, স্যার!' গর্বের সাথে বলল লেফটেন্যান্ট, যেন নিজেই করেছে সে কাজটা। 'চাগাল পাহাড়ের কাছের এক গ্রামে। রাখালরা ওদের আটকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘুরে কেটে পড়েছে ব্যাটারা। অবশ্য ফাঁকি দিতে পারেনি, ট্রুপস পিছু নিয়েছে। এবার আর পালাতে হচ্ছে না!'

উঠে পড়ল কর্নেল। তৈরি হতে শুরু করল, তবে হুড়োহুড়ি করল না। 'জায়গাটা কোথায়, ম্যাপে পয়েন্ট করে দেখাও।'

তাই করল যুবক, ব্যগ্র হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় একটা লাল পিন টিপে বসিয়ে দিল। 'এখানে, স্যার, এখানে!'

'হুঁমম! সেই জায়গা না, যেখানে চাগাল মাইনিং শ্যাফট...?'

'জ্বি-জ্বি!'

'ওদের তাড়া করা হচ্ছে তো?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল এইড। 'হচ্ছে।'

সন্তুষ্টি ফুটল কর্নেলের ফোলা চেহারায়। 'এবার তাহলে যাওয়া যেতে পারে।'

আধঘণ্টা পরের কথা।

প্যান্থার ওয়ানের পিছনে বসা জাফর আহমদ রুদ্ধশ্বাস গলায় বলে উঠল, 'সর্বনাশ! হেকমত, পিছিয়ে পড়ছি আমরা! ওরা

অনেক কাছে এসে পড়েছে!'

নিজের সীটে ঘুরে বসল করপোরাল সদরউদ্দিন। ঠিকই বলেছে ট্রুপার, ওদের ধরার জন্যে পিছনের আফগান জীপটা মরিয়া হয়ে ছুটছে। ওজনে অনেক হাল্‌কা ওটা। প্রতি মুহূর্তে ইঞ্চি ইঞ্চি করে মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনছে। ভেজা বলে ওয়াদির মাটি কিছুটা নরম, তাই সিকি টনী পিঙ্ক প্যান্থার গতি বাড়িয়েও সুবিধে করতে পারছে না। এই সুযোগ ষোলো আনাই নিচ্ছে ধাওয়াকারী।

'দেব উড়িয়ে?' জাফর বলল।

'না! ওরা জেনেছে জানুক, ওদের বন্ধুদের আমাদের লোকেশন জানতে দেয়া ঠিক হবে না। সামনের প্যান্থারকে ওরা হয়তো এখনও দেখেনি।' হেকমত আলির দিকে ফিরল করপোরাল। 'আরেকটু জোরে চালিয়ে ওদের অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়, হেকমত?'

'খুব রিস্কি হয়ে যাবে,' জবাব দিল সে দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

'তবু, মাসুদ ভাইরা অন্তত সরে যেতে পারবেন তাহলে।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল পরামর্শ পছন্দ হয়নি তার, তবু রাজি হয়ে গেল বিনা দ্বিধায়। 'ঠিক আছে। শক্ত হয়ে বোসো সবাই।'

কথা পুরো শেষ না হতেই হ্যান্ডব্রেক চেপে ধরল হেকমত, পর মুহূর্তে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিল তীরের দিকে। গুলি খাওয়া বাঘের মত লাফ দিল প্যান্থার ওয়ান, বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে উঠে পড়ল পানি ছেড়ে। কয়েক সেকেন্ড ব্যস্ত হয়ে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা খুঁজল লোকটা, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার হুইল ঘুরিয়ে দিয়েই এক্সিলারেটর ঠেসে ধরল ফ্লোরবোর্ডে। পিছনের টায়ারের তাড়নায় ঘন ধুলোর ঝড় উঠল, আশঙ্কাজনক খাড়া পাড় ধরে

সতর্কতার সাথে থ্রী পয়েন্ট টার্ন নিল হেকমত আলি, পরমুহূর্তে আফগান জীপের ড্রাইভার-আরোহীকে পুরো আহাম্মক বানিয়ে ঘুরে গেল উল্টোদিকে। অপ্রশস্ত ওয়াদি বেডে ওদের এগোবার পথ প্রায় আটকে দিয়েছে সে।

তুমুল গতিতে ছুটে আসতে থাকা আফগান জীপ তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। সামনেরটা এমন কাজ কেন করল ওটার ড্রাইভার বুঝল ঠিকই, কিন্তু একটু দেরিতে। কিছু করার সময় নেই তখন। ব্রেকে যে কাজ হবে না, তা জানে সে। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর এখন একটাই পথ আছে, কিন্তু সেটা বিপজ্জনক। অথচ না করেও উপায় নেই, কাজেই তাই করতে তৈরি হলো সে।

ড্রাইভিঙে হেকমত আলির অভিজ্ঞতার সিকিভাগও যদি তার থাকত, তাহলে হয়তো বুঝত তার গাড়ি আর সামনের অদ্ভুত ল্যান্ড রোভারের মধ্যে ওজনের আকাশ-পাতাল তফাত আছে, ওটা যা করতে পারে, তারটা তা পারে না। কিন্তু চিন্তাটা মাথায়ই এল না, সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে বাঁ দিকের ঢালে কোনাকুনি গাড়ি তুলে দিল লোকটা। উত্তেজনার মাথায় হুইল একটু বেশিই ঘুরিয়ে ফেলেছিল, অসম্ভব এক অ্যাঙ্গেলে ঢালে উঠে পড়ল গাড়ি।

ভালই এগোল কয়েক গজ, তারপর গ্র্যাভিটির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় রইল না। বেশি কাত হয়ে পড়ায় ওপরদিকের দুই টায়ার মাটির সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলল মুহূর্তে, তারপরও দু'গজের মত এগোল ওটা, অবশেষে উল্টে পড়তে শুরু করল। খুব দ্রুত তিনটা ডিগবাজি খেল জীপ, আপার ফ্রেমওয়র্ক-উইন্ডশীল্ড চুরমার হওয়ার শব্দে দাঁড়িয়ে থাকা পিঙ্ক প্যান্থারের আরোহীদের গাল কুঁচকে উঠল। ফ্রেমওয়র্কের সাথে ওটার দুই আরোহীর হাড়গোড়ও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

চার চাকা আসমানে তুলে ওয়াদি বেডে স্থির হলো জীপ।

হেকমত আলি সেদিকে তাকিয়ে আছে নির্বিকার চেহারায়। 'মামলা খতম।'

'কী ভয়ঙ্কর!' জাফর মন্তব্য করল পিছন থেকে।

সদরউদ্দিন দাঁত বের করে হাসছে। কনুই দিয়ে হেকমতের পাঁজরে গুঁতো মারল সে। 'দারুণ দেখিয়েছ, নাটকু। এবার চলো, মাসুদ ভাইদের ধরতে হবে।'

গাড়ি ঘুরিয়ে ওপরে তুলে আনল সে ধীরেসুস্থে, তারপর ওয়াদির তীর ধরে হাঁ-হাঁ করে দৌড় শুরু করল। টানা দশ মিনিট ছোটার পর সামনে আবছামত দেখা গেল প্যান্থার টুকে। ওয়াদি বেডে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রেক কষল হেকমত আলি।

'কি হলো?' বলতে বলতে নেমে পড়ল সদরউদ্দিন।

ঝুঁকে ওটার পিছনের অফসাইড হুইল পরীক্ষা করছিল রানা ও ফয়েজ মোহাম্মদ, ওয়ানের আওয়াজ শুনে সোজা হলো। 'রিয়ার অ্যাক্সেল গেছে,' ফয়েজ বলল ওদের উদ্দেশে। 'বড় এক গর্তে পড়ে ভেঙে গেছে।'

এঞ্জিন অফ করে হেকমত আলিও নামল এবার, দৌড়ে নেমে পড়ল নিচে। 'কই, কি হয়েছে, দেখি!'

'লাভ নেই,' মাথা দোলাল রানা। 'চলবে না। এটাকে ফেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

ওপরে দাঁড়ানো সদরউদ্দিন হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে কান খাড়া করল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে সামনের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার, চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'মাসুদ ভাই! জলদি উঠে আসুন সবাই। পানি...!'

চোখ কুঁচকে কান পাতল ও, পরক্ষণে পিলে চমকে গেল। সর্বনাশ! পশম দাঁড় করানো শোঁ-শোঁ, ছল ছল, নানান শব্দ তুলে পানি ছুটে আসছে জলোচ্ছ্বাসের মত। দূরে যে বৃষ্টি হয়েছে, এ

সেই পানি। পাহাড় থেকে ঢলের মত নেমে শুকনো ওয়াদির দুই কূল ছাপিয়ে ছুটে আসছে। আওয়াজ শুনে বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে কোথাও। এসে পড়ল বলে।

ক্যাব ডোর খোলাই ছিল, হাত বাড়িয়ে খপ্ করে যূথীর বাহু চেপে ধরল রানা, একটানে বাইরে এনে ফেলল। 'ওপরে যান জলদি!' উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে বলল। 'দৌড় দিন! ডন, নামুন তাড়াতাড়ি!' বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। তাই দেখে ক্ষিপ্ত গলায় দাবড়ি লাগাল ও, 'তাড়াতাড়ি যান, ফ্লাড আসছে!'

তবু কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল দু'জনে, কিন্তু যখন দেখল মেজরসহ অন্যরা খুব ব্যস্ত হয়ে গাড়ি খালি করতে লেগেছে, তখন টনক নড়ল। খিঁচে দৌড় লাগাল। ওরাও শুনতে পেয়েছে তখন পানির ভয়াবহ আওয়াজ।

'আমি চার্জ সেট করি,' ফয়েজ বলল শান্ত গলায়।

'জল্দি করো!' ড্যাশ বোর্ড লকার থেকে সাইফার, অবশিষ্ট রুট প্ল্যান-ম্যাপ ইত্যাদি বের করার ফাঁকে বলল রানা। বেশি নেই অবশ্য, ভাগে ভাগে রুট প্ল্যান করা ছিল থান্ডারবোল্টের। নির্দিষ্ট সেকশন পেরিয়ে আসার পর প্রতিবার সেই অংশের প্ল্যান-ম্যাপ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলেছে ও।

খন্দকার জাহাঙ্গীর ততক্ষণে একগাদা বোঝা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে তীর বেয়ে, হেকমত আলি তাকে সাহায্য করছে। কাগজপত্র পকেটে ভরে কারবাইনের কয়েক বাড়িতে রেডিও সেট গুঁড়িয়ে দিল রানা। ফয়েজ ফিউজ নিয়ে ব্যস্ত। আর সামান্য বাকি।

এই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

ভেতর থেকে মুখ বের করেই আস্ত আহাম্মক হয়ে গেল রানা

পানির পাহাড় দেখে। আর মাত্র দশ পনেরো ফুট দূরে আছে–সামনের একটা বাঁক ঘুরে অবিশ্বাস্য গতিতে হুড়মুড় করে ছুটে আসছে। কম করেও দশ ফুট উঁচু, কাদাগোলা বাদামী, ঘন পানি। ওটা যে এত কাছে এসে পড়েছে, মেঘের ডাকের জন্যে বুঝতেই পারেনি।

হুঁশ হতে আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ফয়েজ, দৌড় দাও! সময় নেই, বাদ দাও!' বলেই সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত ছুটল।

একই মুহূর্তে ফয়েজের কাজও শেষ হলো। 'আসছি,' বলে সোজা হলো সে। ওপর থেকে প্রত্যেকে চ্যাঁচাচ্ছে তার নাম ধরে। সদরউদ্দিনের ঘাড়ের সমস্ত খাটো চুল দাঁড়িয়ে গেছে ভয়ে, দু'পা নেমে এসে রানাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে রেখেছে সে। ওদিকে বোঝা ফেলে জাহাঙ্গীর তারস্বরে ফয়েজকে ডাকছে, আতঙ্কে দু'চোখ কোটর ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে যেন লোকটার।

কাজ হলো না। শেষ মুহূর্তে পা তুলেছিল ফয়েজ তীব্র আতঙ্কের ধাক্কা কাটিয়ে, কয়েক পা দৌড়েও এসেছিল, বিফলে গেল সব।

বাদামী রঙের ঘন, নিরেট দেয়ালটা বিদ্যুৎবেগে পিঙ্ক প্যান্থার টুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, পরমুহূর্তে করপোরাল ফয়েজ মোহাম্মদের ওপর। পাহাড় দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়েছিল সে, ঠিক তখনই। অসহায়, ভাঙাচোরা পুতুলের মত পানিতে ঘুরপাক্ খেল ফয়েজ, তলিয়ে গেল চোখের পলকে।

'ফয়ে-এ-জ!' চিৎকার করে উঠল জাহাঙ্গীর, কিন্তু পানির বিকট আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সে ডাক।

ওদিকে প্রথম ধাক্কায় রানার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল পানিতে, গতি থেমেই গিয়েছিল, আর এক সেকেন্ড দেরি হলে ও-ও ভেসে

যেত। কিন্তু সদরউদ্দিন সময় থাকতে ধরে ফেলায় অল্পের জন্যে বেঁচে গেল। ঘুরে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। কাত হয়ে ভেসে যেতে থাকা প্যান্থার টুকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু করপোরালের কোন চিহ্নই নেই।

ওয়াদি বেড ভাসিয়ে-ডুবিয়ে ভয়াবহ শব্দের সাথে এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে ছুটে যাচ্ছে পানি। কে তলায় পড়ল, কতজন তার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে, সে সব দেখার সময় নেই।

একটু পর দূর থেকে চাপা, তবে জোরাল বিস্ফোরণের আওয়াজ এল। ধ্বংস হয়ে গেছে পিঙ্ক প্যান্থার টু। বিচ্ছিন্ন এক-আধটা টুকরো ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না ওটার হাজার খুঁজেও।

অমোঘ নিয়তি অসময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ফয়েজকে, তবু তার ওপর দেশ ও জাতির ন্যস্ত দায়িত্ব আর কর্তব্য পালন করা থেকে তাকে সরিয়ে আনতে পারেনি।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ওরা, কারও মুখে কথা নেই।

এতবড় একটা অঘটন সত্যিই ঘটে গেছে, একটু আগে পর্যন্ত যে মানুষটা দলের সব কিছুতে ছিল, সবার প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী ছিল, চোখের পলকে নেই হয়ে গেল সে, বিশ্বাসই হতে চায় না কারও। এ কি করে হয়? এ-ও কি সম্ভব?

জাহাঙ্গীরের চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। হাবার মত ওয়াদির দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল মাসুদ রানা, কিন্তু কি বলবে ভেবে না পেয়ে বুজে ফেলেছে। অসুস্থ লাগছে ওর। ফোঁপানি শুনে ঘুরে তাকাল—যূথী কাঁদছে।

জাফর, সদরউদ্দিন, হেকমত আলি, আলালউদ্দিন, সবাই যেন নির্বোধ রোবট একেকজন। স্রোতের দিকে অপলক তাকিয়ে

আছে—সবার চোখে অবিশ্বাস।

'চলো সবাই, কর্কশ গলায় হুকুম দিল রানা। 'গাড়িতে ওঠো।'

অদম্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল দলটা। সদরউদ্দিনকে মাঝখানে বসিয়ে রানা ও হেকমত আলি সামনে উঠল, অন্যরা পিছনে। রওনা হয়ে গেল পিঙ্ক প্যান্থার ওয়ান। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই হেকমতের, একদম পাথর হয়ে গেছে যেন। ওর মনের মধ্যে এক অশুভ চিন্তা ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, প্রথম সন্তানের মুখ দেখার সৌভাগ্য বোধহয় হবে না তার। হয়তো তার আগেই...

এদিকে রানাও একই কথা ভাবছে। পিছন পিছন শত্রুর তেড়ে আসার ব্যাপারটা যত ভুলে থাকতে চাইছে, ততই বেশি বেশি মনে পড়ছে। খারাপ চিন্তা আর ভয় ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে। একটার পর একটা সমস্যা যে ভাবে এসে হাজির হচ্ছে, তাতে মিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে ওর মনে। প্রথমে শহীদ গেল, এবার ফয়েজ, এরপর আর কতজনকে হারাতে হয় কে জানে?

থান্ডারবোল্টে যারা আছে, তারা প্রত্যেকে একেকটা বহুমূল্যবান হিরের টুকরো। বছরের পর বছর ধরে এদের তিলে তিলে গড়ে তুলেছে বিসিআই। সামান্য অবহেলায় তার মধ্যে দু'জনের প্রাণ চলে গেল। সার্জেন্ট শহীদুল্লাহর ব্যাপার আলাদা, কিন্তু ফয়েজের মৃত্যুর দায়িত্ব এড়ায় কি করে মাসুদ রানা? ওয়াদির জলোচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্করত্বের কথা ফয়েজ কেবল শুনেছে, কিন্তু রানা তো নিজের চোখে দেখেছে ওমানে, তুরস্কে। ও কেন আরও আগে সতর্ক হলো না? কেন নিজের আগে তার প্রাণের চিন্তা করল না?

কট্-কট্ শব্দে সচকিত হলো ও। চোখ তুলেই চমকে উঠল—সেই চিনুক! মাথা খানিকটা নিচু করে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

দিনের আবছা, ফ্যাকাসে আলো ফুটেছে মাত্র, তাতে ওটাকে নরক থেকে আসা ভয়ঙ্কর অশুভ, নাম না জানা এক প্রাণসংহারী পতঙ্গের মত লাগছে।

'কপ্টার!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'গাড়ি থামাও কোথাও, হেকমত!'

উপায় নেই দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল লোকটা, পথের পাশের গাছপালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তেমন লাভ হলো না, বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাবে না এখানে। আপাতত কপ্টারের চোখের আড়ালে চলে আসা গেলেও ট্রুপাররা নেমে আসবে, অল্প সময়ের মধ্যেই খুঁজে বের করে ফেলবে। পাতার ফাঁক দিয়ে ওটাকে সৈন্য নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল—উপায় নেই।

ম্যাপের অবশিষ্ট অংশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। 'গাড়ির মায়া ছেড়ে বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে আমাদের।' সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে আবার বলল, 'সূর্য উঠবে এখনই, মেঘ থাকলেও আলো বাড়বে, এটা নিয়ে বেরই হওয়া যাবে না। কাজেই এটাকেও ধ্বংস করে ফেলতে হবে এখনই। দশ-পনেরো মাইল বেশি হাঁটতে হবে আর কি!' ডন আর যূথীকে দেখল ও। 'সরি, উপায় নেই।'

'দশ-পনেরো মাইল!' ঢোক গিলল ডন। 'এত পথ...'

'আরে ঘাবড়ান কেন?' বলল সদরউদ্দিন। 'এতবড় এক অ্যাডভেঞ্চারে মিয়া-বিবি বসেই তো থাকলেন, ছেলেপুলে হলে গল্প করবেন কি নিয়ে?'

হাসি চাপল রানা। অন্যরাও হাসি আড়াল করল, ডন-যূথীও। টনিকের মত কাজ করেছে করপোরালের মন্তব্য, বুকের ভার অনেক হালকা হয়ে গেছে সবার।

প্যান্থার পরিত্যাগের এক ফাঁকে যূথী জানতে চাইল, 'আপনার

কি মনে হয়, মেজর, ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে?'

'নিশ্চয়ই পেয়েছে। তবে এই লোকেশন এখনও স্পট করতে পারেনি খুব সম্ভব। তাহলে ট্রুপস্ নামাতে ব্যস্ত না হয়ে এগিয়ে আসত। ঘাবড়াবার কিছু নেই, এমনিতেও আমরা আমাদের জায়গামত প্রায় এসে পড়েছি।'

হেসে নিশ্চয়তা দিতে চাইল, কিন্তু কাজ হলো না তেমন। ওর সহকর্মীদের মধ্যেও না। স্বাভাবিক, মনে মনে ভাবল রানা, ফয়েজকে হারিয়ে সবার মনোবল কমে গেছে।

'ওকে,' আবার বলল ও। 'খুব জরুরী জিনিসপত্র ছাড়া কিছু সঙ্গে নেব না আমরা। যা যা নিতে হবে, সবাই ভাগ করে নিতে হবে। ডন-যূথী, আপনাদের কোন আপত্তি নেই নিশ্চই?'

হাসির ভঙ্গি করল সাংবাদিক। 'আপত্তি জানাবার সুযোগ আছে তাহলে?'

'নট রিয়েলি,' হাসল ও। 'স্পেয়ার ওয়াটার ক্যারিয়ারগুলো তুলে দিল তার হাতে। 'ব্যস্, এর বেশি চাপাব না।'

জাহাঙ্গীর জাফরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হাতের অবস্থা কি?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ, ডাক্তারের খবর নেই তার রোগীর অবস্থার! কেন, খারাপ হলে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবে?'

চেহারায় বিষাদ ফুটিয়ে মাথা দোলাল জাহাঙ্গীর। 'না। ভাবছিলাম বেশি খারাপ হলে গুলি করে মেরে রেখে যাব।'

'ধন্যবাদ,' গম্ভীর হয়ে উঠল জাফর। 'কোনটারই দরকার হবে না। ম্যানেজ করে নেব।'

ছয়

পদযাত্রা শুরু হলো থান্ডারবোল্ট মিশনের। ততক্ষণে সূর্য বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে, মেঘ ফুঁড়ে যদিও দেখা দেয়ার সুযোগ পায়নি এখনও। তবু এর মধ্যেই যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

সারারাত এত মেঘের আনাগোনা, এত মেঘ ডাকা, অথচ এদিকে বৃষ্টি হলো না এক ফোঁটাও। মেঘ এখনও আছে, তবে বৃষ্টির আশা ছেড়েই দিয়েছে রানা। হলে অবশ্য ভাল হত, খুব উপকার হত ওদের।

বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, মাথার ওপরে কপ্টারের চোখ থেকে গা ঢাকা দেয়ার মত আড়াল আছে, এমন জায়গা বেছে বেছে। মাটিতে পা ফেললে ছাপ পড়বে, তাই রোদের তাপে মরে শুকিয়ে যাওয়া ঝোপ আর ঘাসের গোছার ওপর দিয়ে ক্রল করে দলকে নিয়ে চলেছে রানা ও হেকমত আলি। স্লো লেপার্ড ক্রল বা চিতার বুকে হাঁটা বলে একে।

একটু এগোয়, আড়ালে বসে অস্ত্র তৈরি রেখে অপেক্ষা করে, তারপর আবার এগোয়। এতে কষ্ট যত না হচ্ছে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি চাপ পড়ছে স্নায়ুতে। করপোরাল সদরউদ্দিনের জিম্মায় আছে সাংবাদিক যুগল। কয়েক সেকেন্ড পর পর হুঁশিয়ার করছে সে

দু'জনকে, হাঁটু-কনুই জায়গা দেখে ফেলতে, পিঠ আর মাথা যতটা সম্ভব মাটির সাথে মিশিয়ে রেখে এগোতে বলছে।

ওদের চলার সময় সামনে রানা-হেকমত, পিছনে জাহাঙ্গীর-জাফর আড়ালে বসে পাহারা দেয় স্মোক গ্রেনেড নিয়ে। যদি চিনূক দেখে ফেলে, এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, সবুজ ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে দেবে ওরা। অবশ্য পরিস্থিতি গুরুতর না হলে নয়। আলালউদ্দিন ওরফে টাইগার পিছনে আছে, প্রয়োজনে ফিন গ্রেনেড, অথবা হেকলার অ্যান্ড কচ ব্যবহার করবে সে পরিস্থিতি বুঝে। দায়িত্বটা সে নিজেই সেধে নিয়েছে।

ল্যান্ড রোভার ছেড়ে আসার আগে ওটায় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সেট করে এসেছে সে, নির্দিষ্ট সময়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ওটা।

এক ঘণ্টায় মোটামুটি এগোল দল। কিন্তু তারপরই থেমে গেল রানা, চোখে দূরবীন লাগিয়ে সামনে, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। যুগলকে নিয়ে সদরউদ্দিন পৌঁছতে ঘুরে তাকাল, কপাল কুঁচকে আছে।

'কি সমস্যা, মাসুদ ভাই?'

'ট্রুপাররা সামনে থেকে ঘেরাও করে এগিয়ে আছে। কম্বিং করছে ওরা পুরো এলাকা। আর যাওয়া যাবে না।'

'তাহলে?'

'ওদের ফাঁকি দেয়ার এখন একটাই উপায় আছে, ধারেকাছে কোথায় আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যানাল শ্যাফট আছে, খুঁজে বের করে নেমে পড়া।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যানাল!' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সাংবাদিক। 'মানে কানাত?' ওকে সায় দিতে দেখে আবার বলল, 'আই সী! আমি তো জানতাম ও জিনিস ইরানীদের আবিষ্কার। শুধু ইরানেই আছে।'

'না। প্রাচীন মিশরীয়দের আবিষ্কার ওটা। সাড়ে চার হাজার বছর আগে ফারাওরা চালু করে। মিডল ইস্টের কয়েকটা দেশে আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যানাল, এদেশে আছে কেবল সীমান্ত এলাকায়।'

ম্যাপে টোকা দিল ও। 'এখান থেকে শ'পাঁচেক গজ উত্তরে একটা ক্যানাল শ্যাফট আছে দেখানো হয়েছে এটায়। আরও কয়েকটা আছে, ওটা দিয়ে পুরো সাত মাইল দক্ষিণে যেতে পারব আমরা।'

'ওরে বাবা!' বলল যূথী। 'এত বড়?'

'এরচে' বড়ও আছে।'

পুরো একঘণ্টা লুকোচুরির পর সবচেয়ে কাছের শ্যাফটের মুখে পৌঁছল ওরা ভাগ ভাগ হয়ে। ইঁটের তৈরি গম্বুজ আছে ওটাকে ঘিরে, ওস্তাদ হাতের কাজ। ভেতরে যাওয়ার খিলানের মত মুখ খোলা দরজা আছে। দেখতে এস্কিমোদের বরফের ঘরের মত লাগে।

ভার্টিকেল ডাউন শ্যাফট যাতে ধসে না পড়ে, সে জন্যে ভেতরের দেয়াল ঘিরে দেয়া হয়েছে ইঁটের দেয়াল গেঁথে। কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে পানির কুলকুল আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ হেকমত আলি। তারপর যেন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, 'একবারে শেষ গোসল হয়ে যাবে না তো?'

'এটা কত লম্বা বললেন, বস্?' জাহাঙ্গীর বলল।

'সাত মাইল। এটার সবচে' সুবিধে হলো আমরা যে পথে যেতে চাই, এটাও সেদিকে গেছে। পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যে পথ পিছিয়ে এসেছি আমরা, তার ডবলেরও কিছু বেশি হবে।'

'তাহলে তো ভালই হলো।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল সাংবাদিক। 'যদি গভীরতা ছয় ফুটের ওপরে না হয়।'

মাথা দোলাল রানা। 'তেমন সম্ভাবনা মোটেই নেই। ইরানে কানাতে নেমেছি আমি, অনেকটা পথ হেঁটেছি, পানি হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ওঠেনি কোথাও। এ দেশে এতদিন শুকনো মৌসুম ছিল, খুব সম্ভব কাল রাতেই প্রথম বৃষ্টি হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে গোড়ালির সামান্য ওপর পর্যন্ত হতে পারে পানি, তার বেশি নয়।'

'হেঁটে না হয় গেলাম,' যূথী বলে উঠল। 'কিন্তু শেষ মাথায় গিয়ে যদি দেখি ওঠার পথ নেই?'

'পথ না থেকেই পারে না। কয়েকশো গজ পরপর শ্যাফট আছে, ভেতরের মাটি কেটে ওগুলো দিয়ে ওপরে তুলেছে ওরা। ভেতরের বাতাস যাতে আটকা থেকে বিষাক্ত না হয়ে ওঠে, বা ক্যানালের কোন সেকশন যে কোন সময় মেরামত, মেইনটেন্যান্স ইত্যাদির দরকার হয়ে পড়তে পারে, সে জন্যে ওগুলো সারাবছর খোলাই থাকে।'

'কোথাও অ্যাক্সিডেন্টলি বুজে গিয়েও তো থাকতে পারে,' ডন বলল।

মাথা ঝাঁকাল ও। 'তা পারে। তবে সেরকম কিছু ঘটলে চাষীরা সাথে সাথে মেরামত করে ফেলে। এসব দেশের মাটি শুকনো, তারওপর বছরের আট মাসই থাকে ড্রাই সীজন। ক্যানালের পানি ছাড়া চাষাবাদ করার উপায় নেই এদের। পানি চলার পথ বন্ধ থাকলে চলবে কেন?'

'বৃষ্টিতে ক্যানালের পানির গভীরতা বাড়ে?'

'হ্যাঁ। মাটি চুইয়ে পানি নামে ভেতরে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল লোকটা। 'ওয়াদিতে যা ঘটে গেল...'

'সে পানি ছিল খোলা জায়গার, পাহাড়ী ঝরনার। সারাবছর খরচ না করলেও তো অত পানি হবে না ক্যানালে।' নাকের ডগা চুলকাল রানা। 'তবে রাতে যা ছিল, এখন তারচে' এক-দেড় ইঞ্চি বেশি হলেও হতে পারে।'

করপোরাল সদরউদ্দিন মাথা দোলাল চিন্তিত ভঙ্গিতে। লম্বা করে দম নিল। সবারই কোন না কোন ভীতি থাকে। উচ্চতা ভীতি, আরশোলা ভীতি বা মাকড়সা ভীতি এইসব–তার ভীতি হচ্ছে ড্রেন-টানেল ইত্যাদি। কমান্ডো ট্রেনিঙেও তা দূর হয়নি। রুটিনে যেদিন টানেল থাকত, চেহারা অন্যরকম হয়ে উঠত লোকটার। আজও সেই অবস্থা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

কাজ শুরু করে দিলে অবশ্য ভয় কেটে যায়। খন্দকার জাহাঙ্গীরের হাজারবারের বেশি প্যারাসুট জাম্প করার রেকর্ড, অথচ এখনও জাম্প করার আগের রাতে ঘুমাতে পারে না সে। আবার সে-ই হিন্দুকুশে জাম্প করেছিল রানার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

পায়ের চাপা আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল সবাই। আলালউদ্দিন আসছে হেলেদুলে। কাছের এক জঙ্গলে বসে ছিল আফগান ট্রুপারদের ওপর নজর রাখার জন্যে।

'ওরা কাছে এসে পড়েছে, বস্,' স্বাভাবিক গলায় বলল লোকটা। 'অবশ্য ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে। খুব সতর্ক। এখন রওনা হলে হয়তো আধঘণ্টা বাড়তি সময় পাব আমরা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' রানাকে বুদ্ধি জোগাবার চেষ্টা করল সাংবাদিক। 'আমরা নিচে নেমে অপেক্ষা করতে পারি ওরা সার্চ করে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, তারপর রাত হলে উঠে আসব! কি বলেন?'

'এই এলাকাতেই কোথাও আছি আমরা, তা ওরা জানে। হঠাৎ করে এত মানুষ উধাও হলো কি করে, প্রথমে না হলেও একটু

পরে ঠিকই বুঝে ফেলবে, লোক নামিয়ে খোঁজা শুরু করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে।'

মুখ কালো হয়ে গেল তার। 'তাহলে আর নেমে লাভ হলো কি?'

'একটা লাভ আছে,' বলল ও। 'ওরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগেই আমরা অনেক দূরে সুরে যেতে পারছি। যদি বুঝি যে ধাওয়া করা হচ্ছে, যে কোন এক শ্যাফট দিয়ে উঠে পড়ব। তবে সবচে' বড় কথা, ভেতরে সবাইকে শান্ত থাকতে হবে। কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়লে বিপদ।'

সাংবাদিক যুগলের দিকে তাকাল। 'আমরা সবাই কেভিঙে কমবেশি অভিজ্ঞ, কাজেই ভাববেন না আপনারা একেবারে আনাড়ীর হাতে পড়েছেন। যদি নির্দেশ মেনে চলেন, শেষ পর্যন্ত দেখবেন সহজেই মিটে গেছে সব।'

'যদি সামনে-পিছনে দুদিকেই মাটি ধসে পড়ে?' ভয়ে ভয়ে বলল যূথী। এতক্ষণ ছিল থিওরি, এখন হতে যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল, কাজেই মুখ শুকিয়ে গেছে।

'সে ভয় নেই,' জোর দিয়ে বলল রানা। মনে প্রাণে চাইছে বিশ্বাস করুক ওরা কথাটা। নইলে যে কোন মুহূর্তে যূথীর আশঙ্কা সত্যি হয়ে যেতে পারে। এইসব ক্যানাল কম করেও হাজার বছর আগের, ভেতরে নিশ্চই এক-আধটা দুর্বল পয়েন্ট আছে। তেমন কোথাও দাঁড়িয়ে যদি কেউ ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, এমনকি জোরে কথাও বলে, দেয়াল ধসে পড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। 'তাহলে কি আমরা নামতাম?'

পাল্টা প্রশ্নটা মনে হলো দু'জনেরই পছন্দ হয়েছে। মাথা আস্তে কাত করে সায় দিল মেয়েটি।

'নিচে হাঁক-ডাক নয়, জোরে কথা নয়, অলরাইট?'

'অলরাইট,' একযোগে বলল স্বামী-স্ত্রী।

'আবার বলছি,' তর্জনী তুলল রানা। 'নার্ভ কন্ট্রোলে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা। কাজেই শান্ত থাকবেন, কোনকিছুতেই ঘাবড়াবেন না। বিপদ সামলাতে আমরা আছি। আপনাদের বিপদ হলে আমাদেরও হবে, কিন্তু আমরা যে বিপদ পছন্দ করি না, এই ক'দিনে আপনারা নিশ্চয়ই তা টের পেয়েছেন! আরেকটা কথা, যদি দেখেন পানি বেশি মনে হচ্ছে, যে শ্যাফট কাছে পাবেন, তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকবেন। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই, আমরা সামনে-পিছনে দুদিকেই থাকব।'

জাফর আহমেদের দিকে ফিরল রানা। 'তুমি থাকছ সবার আগে। আমি থাকব তোমার পিছনে। পিছনের সবাইকে বেল্ট-অর্ডার করব আমরা, কাজেই যতদূর সম্ভব কম হতে হবে আমাদের বোঝা। নইলে টানেল যদি কোথাও বেশি সঙ্কীর্ণ হয়, আটকে যাব।'

'সে আবার কি?' বলে উঠল ডন। 'তেমন চান্স আছে...'

'আরে না!' বাধা দিল সদরউদ্দিন। 'ও তো একটা কথার কথা।' নিজের টানেল ভীতি দূর করার জন্যে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে চাইছে সে। যত তাড়াতাড়ি নামা যায়, তত লাভ তার।

তৈরি হয়ে টানেলে নেমে পড়ল আটজনের দলটা। সাংবাদিক যুগল বাদে সবার হাতে টর্চলাইট। পানি গোড়ালির সামান্য ওপরে দেখে ডন আর যূথী বেশ সন্তুষ্ট হলো। মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে চলতে শুরু করল সবাই। জাফর আগে আগে তার রাবারমোড়া টর্চলাইট জ্বেলে এগোচ্ছে। খিলানের মত প্রায় গোল টানেলের ছাদ ছয় ফুট উঁচু। নিচের থেকে ওপরে বেশি নজর রাখতে হচ্ছে সবাইকে, নইলে মাথা ঠুকে যেতে পারে।

দু'নম্বরে রয়েছে মাসুদ রানা, তারপর আলালউদ্দিন। জাহাঙ্গীর

আসছে তার পিছনে। তার কাঁধে বড় এক আঁটি তুঁত গাছের লম্বা, সোজা ডাল। নামার আগে ওগুলো কাছের বন থেকে কেটে এনেছে আলাল। ওর একটা আছে জাফরের হাতে। ওটা দিয়ে ক্যানালের মেঝে ঠুকে গর্ত আছে কি নেই দেখে তবে পা বাড়াচ্ছে।

ডালগুলো আনা হয়েছে ওপরে ওঠার সময় অ্যাঙ্গেল জয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে। সরু শ্যাফটের দেয়ালে দু'মাথা ঢুকিয়ে ওর ওপর পা রেখে ওপরে উঠবে ওরা। জাহাঙ্গীরের পিছনে সাংবাদিক যুগল, রানা ও জাফরের বেল্ট-প্যাক টানতে হচ্ছে ওদের। তারপর সদরউদ্দিন ও হেকমত আলি। ওদের দুজনের হাতে হেকলার অ্যান্ড কচ রেডি, অনুসরণ করা হচ্ছে বোঝা গেলে কাজে লাগানো হবে।

ভেতরে দলটা যত এগোচ্ছে, পিছনের শ্যাফট দিয়ে আসা আলো ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। একসময় মিলিয়ে গেল তার শেষ চিহ্নও। টর্চলাইটের আলো ছাড়া কালির মত অন্ধকার এখন ভেতরে। এবড়োখেবড়ো দেয়ালে ওদের ক্যারিকেচারের মত ত্যাড়াবাঁকা ছায়া নাচছে।

পানি সামান্য বেড়েছে বলে শব্দ কম হচ্ছে এখন। হাঁটুর সামান্য নিচ পর্যন্ত এখন পানি। বয়ে চলেছে চাপা কুল্-কুল্ শব্দে। মাঝেমধ্যে এর-ওর বোঝা ঘষা খাচ্ছে দেয়ালে। এ ছাড়া আর কোন্ শব্দ নেই। বাতাস ভরে আছে মাটির গন্ধে। একটু একটু করে নামছে ওরা, ক্যানাল বেড ক্রমে ঢালু হতে হতে এগিয়েছে। অবশ্য ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝা মুশকিল। ছাদের উচ্চতা সবখানে একইরকম। তাই দলের অর্ধেকের বেশি সদস্যকেই হাঁটতে হচ্ছে মাথা নিচু করে।

অসুবিধে হচ্ছে সে জন্যে, গতি আশা অনুযায়ী হচ্ছে না, তবে

তা নিয়ে অভিযোগ নেই কারও। কথা নেই কারও মুখে। নেই বলেই অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা চেপে বসেছে প্রত্যেকের মধ্যে। মনে অজানা ভয়ের আশঙ্কা।

একটু পর দেখা গেল দু'দিক থেকে চেপে আসতে শুরু করেছে দেয়াল। চাপছে তো চাপছেই। হেকমত আর যূথী ছাড়া অন্যরা ঘাড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে এগোচ্ছে, কাঁধ যথাসম্ভব সরু করে, তবু ঘষা লাগতে শুরু করেছে দেয়ালে। আধডজন টর্চ লাইট থেকে থেকে জ্বলছে, তবু অন্ধকার যেন কালির চাইতেও গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমে।

হঠাৎ সামনে থেকে কারও চাপা বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল, পরক্ষণে ডানা ঝাপ্‌টানোর ফড়-ফড় শব্দ গুহার এ-মাথা ও-মাথা প্রতিধ্বনি তুলে বেড়াল খানিক।

ঝপ্ করে মাথা নামিয়ে নিল যূথী। বুকের ধড়ফড়ানি কমতে বলল, 'মা গো! কি জিনিস ওটা?'

আঁতকে উঠে ওর পিছনের সদরউদ্দিনও বসে পড়তে যাচ্ছিল। ভেবেছে নিশ্চয়ই ভূগর্ভের কোন দানব বুঝি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টেছে ডানার আওয়াজে। 'ও কিছু নয়,' বলল সে। 'বাদুড়।'

'উফ্! আরেকটু হলে...' থেমে গেল মেয়েটি কথা অসমাপ্ত রেখে।

ছাদে আলো ধরল হেকমত আলি। 'ওই দেখুন,' বলে নিজেই চমকে উঠল। 'ওরে বাবা, এ যে দেখছি হাজার হাজার!'

দেখল মেয়েটি। সত্যিই তাই। হাজার হাজার ধূসর, ছোট্ট বাদুড়। সাধারণের চাইতে একটু বড় সাইজের প্রজাপতির মত।

'তালগাছ মার্কার বাদুড়ের ভয় দেখে ওরাও ভয় পেয়েছে,' হেসে উঠে খোঁচা লাগাল হেকমত। 'খুব ভীতু তো!'

দু'কান গরম হয়ে উঠল করপোরালের, বুঝে ফেলল কথাটা কাকে উদ্দেশ করে বলেছে সে। ব্যাটা নিশ্চয়ই তার চমকে ওঠা দেখে ফেলেছে। চাপা ধমক লাগাল। 'এই! জোরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে না?'

যূথী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে মাথায়, চুলে বসা কাল্পনিক বাদুড় খুঁজছে। পিছন থেকে আলো জ্বেলে ওকে সাহায্য করল সদরউদ্দিন, তারপর ঘোষণা করল, 'কই, নেই তো দেখি!'

'ঠিক তো?' হাত থেমে গেল ওর।

'আরে বাবা হ্যাঁ, ঠিক! চলুন।'

টানা আধ ঘণ্টা চলার পর আবার দিনের আলোর দেখা পেল ওরা। প্রথম ওয়েল শ্যাফট দিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সবার বুক থেকে একটা করে ভারী পাথর সরে গেল যেন। 'বাঁচলাম!' যূথী বলল বিড়বিড় করে।

আলো দেখে গতি কমিয়ে দিল রানা। সবাইকে নিঃশব্দে চলার নির্দেশ দিয়ে নজর ওপরে রেখে এগোল। একজন একজন করে শ্যাফট পেরিয়ে গেল দলটা, কোন বাধা এল না। ওটার কাছের দেয়ালে এক ছোট গর্ত দেখে আলো জ্বেলে উঁকি দিল হেকমত আলি। ভেতরে নিজের বাসায় ডিমে তা দিচ্ছিল এক খঞ্জনা, ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল মানুষের সাড়া পেয়ে।

দেখতে দেখতে পিছিয়ে গেল টানেল, আবার গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদের। ক্ষণিকের স্বস্তি উবে গেল। পানির গভীরতা এরপর থেকে দেখা গেল বেশ দ্রুত বাড়ছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কোমর পর্যন্ত উঠে এল সবার, যূথীর বুক পর্যন্ত। এক এক করে আরও চার-পাঁচটা শ্যাফট অতিক্রম করল ওরা, তবে পরের কয়েকটায় অন্যগুলোর মত আলোর জোর ছিল না। বেশ ওপরে ওগুলোর মুখ, পাহাড়ে। প্রতিটা আগেরটার চাইতে আরও, আরও

উঁচুতে। ক্ষীণ যে আলো আসে, তাতে আঁধার সামান্য ফিকে হয় কেবল, দূর হয় না। প্রতি পদক্ষেপে পাহাড়ের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছে ওরা।

আরও এক ঘণ্টা পর প্রথম সত্যিকারের বাধা দেখা দিল দলের সামনে। পানি আরও বেড়েছে এরমধ্যে। কথা নেই-বার্তা নেই, হঠাৎ সিলিং ঝপ্ করে পানির নিচে নেমে গেছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল জাফর। চেহারা বিকৃত করে পা বাড়াল, কিন্তু মেঝের খোঁজ পেল না। লোকটা বেসামাল হয়ে পড়ছে দেখে থাবা দিয়ে তার কলার চেপে ধরে ঠেকাল রানা।

'সাবধান। বুঝে হাঁটো।'

'এবার মনে হয় পাতালে যেতে হবে, বস্।'

দু'জনে মিলে পরীক্ষা করে দেখল টানেল কম করেও ফুট তিনেক পানির নিচে তলিয়ে আছে, ডুব দিয়ে এগোনো ছাড়া উপায় নেই। তাই করতে হলো। প্রচুর সময় আর এনার্জি নষ্ট হলো সবার। সময় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ল মাসুদ রানা। এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছে দল, তার ওপর এত সমস্যা, কতক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছবে কে জানে!

ভেজা কাপড়ের অস্বস্তিকর অনুভূতি ভুলে থাকার চেষ্টা করে আবার পা চালাল ওরা। পরের শ্যাফট নিরাপদে অতিক্রম করল সারির মাথা, তার পরেরটায় ঘটল বিপদটা। হেকমত আলি বিপদের সূত্র প্রথম দেখল।

একটা মাথা উঁকি দিচ্ছে, শ্যাফটের রিমের ওপর শুয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে নিচে। রিম এত ওপরে যে ওটা এখানকার গ্রাম্য শিশু-কিশোরের মাথা না ট্রুপারদের কারও, বোঝা গেল না। বাচ্চাদের খেলার অংশ, না শিকারের, তাও না। তবে নিশ্চিত হতে বেশি দেরি লাগল না, আচমকা একটা হাত ভেতরে ঢিলের মত

কিছু ফেলতেই যা বোঝার বুঝে নিল।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে উঠল সে আতঙ্কিত গলায়, পরমুহূর্তে পিছন থেকে জোর এক ধাক্কা মেরে সদরউদ্দিনকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেও লাফ দিল। কিন্তু পানি গভীর বলে দুই কদমের বেশি এগোতে পারল না। পিছনে থ্যাপ্ থ্যাপ্ আওয়াজ উঠল দু'বার, নামার পথে শ্যাফটের দেয়ালে বাউন্স করেছে গ্রেনেড, তারপরই ভীষণভাবে দুলে উঠল পৃথিবী।

বদ্ধ জায়গায় বিস্ফোরণের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড় হলো সবার, শকওয়েভের ধাক্কায় স্থানচ্যুত বাতাস পিছন থেকে নিরেট দেয়ালের মত আছড়ে পড়ল ওদের পিঠের ওপর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সবাই। ধোঁয়া, পাথুরে মাটির টুকরো আর শ্রাপনেল উড়ে বেড়াতে থাকল অন্ধকার টানেলে।

ধাতব কিছু একটা ছুটে এসে আছড়ে পড়ল হেকমতের ডান হাঁটুর পিছনে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। ওদিকে অনেক কষ্টে ধাক্কা সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সদরউদ্দিন, পিছনে টানেল রুফ টুকরো টুকরো হয়ে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে দেখে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ হুঁশ হতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে হেকমতকে উদ্ধার করতে, ওর কলার মুঠো করে ধরে উন্মত্তের মত টানতে টানতে সামনের দিকে ছোটার চেষ্টা করল।

সারির মাথা তার আগেই বাঁক ঘুরে আড়ালে চলে গিয়েছিল, শক্ওয়েভের ধাক্কা সামলে ঘুরে পিছনদিকে দৌড়ে এল রানা অন্ধের মত। পুরু ধুলোর মেঘ আড়াল করে রেখেছে সব, আলো জ্বেলেও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মুখ ভরা ধুলো, দম নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে এখনই বুক ফেটে মরে যাবে বুঝি। চোখের মধ্যে একগাদা বালি গিয়ে আরও সমস্যায় ফেলে দিল ওকে।

'তোমরা ঠিক আছ?' সামনের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল ও, চট্ করে একটা ডুব দিয়ে নজর মোটামুটি পরিষ্কার করে নিল। 'লেগেছে কারও?'

সাহায্য করার জন্যে যূথী ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সরিয়ে দিল রানা। আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এই সময় সামনের কোথাও থেকে আরেক গুরুগম্ভীর গর্জন ভেসে এল। থর থর করে কেঁপে উঠল টানেল, ছাদ খসে খসে পড়তে লাগল।

ধুলো গলায় ঢুকে পড়ায় খক্ খক্ করে কেশে উঠল সাংবাদিক, বিস্ফারিত চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার জোগাড়। 'আবার গ্রেনেড!'

উত্তর দিল না কেউ, ধুলোর মেঘের মধ্যে থেকে রানাকে বের হতে দেখে সন্ত্রস্ত সদরউদ্দিন বলে উঠল, 'ওরা আমাদের জ্যান্ত কবর দিতে চাইছে, মাসুদ ভাই!' নিজের একমাত্র ফোবিয়ার মুখোমুখি হয়ে আত্মা উড়ে গেছে লোকটার। সব ফেলে ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে।

'কেউ চোট পেয়েছ?' তার মন্তব্য না শোনার ভান করল ও।

'হে-হেকমত আলি পেয়েছে,' জবাব দিল যূথী। লোকটার আরেক হাত ধরে রেখেছে সে। 'সামনের অবস্থা কি?'

'জানি না' বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মুখ খুলেও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। কারণ না দেখলেও বুঝতে পারছে সামনে কি ঘটেছে। মাটি ধসে টানেল বুজে গেছে। পানি চলছে না, স্থির হয়ে আছে। দুই দেয়াল আর ছাদের মাটি খসে পড়ায় টানেল অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে। পুরু ধুলো জমে আছে সারফেসে। গলে কাদা হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

ওদিকে হেকমত আলি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করছে। কম করেও এক গ্যালন পানি খেয়ে

সাত

অনেক রাত। আরব ও ওমান উপসাগরের মাঝামাঝি গভীর সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে চলছে বিএনএস আলমগীর। প্রকাণ্ড একেকটা ঢেউ, খোলের গায়ে বাড়ি খেয়ে সজোরে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, পানি ছিটকে উঠে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পুরো ডেক। কোথাও কোন আলো নেই, মিশমিশে কালো আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে ইরান-পাকিস্তান বর্ডারের দিকে নয় নট গতিতে ছুটে চলেছে ওটা।

হুইল হাউসে রাডার স্ক্রীনের গাঢ় সবুজ আলোয় চারটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। মাঝবয়সী, অভিজ্ঞ কমান্ডার রেজাউল হক, থ্যান্ডারবোল্টের সাহায্যকারী, স্ট্যান্ড-বাই টীমের ক্যাপ্টেন কামাল ও সার্জেন্ট হুমায়ুন কবির এবং রাডার অপারেটরের। শেষেরজন বাদে আর সবার নজর সামনে সেঁটে আছে। একটু আগে একটা ইরানী টহল বোটের অবস্থান ধরা পড়েছে রাডারে, ওটা এদিকেই আসে কি না দেখার চেষ্টা করছে।

রেজাউল হকের অবশ্য তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই। একদম স্বাভাবিক সে, আচরণ দেখে মনেই হয় না দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আছে, অন্য দেশের পানি সীমায়, চোখে পড়ে গেলে জবাবদিহি করতে হতে পারে। বরং যেন ফয়েজ লেকে নৌকা বেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন ভাব তার।

এর অবশ্য কারণও আছে। কয়েক মাস আগে সুইডেন থেকে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর তৈরি করিয়ে আনা বিশেষ দুই রণতরীর একটা বিএনএস আলমগীর। সবদিক থেকেই স্পেশাল। নিতান্ত গোবেচারা চেহারা। ওপরে ছেঁড়াখোঁড়া ত্রিপল টাঙানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ওসব টাঙালে হতচ্ছাড়া চেহারার ফিশিং বোট ছাড়া ওটাকে অন্য কিছু মনে হবে না। কেউ ধারণাই করতে পারবে না আলমগীরের হর্সপাওয়ার যে কোন অত্যাধুনিক রণতরীর সমান, এবং তার এক্সোসেট শিপ-টু-শিপ মিজাইলের বিধ্বংসী ক্ষমতা অবিশ্বাস্য।

প্রয়োজন নেই, তাই ধীরগতিতে এগোচ্ছে আলমগীর। পাকিস্তান বা ইরান, কারও টহল বোট যদি টের পায় তার উপস্থিতি, মাছ ধরার ট্রলার ছাড়া কিছু ভাবার কথা মনে ঠাঁই দেবে না। এই এলাকায় ফিশিং বোটের জন্যে নয় নট সর্বোচ্চ গতি। কাজেই দূর থেকে কেউ মিজাইল ছোঁড়ার আগে ব্যাপারটা অবশ্যই

বিবেচনা করে দেখবে। তাই এত নিশ্চিন্ত সে।

'আবহাওয়ার কি অবস্থা?' প্রশ্ন করল কামাল।

'এমনিতে ভাল না, তবে আপনাদের জন্যে ভাল,' জবাব দিল কমান্ডার হক। 'গ্লাস কেবলই নামছে। কাল দুপুরের মধ্যে মেঘে ঢেকে যাবে আকাশ, রাতে ঝড়বৃষ্টি হবে।'

মাথা দোলাল কামাল। খারাপ ওয়েদার ওদের জন্যে বোনাস পাওনা হবে। বাকি কাজ নির্বিঘ্নে সারা যাবে। 'আর কত সময় আছে?'

'আধ ঘণ্টা। আধঘণ্টা পর পাক-ইরান কোস্টাল রাডার রেঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছব আমরা।'

'আমরা তাহলে বাকি কাজ সেরে ফেলি গিয়ে।'

'হ্যাঁ। তৈরি হয়ে গ্যালিতে আসুন, আপনাদের জন্যে ফেয়ারওয়েল পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল সে। 'আচ্ছা।' হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে দ্রুত এগোল আফটার ডেকের দিকে। সার্জেন্ট কবির নীরবে অনুসরণ করছে তাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে অনিশ্চিত অভিযানে যেতে হবে, চিন্তাটা রক্ত গরম করে তুলেছে দু'জনেরই।

উপকূলের ষাট মাইল দূরে ওদের নামিয়ে দেবে বিএনএস আলমগীর, ওখান থেকে দুটো রিজিড রেইডার অ্যাসল্ট ক্র্যাফটে চড়ে পাকিস্তানের গদার যাবে ওরা 'সাইট সীয়িঙে'। ঢেউয়ের জন্যে সময় কিছু বেশি লাগবে, তবে দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা, তাতে অসুবিধে হবে না। গদার মোটামুটি নামকরা ট্যুরিস্ট স্পট। সময়টা ট্যুরিজমের উপযুক্ত নয় অবশ্য, কিন্তু তাতে কি? কূটনীতিকরা যদি অসময়ে ট্যুরে যেতে চায়, কে বাধা দিতে যাবে?

গতকালই চার বাংলাদেশী কূটনীতিক গদার এসেছে। ওখান থেকে চাগাল পাহাড় দেখতে যাবে আরও কয়েকটা দর্শনীয় স্পট

ঘুরে। যাবে ঠিকই, তবে তারা নয়, এরা। রাতের আঁধারে অদল-বদল হবে দলটা, 'কূটনীতিকরা' গভীর রাতে মোটেল ছেড়ে বের হবে পরের গন্তব্যে যাওয়ার জন্যে। সেটা হচ্ছে সী বীচ। অ্যাসল্ট ক্র্যাফটে চড়ে আলমগীরে এসে উঠবে তারা, 'অপারেশন উদ্ধারের' চার সদস্য যাবে তাদের পথে।

কাগজপত্রসহ সমস্ত আয়োজন করা আছে, কোন অসুবিধে নেই। অসুবিধে হলে হবে গার্ডপোস্ট অফিশিয়ালদের। কাল গদার এল এক চেহারার চার কূটনীতিক, আজ ফিরে যাচ্ছে অন্য চেহারার চারজন, অথচ কাগজপত্র একই আছে, এই নিয়ে হয়তো সামান্য দ্বিধায় পড়তে পারে ওরা। এর বেশি কিছু ঘটার কোন চান্সই নেই–'কূটনীতিক' বলে কথা।

সন্দেহ হলেও ওপরের মহলে জানাতে পারবে না কেউ, তাহলে হয়তো বিরক্তির সাথে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হতে পারে।

প্রস্তুতি, সংক্ষিপ্ত পার্টি এবং বিদায়পর্ব সেরে দোদুল্যমান দুই লো-প্রোফাইল গ্লাস ফাইবার ক্র্যাফটে উঠে বসল দল ভাগ ভাগ হয়ে। সঙ্গে বিএনএস আলমগীরের দুই নাবিক, এদের পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষমাণ দলটাকে ফিরিয়ে আনবে তারা। স্টার্ট নিল দুই শক্তিশালী ৪০ হর্সপাওয়ারের এভিনরুড এঞ্জিন, কালো রাবার স্যুট আর ইমেজ ইনটেন্সিফাইয়ার পরা চার সদস্যের দলটাকে নিয়ে মুহূর্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

একটায় আছে ক্যাপ্টেন কামাল ও করপোরাল আহসান হাবিব, অন্যটায় সার্জেন্ট হুমায়ুন কবির ও করপোরাল মইনুল হোসেন। রাত তখন ঠিক একটা।

আকাশে একটু আগেও প্রচুর তারা ছিল, এখন নেই। তার মানে মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। ভাল, মনে মনে বলল ক্যাপ্টেন

কামাল। ঝড়-বৃষ্টি যত তাড়াতাড়ি শুরু হয়, যত বেশি সময় চলে, ততই সুবিধে।

হেকমত আলির দিকে এগোল মাসুদ রানা। টর্চের আলোয় তার ক্ষত দেখে আঘাত বোঝার চেষ্টা করল। 'কি অবস্থা?' প্রশ্নটা জাহাঙ্গীরকে করল। 'মারাত্মক নয় তো?'

মাথা দোলাল সে। 'জ্বি না। এক টুকরো শ্রাপনেল ঢুকেছে। কিন্তু এখানে বসে কিছু করার উপায় নেই।'

'জাফর, সদরউদ্দিন, সামনে যাও। মাটি সরিয়ে বের হওয়ার রাস্তা করো। তাড়াতাড়ি বেরুতে হতে হবে, পানি বেড়ে যাচ্ছে।'

সবাই খেয়াল করল ব্যাপারটা–সত্যি তাই। সামনের দেয়ালে বাধা পেয়ে কিছু সময়ের জন্যে থমকে গিয়েছিল পানি, তারপর পিছিয়ে এসে সমান হয়েছে। কম করেও চার ইঞ্চি বেড়ে গেছে দেখতে দেখতে।

ওদের চলে যেতে দেখল যূথী, তারপর রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে চেহারায় রানার দিকে ফিরল। 'বেরুতে পারব আমরা?'

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বলল ও, যদিও চেহারা বলল অন্য কিছু। দুশ্চিন্তার মেঘে ছেয়ে আছে। খেয়াল করেছে, এরইমধ্যে ভেতরের বাতাস বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। আগের মত সহজে দম নিতে পারছে না। 'চলুন, সামনে যাই। ওদের খোঁড়া মাটি সরাতে সাহায্য করতে হবে।'

ওদিকে সঙ্গের এনট্রেঞ্চিং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে পড়েছে জাহাঙ্গীর। জায়গা অল্প বলে সদরউদ্দিন একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, নরম মাটি সরিয়ে পথ তৈরিতে সাহায্য করছে তাকে। মিনিট দশেকের মধ্যে ফুট দেড়েক ডায়ার গর্ত তৈরি হয়ে গেল, একজন মানুষের জন্যে যথেষ্ট। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে শুরু করল

ভেতরে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল সবার।

টর্চলাইট জ্বেলে গর্ত দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল জাহাঙ্গীর, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল পরিস্থিতি বোঝার জন্যে।

'কেমন দেখছ?' অধৈর্য গলায় বলল সদরউদ্দিন। তার ভয় হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে গোটা টানেলই হয়তো ধসে পড়বে।

'টানেল শ্যাফট নয়,' বিড়বিড় করে জবাব দিল সে। 'দু'দিকের দেয়াল কোলাপস করেছে এদিকে...মনে হচ্ছে। বাই-পাস গোছের...হ্যাঁ, তাই। তবে চিন্তার কিছু নেই, যাওয়া যাবে। অবশ্য দেয়ালের অবস্থা সুবিধের নয়, আরেকটা ডিম পড়লে সবার কবর হয়ে যেতে পারে।'

'দেখি, আমাকে দেখতে দাও,' বলল মাসুদ রানা। জাহাঙ্গীর সরে দাঁড়াতে উঁকি দিল। 'চলবে। তবে শব্দ করা যাবে না, আস্তে ধীরে যেতে হবে।'

বেশ সময় লাগল ওদের বেরিয়ে আসতে। কাদা মেখে ভূত হয়ে আবার এগোল সবাই। হেকমত আলি আলালউদ্দিনের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। পিছিয়ে পড়ছে ওরা। খানিকটা যেতে ধসে পড়া মাটির উঁচু এক ঢিপি জেগে আছে দেখে থেমে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাল রানা। 'এখানে বসে ওর ইনজুরি চেক্ করে নাও।'

তাই করল সে। আলো জ্বেলে মিনিট দুয়েক ক্ষতস্থান দেখে মাথা দোলাল। 'একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে মনে হয়। স্টীল ফ্র্যাগমেন্ট ভেতরে রয়ে গেছে, তবে ভয়ের কিছু নেই। হাসল ঠোঁট টিপে। 'ওর বউকে শর্ট কোর্স নার্সিং শিখে রাখার জন্যে মেসেজ পাঠালে ভাল হত, বস্। ও প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে কাজে লাগত।

'এই ব্যাটা, হাতুড়ে!' খেঁকিয়ে উঠল হেকমত। 'বকবক বন্ধ

করে কাজে হাত লাগাও দয়া করে।' সদরউদ্দিনের দিকে ফিরল। 'ঠিক সময় মত আমাকে সরিয়ে আনার জন্যে ধন্যবাদ, মেট। নইলে মাটি চাপা পড়ে মরতে হত আজ।'

বিব্রত দেখাল করপোরালকে। পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর ক্ষত বাঁধতে শুরু করে দেয়ায় থেমে গেল, ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে ট্রুপারের চেহারা। দশ মিনিট পর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল নার্স। 'চলবে আপাতত।'

ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এ ছাড়া উপায়ও নেই। পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। থেমে থাকলেও বিপদ, আর দুয়েকটা গ্রেনেড যদি ফেলে ওরা, মাটি ধসে গোটা টানেল বুজে যেতে পারে। তাহলে তিনশো ফুট মাটির নিচে কবর হয়ে যাবে সবার।

মোটামুটি নিরাপদেই এগোল ওরা পথের কঠিন এক বাধা ছাড়া। টানেল এক জায়গায় একেবারে বন্ধ দেখে থমকে গিয়েছিল দল। সামনে পথ একেবারেই নেই। খুঁজেপেতে সারফেসের দু'ফুট নিচে ওটাকে আবিষ্কার করল আলালউদ্দিন। আগে নিশ্চই কখনও ধস নেমেছিল এখানটায়, টানেল বুজে গিয়েছিল, পরে ঠিকমত মেরামত করা হয়নি। দেড় ফুটের মত চওড়া পথ ওখানে।

সে-ই নেতৃত্ব দিল। কোমরে দড়ি বেঁধে পুরো এক মিনিট ডুব সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছল, তারপর এক এক করে অন্যরা। যূথীর বেলায় বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিছুতেই ডুব দেবে না ও। দিলেই মরে যাবে বলে ভয় পাচ্ছিল। সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে কঠোর হলো রানা, একটানে ওকে পানির নিচে এনে ঠেলে পাঠিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। বাকিটা সেরেছে ওপাশে দড়ি ধরে থাকা সদরউদ্দিন, টেনে নিয়ে গেছে। সবার শেষে এল রানা।

'সবাই চুপ!' চাপা গলায় সতর্ক করল ও। 'সামনের টানেল

শ্যাফটে লোক থাকতে পারে, সামান্য আওয়াজও শুনে ফেলতে পারে। কোন শব্দ নয়। সাপের কামড় খেলেও কেউ চ্যাঁচাবে না, হজম করে নেবে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সবাই। টেনশন বাড়তে লাগল। সামনে আলোর আভাস দেখে এক পা এক পা করে এগোল দল, এবার রানা ও আলাল থাকল আগে। শ্যাফটের নিচে পৌঁছে সাবধানে উঁকি দিল ওরা। কম করেও তিনশো ফুট দীর্ঘ হবে ওটা, রানা অনুমান করল। বেশ সরু। আধুলি সাইজের নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে ওপরে। তার মানে মেঘ কেটে গেছে।

এক মিনিট নিচু গলায় কথা বলল রানা সঙ্গীদের সাথে, দুয়েকটা নির্দেশ দিল, তারপর তৈরি হয়ে নিল। সদরউদ্দিনের কাঁধে ভর রেখে শ্যাফটে মাথা গলিয়ে দিল, দেয়ালের দু'দিকে উপযুক্ত জায়গা দেখে পা বাধিয়ে দক্ষতার সাথে উঠে যেতে লাগল এক ফুট-দু'ফুট করে।

কিছুদূর উঠে থামে, ওর কোমরে বাঁধা ইন্টারলিঙ্কড্ টগল রোপের সাথে নিচ থেকে নতুন অংশ জুড়ে দেয় আলাল তুঁত গাছের কয়েকটা করে অ্যাঙ্গেল জয়েন্টসহ, ওগুলো তুলে দেয়ালে গেঁথে পা রাখার হোল্ড তৈরি করে রানা, তারপর আবার ওঠে। ডালগুলো পালা করে বয়ে আনতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে প্রায় সবার, এখন তা কাজে লাগছে। টানেল বেয়ে ওঠার চমৎকার নিরাপদ রাস্তা তৈরি হচ্ছে ওগুলো দিয়ে। যে কোন অনভিজ্ঞ ক্লাইম্বারও এখন উঠে যেতে পারবে অনায়াসে।

শেষের দিকে আগের তুলনায় বহুগুণ সতর্ক হলো ও। আর মাত্র বিশ ফুট উঠলেই হলো। মাথার ওপরে ঝকঝক করছে আকাশ। অন্ধকার থেকে উঠে আসায় এত আলো সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছিল প্রথমদিকে, এখন অবশ্য চোখ সয়ে গেছে। ওপরের পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে এখন রানা। দাঁতের ফাঁকে কামড়ে

ধরে আছে কমান্ডো ছুরি।

ওপরে কি শ্যাফটের পাহারায় আছে আফগান ট্রুপাররা? ভাবছে ও, কতজন? কি করছে ব্যাটারা, ঝিমাচ্ছে? নইলে এতক্ষণ হয়ে গেল একবারও উঁকি দিল না কেন? নাকি নেই কেউ? ঠিক তখনই নাকে গন্ধটা পৌঁছল। ঘামের গন্ধ! বেশ প্রকট। তারমানে কাছেপিঠেই আছে ব্যাটারা। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল ও, ভয়ের শীতল একটা ধারা বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

আরও সাবধানে, প্রচুর সময় নিয়ে পরের অ্যাঙ্গেল জয়েন্ট সেট করল রানা, তার ওপর উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে। এতক্ষণ যখন উঁকি দিস্‌নি, ভাইয়েরা, মনে মনে বলল, আরেকটু ধৈর্য ধরে থাক্। এখন ওসব করলে আমি বিপদে পড়ে যাব। আর কয়েক মিনিট আরাম কর।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ওরা চাষীও তো হতে পারে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিচ্ছে! তাই হবে, প্রায় নিশ্চিত হলো রানা, নিশ্চয়ই তাই। ট্রুপার হলে এতক্ষণ হয়ে গেল অথচ গলা বাড়িয়ে ভেতরটা একবার দেখল না পর্যন্ত, এ কেমন কথা? পুরো নিশ্চিত হতে যাচ্ছিল রানা, এমনসময় ওর আস্থার গালে কষে এক চড় মারল বাতাস। সস্তা সিগারেটের সাথে আরও একটা বিশেষ গন্ধ এল নাকে, সেটা গ্রাফাইট তেলের। গান অয়েল!

একদম তাজা গন্ধ। তার মানে খুব সম্প্রতি অয়েলিং করা হয়েছে ওটায়, নাকি ওগুলোয়? পরেরটা, আপনমনে বলল রানা চাপা হাসির শব্দ শুনে। অন্তত দু'জন আছে ব্যাটারা। একজন হলে হাসত না। পরের ধাপে উঠল ও, দেহের পেশী টানটান হয়ে উঠছে ক্রমে। আরও উঠল। পৌঁছে গেল শ্যাফটের কিনারায়। এখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেই বাইরে দেখতে পাবে।

মাথায় পেঁচিয়ে বাঁধা ক্যামোফ্লেজড্ ব্যানডানা ঠিক করে নিল রানা, এক চুল এক চুল করে উঁচু হলো। মাথা পিছনে ঝুলিয়ে রেখে আগে নাক জাগাল। চারদিকে এক পলক নজর বুলিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। স্থির হয়ে মনের চোখে কি ধরা পড়েছে তাই ভাবতে লাগল।

চোখ ধাঁধানো আলো, ঊষর এক পাহাড়ী ঢাল, মাঝ দুপুরের উত্তাপের কাঁপা ধোঁয়া দেখেছে ও। শ্যাফটের মুখের একপাশে প্রকাণ্ড এক ববিন, ওটার আড়ার সাথে ছাগলের চামড়ার তৈরি বড় একটা ব্যাগও আছে। ক্যানাল থেকে কুয়োর মত পানি তোলা হয় ওটা দিয়ে। বাতাস প্রায় নেই। আকাশ নীলের তুলনায় সাদা বেশি। আর কি? ও হ্যাঁ, নিজের নাকের ডগা।

আবার মাথা তুলল ও, এবার এক ইঞ্চি বেশি। এবং দেখা পেল ওদের। দু'জন, এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে। নজর নিচে, দূরের নদীর উপত্যকায়। ওদিকের কয়েকশো গজ দূরে আরেক শ্যাফট ওয়েল ঘিরে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে। ওটা দিয়েই দ্বিতীয় গ্রেনেড ফেলা হয়েছিল। বেশ দূরে, তাছাড়া ওদিকে বেশ কিছু গাছ আছে বলে পরিষ্কার দেখা যায় না, তবে রানার মনে হলো ওই শ্যাফট দিয়ে লোক নামানো হয়েছে বিস্ফোরণের ফলাফল দেখতে। এরা সেদিকেই চেয়ে আছে।

আরেকটু উঠল রানা। ছুরি খাপে রেখে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করল। তারপর শিকারি চিতার মত ওয়েল মুখের বাঁধানো পাথরের পাড় টপ্‌কে বাইরে চলে এল। এখন বুঝতে পারছে ব্যাটারা কেন এতক্ষণ নড়েনি। এরা ধরেই নিয়েছিল আগের শ্যাফট দিয়ে ছোঁড়া গ্রেনেডেই কাজ হয়ে গেছে, কাজেই এটায় নজর রেখে লাভ কি?

বসে এক পা এগোল ও, পরক্ষণে থেমে গেল, আঁতকে উঠল

মনে মনে। ওর চার হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যামোফ্লেজড্ চামড়ার বড় এক গিরগিটি, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সরসর আওয়াজ তুলে দৌড়ে গেল ওকে দেখে। রানা ভাবছিল এখনই ঘুরে তাকাবে দুই ট্রুপার। কিন্তু না, গল্পে এত মগ্ন যে ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি।

আবার এগোবার আগে সামনে, দুদিকে, ভাল করে দেখে নিল ও আর কিছু আছে কি না। নেই। ওয়ালথার তুলল ডানদিকের ট্রুপারের মাথা সই করে। দুপ্!

বুলেটের ধাক্কায় সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। এমনভাবে পড়ল, মনে হলো কেউ লাথি মেরেছে মাথায়। আধ সেকেন্ডের জন্যে তার সঙ্গী ভাবল জ্ঞান হারিয়েছে বুঝি সে। হাত বাড়িয়ে গড়িয়ে পড়া দেহটা ধরতে যাচ্ছিল, পিছনদিকের চুরমার হওয়া খুলি দেখে আঁতকে উঠে থেমে গেল। ঘুরে তাকাল ঝট্ করে। আবার দুপ্।

এর ঠিক দুই চোখের মাঝখানে গিয়ে ঢুকল বুলেট, বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে যাচ্ছে মানুষটা। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সুযোগ হলো না রানার, একটা ক্যানকেনে আওয়াজ কানে আসতে এদিক-ওদিক তাকাল। চোখ পড়ল প্রথম গার্ডের শিথিল ডান হাতের দিকে। একটা ওয়াকি-টকি।

কেউ কথা বলছে ওটায়। এদের ডাকছে হয়তো। বিস্ফারিত চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সর্বনাশ! এখন কি হবে? কেউ যদি সাড়া না দেয়, নিশ্চয়ই ট্রুপার পাঠানো হবে এখানকার পরিস্থিতি দেখার জন্যে। সে ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে ফাঁস হয়ে যাবে ঘটনা, হয়তো নিচের ওরা সবাই উঠে আসার চান্সও পাবে না। কি করা যায়? ও কথা বলবে?

কিন্তু কি বলবে? যদি কোন পাসওয়ার্ড থেকে থাকে, পয়লা

চোটেই তো ধরা পড়ে যাবে, তখন? ওদিকে বক্তা চিৎকার করতে শুরু করেছে তখন ওটায়। উপায় নেই দেখে জিনিসটা তুলে নিল রানা, কথা না বলে খক্ খক্ করে কেশে উঠল। পরমুহূর্তে চোখমুখ কোঁচকাল মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারের মত জঘন্য গালাগালির তুবড়ি শুনে। প্রত্যেকটাই ছাপার অযোগ্য গাল। দুনিয়ার নোংরা।

'...কে রে তুই? নাম্বার কত?' স্টক ফুরিয়ে যেতে প্রশ্ন করল মোটা গলার কলার।

আসল জবাব এড়িয়ে মিনমিনে গলায় রানা বলল, 'পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিলাম, স্যার। দুঃখিত...'

'একসঙ্গে দুটোকেই মুতে ধরেছিল নাকি, হারামজাদারা!' খেঁকিয়ে উঠল মানুষটা। 'আরেকটা কোথায়?'

'স্যার, ও-ও পেচ্ছাপ...'

'উহ্! কী যন্ত্রণায় যে পড়েছি শুয়োরের পাল নিয়ে!' কিছু সময় কথা নেই। 'খবর কি তোমাদের শ্যাফটের?'

'কোন খবর নেই, স্যার। কারও দেখা নেই। মনে হয় গ্রেনেডে মরেছে সব।'

'কিছুই হয়নি ওদের,' বেশ কিছুক্ষণ পর থমথমে গলায় বলল লোকটা। 'একটা লাশও পাইনি আমরা এদিকে।' আবার বিরতি। 'কড়া নজর রাখো। টানেল দিয়ে লোক যাচ্ছে। ভেতরে থেকে থাকলে তাড়া খেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে ব্যাটারা।'

দাঁত বের করে হাসল ও নিঃশব্দে। 'কিচ্ছু চিন্তা করবেন্ না, স্যার। এখন আমরা রেডি, কেউ মাথা তুললেই একদম ইয়ে করে দেব।'

অফ হয়ে গেল ওয়াকি-টকি। ফাঁকি দেয়া গেছে বুঝে আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল রানা। যদি বুঝত কলার ছিল স্বয়ং

কর্নেল মুরাদ, এবং সে ওকে সন্দেহ করে বসেছে, তাহলে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে ঘিলু গরম হয়ে উঠত।

বেশি কথা বলতে গিয়ে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ও কর্নেলকে। এদিকে গ্রেনেড ফেলা হচ্ছে, তা ওদিকের পোস্টের গার্ডরা কেউ জানে না, জানানো হয়নি। ও জানল কি করে? তাই নিয়ে এইডের সাথে কথা বলছে সে এই মুহূর্তে।

নওযাদ পৌঁছল সার্জেন্ট শহীদের 'রিকুইজিশন' করা লরি। এখান থেকে যাবে কালাবিস্ত, তারপর রেজিস্তান।

এরমধ্যে পিছনের নতুন রিক্রুটদের গগনবিদারী ইরান বিরোধী শ্লোগানে মাথা ধরে গেছে দু'জনেরই। মেইন রাস্তা সংলগ্ন এক রেস্টুরেন্টে গাঁটের পয়সা খরচ করে ওদের চা-নাস্তা খাওয়াল শহীদ। নিজেরাও খেল।

দোকানের মালিক এক হাড় সর্বস্ব পাঠান। হাসে কথায় কথায়। হাসি দেখলে মনে হয় দু'পাটি দাঁত ছাড়া ব্যাটার কিছু নেই।

'আমিও যাব তোমাদের সাথে,' শহীদকে বলল সে। এত স্বেচ্ছাসেবী দেখে তারও দেশপ্রেম উথলে উঠেছে হঠাৎ করে। 'লড়াই করব। ইরানী কুকুরদের গুলি করে মারব। দেশের জন্যে খুশি মনে প্রাণ দেব।'

'যাওয়া উচিত,' মৃদু হেসে জবাব দিল ও। 'দেশের এই দুর্দিনে তোমাদের মত বীরদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।' গোবরগণেশের দল, মনে মনে বলল, জেনারেল প্যাটনের বিখ্যাত উক্তি, 'দেশের জন্যে নিজে আত্মাহুতি দিয়ো না, অন্যদের দিতে দাও' শোনেনি নিশ্চয়ই এরা।

দারুণ হুজুগে জাতি আফগানরা। লড়াই এখনও বাধেনি,

ইরান বলছে মহড়ার জন্যে সীমান্তে সৈন্য জড়ো করা হয়েছে, অথচ এরা সবাই এরইমধ্যে মনে মনে কয়েক ডজন করে ইরানী মেরে বসে আছে।

একটু পর গাড়ি ছাড়ল শহীদ। শেষ পর্যন্ত দেঁতো পাঠানের দেশপ্রেমে বোধহয় ভাটা পড়েছিল, অথবা আরও কোন জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, তাই আসেনি সে। লরি চলছে, সার্জেন্ট চিন্তিত মনে সিগারেট টানছে। ওদিকে হামিদা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। মন খারাপ।

'আর বোধহয় কোনদিন দেশে ফেরা হবে না,' এক সময় বলল সে চাদরে চোখ মুছে। 'ওরা নিশ্চই আমার মা-বড় বোনকে মেরে ফেলেছে এতক্ষণে।'

'শুধু শুধু মন খারাপ করছেন আপনি,' সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল সার্জেন্ট। 'ওরা তা করবে বলে মনে হয় না। নিশ্চই আপনার ভাইয়ের ব্যাপারটা বিবেচনা করবে ওরা।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'কি জানি!'

'আমি বুঝি। বাসার সবার জন্যে, জালালের জন্যে, মন দুর্বল হয়ে আছে আপনার। তারচেয়ে বরং এখন ওসব চিন্তা ছেড়ে অন্য কিছু ভাবুন, নিজের ছেলেবেলার গল্প শোনান আমাকে। দেখবেন, ভাল লাগবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। তারপর প্রায় বিড়বিড় করে বলল, 'মা-বোনের জন্যে খারাপ লাগছে আমার, কিন্তু জালালের জন্যে নয়।'

'মানে?' বিস্মিত হলো সার্জেন্ট।

'ওর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ার পর থেকেই নতুন এক চিন্তা এসেছে আমার মনে।'

'কি?'

'আমার ভালবাসা একতরফা ছিল। ও আমাকে ভালবাসত না। তবে ভাববেন না যে জালাল ধরা পড়ায় আমি দুঃখ পাইনি, পেয়েছি। খুব খারাপ লাগছে আমার ওর জন্যে। কিন্তু...আসলে...'

মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল শহীদ, তারপর ড্রাইভিঙে নজর দিল। 'আপনি ঠিক জানেন জালাল ভালবাসত না আপনাকে?'

'হ্যাঁ। এখন জানি। আসলে ও আমার সাথে যেটুকু ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তা শুধু ওর স্বার্থের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমিও সেধেই সাহায্য করেছি ওকে, কিন্তু তখন ওর প্রেমে এত অন্ধ ছিলাম যে ভেতরের চিন্তা মাথায়ই আসেনি। ও কখনও আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলেনি, অথচ আমি আকাশ-কুসুম কত কী না ভেবেছি। আমি মনে কষ্ট পাব ভেবে ও চুপ থেকেছে, আর আমি সেটাকে সম্মতি জেনে এগিয়েই গিয়েছি। পিছনে তাকাইনি। আমি জালালের জন্যে প্রয়োজনে দেশ ছেড়ে চলে যেতেও রাজি আছি বলেছি, অনেকবার। ও কেবল শুনেছে চুপ করে, কখনও মন্তব্য করেনি। আমাকে স্রেফ ব্যবহার করেছে লোকটা, কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভেবেছে।'

'তাই যদি হয়,' একটু ভেবে বলল সার্জেন্ট। 'তাহলে বলব ও খাঁটি হিরে চিনতে ভুল করেছে।'

চোখ কুঁচকে উঠল হামিদার। 'মানে?'

'মানে, আপনার মত মেয়ের ভালবাসা অর্জন করা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। যে তা না চাইতেই পায়, তার সৌভাগ্যকে আমি হিংসে করি। অমন ভালবাসা হারানোর কথা তো চিন্তাই করা যায় না।'

হেসে উঠল হামিদা। 'তার মানে আপনি পাকা জহুরী?' মাথা দোলাল। 'খুব ভালমানুষ আপনি, সব সময় আমার মন ভাল

রাখার চেষ্টা করেন।'

পিছনে কেউ একজন ধুয়ো তুলতেই ফের শুরু হয়ে গেল শ্লোগান। চোখমুখ কোঁচকাল ওরা।

'বিয়ে করেননি?'

নিজের সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রশ্নে বিব্রত হলো শহীদ। 'না।'

'কাউকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন?'

'না।'

আবার নীরব হয়ে গেল মেয়েটি। কি যেন ভাবছে। তারপর বলল, 'যদি আপনার মত একজন জীবন সঙ্গী পেতাম, নারীজন্ম সার্থক হত আমার।'

থতমত খেয়ে গেল ও। দু'গালে লালের আভা দেখা দিল। 'মানে?' কোনমতে বলল। 'আমার মধ্যে এমন কি দেখলেন...' থেমে গেল বক্তব্য শেষ করার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পেয়ে।

'একজন সত্যিকারের পুরুষকে,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল হামিদা। 'স্বামী হিসেবে মেয়েরা মনে মনে যেরকম সংযমী, সাহসী, দরদী মানুষ আশা করে, ঠিক সেরকম একজনকে।'

কথা জোগাল না মুখে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। বুকের ভেতরটা কাঁপছে ওর।

আট

বেল্টের হুকে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা টগল রোপের জোড়া দেয়া তিনশো ফুটী কয়েলটা খুলল মাসুদ রানা। এক মাথা শ্যাফটের ববিনে বেঁধে পুরোটা ভেতরে ছেড়ে দিল, অ্যাঙ্গেল-জয়েন্টে কয়েকবার বাধা পেলেও ঘুরপাক্ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত নিচে পৌঁছে গেল অন্য মাথা। সোজা পানিতে গিয়ে পড়ল।

দড়ি ধরে অনেক সহজে উঠে এল সবাই। করপোরাল সদরউদ্দিন থাকল সবার শেষে, ওঠার পথে প্রতিটা জয়েন্টে দাঁড়িয়ে হুকে বাধিয়ে আগের জয়েন্ট উপড়ে রেখে এল সে। সব গিয়ে জড়ো হয়েছে নিচে। পৌঁছেই যাতে ব্যাটারা পিছু নিতে না পারে, সেজন্যে এই ব্যবস্থা। একেবারে শেষেরটা অবশ্য ছোটানো হলো না। ইচ্ছে করেই ছোটায়নি সে—ওটা কোন অসুবিধের কারণ হবে না ওদের, তাই।

রানা ওদিকে অন্য কাজে ব্যস্ত। চোখ কুঁচকে রিভার ভ্যালির ওয়েল শ্যাফটের দিকে তাকিয়ে আছে। ভিড় পাতলা হয়ে গেছে ওখানকার, একটু যেন চঞ্চল মনে হচ্ছে ওদের। পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে মনে হয় যেন থেকে থেকে এদিকেই তাকাচ্ছে লোকগুলো। প্যান্থার ধ্বংস করার আগে একটা অন্তত দূরবীন কেন রেখে দিল না ভেবে আফসোস করল রানা। তাহলে এখন

নিশ্চিত হওয়া যেত কি চলছে ওদিকে। ওরা কি সত্যিই এদিকে তাকাচ্ছে, না রানা ভুল দেখেছে? চোরের মন পুলিস পুলিস করছে না তো অহেতুক?

যাই হোক, এখানে আর দেরি করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। লাশ দুটোর দিকে তাকাল ও। সদরউদ্দিনকে ডেকে কুয়োয় ফেলে দিতে বলল। এতে অল্প সময়ের জন্যে হলেও দ্বিধায় ফেলে দেয়া যাবে সম্ভাব্য অনুসন্ধানী দলকে। পরেরবার ওয়াকি-টকির সাড়া না পেলে ওরা আসবেই, কোন সন্দেহ নেই।

'সেটা কি ঠিক হবে?' বলল সাংবাদিক। 'গ্রামের মানুষ এই ওয়েলের পানি খায় নিশ্চই!'

'অসুবিধে নেই। লাশ কোথায় আছে খুঁজে নিতে বেশি সময় লাগবে না ওদের।'

'কিন্তু রক্ত...?'

'পানি বসে নেই,' জটলার ওপর চোখ রেখে বলল রানা। 'সরে যাবে পানির সাথে। সদরউদ্দিন, জলদি! মনে হচ্ছে একটা জীপ স্টার্ট নিয়েছে ওখানে, এদিকে আসতে পারে।'

দ্রুত কাজ সারল করপোরাল। প্রথম লাশ আছড়ে পড়তে শেষ অ্যাঙ্গেল-জয়েন্টটাও খুলে পড়ে গেল। ধুলোবালি ছড়িয়ে মাটিতে লেগে থাকা রক্তের দাগ যতদূর সম্ভব ঢেকে দিল ওরা, তারপর দ্রুত রওনা হয়ে পড়ল। রানা ঘন ঘন পিছনে তাকাচ্ছে। একটু পর ওর আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ হলো—এদিকে আসছে না জীপ, উল্টোদিকে যাচ্ছে।

আকাশে আবার মেঘের আনাগোনা শুরু হতে দেখল ওরা। অথচ মাটি তেতে আছে। অসহ্য লাগছে গরম। মাইলখানেক লেপার্ড ক্রল করে এগোল দল, তবে আগেরবারের মত ধীরে নয়,

দ্রুত। ঢুকে পড়ল পাহাড়ের ঢালের বড়সড় এক বাবলা ও ঝাউ বনে। বনটা পাতলা, তবু মাথার ওপর আড়াল পেয়ে অনেক স্বস্তিবোধ করল রানা। প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল সবাই। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে বেশ।

দুইশো গজও বোধহয় যেতে পারেনি, আচমকা জমে গেল ওরা পিছনে কট্ কট্ আওয়াজ শুনে। ঘুরে তাকাল–সেই চিনূক!

নাক নিচু করে সবেগে ছুটে আসছে গোঁয়ারের মত। দেখতে দেখতে বনের মাথা ছুঁয়ে ফেলল ওটা। পরমুহূর্তে বিকট বিস্ফোরণের সাথে দুলে উঠল মাটি। 'আড়াল নাও সবাই!' চেঁচিয়ে বলল রানা।

চাগাল। পাকিস্তান। আগের রাতের কথা।

রাতের অন্ধকারে পর্বতের এবড়োখেবড়ো গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে 'অপারেশন উদ্ধারের' চার সদস্য। টোপর পরানো মিনি টর্চলাইটের আলোয় পথ দেখে এগোচ্ছে। পথ মানে আসলে বেপথ, অন্তত ওরা যে পথে যাচ্ছে। এতই খারাপ যে চোরাচালানীরাও এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করে না। এ জন্যে এদিকে সীমান্ত রক্ষীদেরও বিশেষ তৎপরতা নেই।

গতকাল ভোর চারটে থেকে একটানা গাড়ি ছুটিয়েছে ওরা, এখানে পৌঁছেছে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। তুরবাত, পাঞ্জগুর, খারান কালাত হয়ে ডালবান্দিন্, ওখান থেকে ক্যানাল অতিক্রম করে সোজা চাগাল। পুরো রাস্তা তুফান বেগে ছুটেছে ওরা। কারণ পথ অনেক–প্রায় তিনশো মাইল। চাগাল দর্শনীয় কিছু নয়, দূরের হাইওয়ে দিয়ে আসা-যাওয়ার পথে মানুষ তাকিয়ে দেখে, এই পর্যন্তই। বেশি শীত পড়লে, বরফ জমলে, ছবি তুলতে আসে

মানুষ, নইলে এমনিতে এটা চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য।

সীমান্ত রক্ষীদের টহলও এদিকে কম। ওরা ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চল নিয়ে যত ব্যস্ত, ইরান বা আফগানিস্তানকে নিয়ে তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়।

থেমে থেমে উঠে যাচ্ছে দলটা। মাঝেমধ্যে জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে ডিটেইলড্ রুট ম্যাপে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ক্যাপ্টেন কামাল। খনিমুখ যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে প্রত্যেকে। আকাশে মেঘ জমেছে প্রচুর, আড়ালে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জোর ঝড়বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে হেঁটে দুটোর সময় জায়গামত পৌঁছল ওরা, বসে পড়ল আড়াল দেখে। আরও বেশি সতর্ক হয়ে উঠল। একশো গজ সামনে গুহামুখ, ঢুকে পড়লেই হয়, কিন্তু নড়ল না ক্যাপ্টেন। সময় হলে সঙ্কেত দেয়া হবে, তখন এগোবে। টেনশনে রাতের খাওয়া মিস হয়ে গেছে, সুযোগ পেয়ে সে কাজ সেরে নিল এখানে। হাল্কা খেল সবাই। আরও ঘণ্টা দুয়েক হাঁটতে হবে, কাজেই বেশি খাওয়ার উপায় নেই। ওদিকে আসলে আগ্রহও দেখা গেল না কারও।

তিনটের সময় এল সঙ্কেত। লাল হুড পরানো একটা টর্চলাইট টিপ্ টিপ্ করে তিনবার জ্বলে নিভে গেল। তাকিয়ে থাকল ওরা অন্ধকারের দিকে–কোর্স এখনও পুরো হয়নি। ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় আবার তিনবার জ্বলল ওটা, আরও ত্রিশ সেকেন্ড পর আবার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাল্টা সঙ্কেত দিল ক্যাপ্টেন। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দল নিয়ে।

দুটো ছায়া নড়ে উঠল সামনে। একজন করাচীর আরেক বিসিআই এজেন্ট, মুর্তজা। অন্যজন তার স্থানীয় কন্ট্যাক্ট। কাছাকাছি যেতে একটা ছায়া পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, 'পথ

হারিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' কামাল জবাব দিল। 'চমন ক্যানালে মাছ ধরতে যেতে চাই, কিন্তু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমার সাথে আসুন, চিনিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি কামাল।'

'মুর্তজা,' হাত বাড়াল লোকটা। অন্যজনের সাথে আনুষ্ঠানিক আলাপ করিয়ে দেয়ার গরজ দেখাল না। তবে সে যে হায়দার বালুচ, এবং খানদানী চোরাচালানী, তা জানাল। বাড়ি তার কোয়েটা। নিজে পাচার করে হোসিয়ারির সুতো, কেনে ভেড়ার চামড়া। রমরমা ব্যবসা। চেহারা, পোশাক, আর ঘড়ি-আংটির বাহার দেখে তা ওরাও বুঝল। এ অঞ্চলের সীমান্ত রক্ষীরা নাকি ভুলেও এর কাজে নাক গলায় না, সে এ-দেশী হোক, কি আফগান। সবার সাথে সমান খাতির।

অবশ্য এ ধরনের ছোটখাট কাজ করে না লোকটা, আজই প্রথম। কারণ বিসিআইয়ের টোপ যথেষ্ট 'হ্যান্ডসাম' মনে হয়েছে তার। শুধু গেলাম আর এলাম, তাতেই যদি এত টাকা আসে, তো করবে না কোন্ গাধা? প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে একটু দ্বিধায় অবশ্য পড়েছিল হায়দার বালুচ, কোথাকার কারা না কারা, কি ফ্যাসাদ বাধায় ও দেশে গিয়ে কে জানে? পরে ভাবল, ফ্যাসাদ যদি বাধায়, বাধাবে আফগানিস্তানে। তার কি? বিপদ বুঝলে এদের সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করলেই তো চুকে গেল ল্যাঠা। অতএব বোকামি করেনি হায়দার বালুচ।

আগে আগে চলল সে পথ দেখিয়ে। পাহাড়ী ছাগলের মত হাঁটছে মানুষটা, একদম সহজ-সাবলীলভাবে। যেন চাগাল আর মসৃণ হাইওয়েতে কোন ফারাক নেই। একটু পর খনির শ্যাফটে ঢুকে পড়ল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি মার্কা বোটকা এক গন্ধে

পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল কামালের।

ঘাম, তামাক, পাথুরে মাটি আর মরে পচে ওঠা ইঁদুরের দুর্গন্ধ প্রবল। তার সাথে পেশাবের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ মিলে স্রেফ নরক বানিয়ে রেখেছে ভেতরটাকে। অসহ্য! কিন্তু ওদের যত অসুবিধেই হোক, বালুচের বাচ্চার কিছুই হচ্ছে না। একবারও নাক কোঁচকাতে বা অভিযোগ জানাতে দেখা গেল না ব্যাটাকে। এই জন্যেই বোধহয় বলা হয়েছে 'শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাইবেন তাহাই সয়', কামাল ভাবল। ভুলে থাকার চেষ্টা করল ব্যাপারটা, অন্যদেরও সেই পরামর্শ দিল।

অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য ফল হলো। নাক আর মস্তিষ্ক সয়ে নিল অমন বদ গন্ধ। প্রথমটা মন দিল সিগারেটের গন্ধে, পরেরটা মিশনের চিন্তায়।

আলোয় পথ দেখে আঁকাবাঁকা গুহা ধরে চলেছে ছয়জনের দলটা। কোথাও ঝুঁকে হাঁটছে, কোথাও সোজা হয়ে। যত ভেতরে ঢুকছে, তত বাড়ছে গুমোট গরম, দরদর করে ঘামছে সবাই। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব বলে জোরে জোরে দম নিতে হচ্ছে। সমস্যাগুলো একটু একটু করে বেড়ে চলল, গরম আর নিঃশ্বাসে কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠল এক সময়। পিঠের বোঝার জন্যে কষ্ট আরও বেশি হচ্ছে। তবু সব সহ্য করে এগিয়ে চলল কামাল বাহিনী।

এক সময় আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে শুরু করল পরিস্থিতি, ধীরে ধীরে। কখন পুরো স্বাভাবিক হলো, টেরই পেল না কেউ। সাড়ে চারটায় শ্যাফটের অন্য মাথায় পৌঁছল ওরা। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মাতম চলছে। সেদিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ক্যাপ্টেন কামাল। সামনে গাছপালার ভেতর দিয়ে আধ মাইল গেলেই চমন ক্যানাল। তার ওপারে

মেইনল্যান্ড।

ক্যানাল না বলে ওটাকে নদী বলাই ভাল। অনেক লম্বা-চওড়া। আফগানিস্তান থেকে কোয়েটার মাসটাং হয়ে পাকিস্তানে গিয়ে পড়েছে, ওখান থেকে ঘুরেফিরে ইরান বর্ডারে। আসার পথে ডালবান্দিনে এই ক্যানালই পার হয়েছে ওরা।

বোঝা পাশে রেখে বসে পড়ল সবাই, পা মেলে দিয়ে বোঝায় ঠেস্ দিয়ে বসল। হায়দার বালুচ একটু দূরে বসে সিগারেট ধরিয়ে গুন্‌গুন্ গান ধরল। বেশ খোশ মেজাজে আছে ব্যাটা। মুর্তজা বসল কামালের কাছে। ক্লান্তি আর ঠাণ্ডা বাতাসের পরশে কথা বলতে বলতে কখন চোখ লেগে এসেছিল জানে না ক্যাপ্টেন, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল সে। ঝড় থেমে গেছে।

বৃষ্টি অল্প অল্প আছে, নইলে একদম শান্ত পরিবেশ। অদ্ভুত রকম শান্ত। চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল সে—প্রায় পাঁচটা। আশেপাশে তাকাল, সবাই ঘুমে বিভোর। শীতে গুটিসুটি মেরে ব্যাকপ্যাকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। বাইরে ফুটি ফুটি করছে দিনের আলো, কিন্তু ঘন মেঘের জন্যে সুবিধে করতে পারছে না। মেঘের ভেতরে এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। বাতাস প্রায় স্থির।

মুর্তজাকে ডেকে জাগাল কামাল, তারপর অন্যদেরকেও। নীরবে শ্যাফট থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। বনের ভেতরে বাড়িঘর আছে প্রচুর। বেশিরভাগই চোরাচালানী এসবের বাসিন্দারা, কিছু জেলেও আছে। আর আছে পেশাদার রাখাল ও চাষী। একজন-দু'জন করে ঘর ছাড়তে শুরু করেছে তারা। কেউ কেউ ওদের দেখল তাকিয়ে, কিন্তু চোখে বিন্দুমাত্র কৌতূহল ফুটল না। নিত্য নতুন চোরাচালানী দেখে দেখে অভ্যস্ত, বোঝাই যায়।

তবে হায়দার বালুচকে শুধু দেখলই না, শ্রদ্ধার সাথে সালামও

করল প্রত্যেকে। তাদের সালামের জবাবে মাথা দোলাতে দোলাতে গজেন্দ্র চালে নামতে থাকল লোকটা, দুয়েকজনকে পাল্টা কুশলও জিজ্ঞেস করল। মোমের মত গলে পড়ার দশা হলো মানুষগুলোর। বালুচের এই জনপ্রিয়তা হারামের পয়সার জোরে অর্জিত হলেও রীতিমত ঈর্ষণীয়, ভাবল কামাল। ভালই জমিয়ে নিয়েছে।

ক্যানালের তীরে বেশ বড় ঘাট। নৌকা, স্পীডবোট, ছোট ফিশিং ট্রলার, সব আছে ওখানে। পাঁচ মিনিট পর ওখান থেকে দুটো স্পীডবোট রওনা হয়ে গেল ওপারে মেইনল্যান্ডের উদ্দেশে।

গ্রেনেড!

গ্রেনেড ছুঁড়ছে চিনূক। কিন্তু প্রথমটা তাড়াহুড়োয় মিস্ করেছে, শুয়ে পড়ে অথবা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে ওরা। আচমকা হামলায় ঘাবড়ে গেছে যূথী, প্রাণভয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

'স্মোক গ্রেনেড মারো!' রোটরের জোর আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল মাসুদ রানার কণ্ঠ। 'স্মোক গ্রেনেড! জলদি...!'

ওর নির্দেশ পুরো হলো না, তার আগেই অস্পষ্ট একটা টং আওয়াজ উঠল কাছে, পরমুহূর্তে আরেকটা। দেখতে দেখতে ঘন সবুজ ধোঁয়ায় চারদিক ভরে উঠল, দুটো ব্যাঙের ছাতার আকার নিয়ে ওপরদিকে উঠে যেতে চাইছে, কিন্তু রোটরের সৃষ্ট ঝোড়ো বাতাসের জন্যে পারছে না। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আওয়াজ শুনে বোঝা যায় অনেক কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু উঁকি দিয়েও ওটাকে দেখতে পেল না রানা।

ব্যস্ত হাতে লঞ্চারে ফিন গ্রেনেড লোড করল, মোটা কাণ্ডের এক ঝাউ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। ঠিক তখনই পড়ল

দ্বিতীয় গ্রেনেড। পরমুহূর্তে চতুর্দিক কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল একটা হেভি মেশিনগান। ওটার কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল সবার। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে আবার উঁকি দিল রানা, কিন্তু সবুজ ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখল না। ওপরে উঠতে না পেরে ছেঁড়া মেঘের মত ওদেরকেই ঘিরে পাক্ খাচ্ছে।

বুমেরাং হয়ে গেছে।

লঞ্চার তুলে ট্রিগার টেনে দিল রানা, কিছুই হলো না। এমনিতে আন্দাজে ছুঁড়েছে ও, তারওপর এক মুহূর্ত আগেই লেজ ঘুরিয়ে জায়গা থেকে সরে গেছে চিনূক। সোজা উত্থানের শীর্ষে উঠে রংধনুর মত বাঁক নিয়ে ক্রমে দূরে সরে গেল গ্রেনেড। যূথী তখনও সমানে চ্যাচাচ্ছে, ওর গায়ে গুলি লেগেছে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা।

কিন্তু এখন দেখার সময় নেই, ব্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় গ্রেনেড লোড করল ও লাঞ্চারে। একটু বিরতি দিল মেশিনগান, কপ্টার জায়গা ছেড়ে আরও কিছুটা সরে গেল। বাতাসে ডালপালা ভীষণভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। তার মুহূর্তখানেক আগে জাফরের ক্ষীণ চিৎকার শোনা গেল, 'ট্রুপার ড্রপ্ করছে!'

প্রমাদ গুণল রানা। মেশিনগানের গুলির তোড়ে জায়গায় বসে থাকতে ওদের বাধ্য করে এই ফাঁকে সৈন্য নামাচ্ছে চিনূক। সেটাই অবশ্য হওয়ার কথা। ব্যস্ত হয়ে উঠল ও কিছু একটা করার জন্যে। গুলির প্রথম তোড় থামার সঙ্গে সঙ্গে আড়াল ছেড়ে ছুটল কাছের আরেক গাছের দিকে। ওরই মধ্যে চোখের কোণ দিয়ে পাঁচ হাতের মধ্যে ডন ও যূথীকে উট পাখির মত মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখল রানা।

'নড়বেন না জায়গা ছেড়ে!' দৌড়ের ফাঁকে ওদের সতর্ক করল রানা, পরের পশলা শুরু হওয়ার আগে লম্বা তিন লাফে আরেক গাছের আড়ালে পৌঁছে গেল। একই সময় কাছেই কোথাও পাল্টা গর্জন ছেড়ে উঠল একটা হেকলার অ্যান্ড কচ। ওটা সদরউদ্দিন। হাঁটু গেড়ে গুলি করছে সে। অন্যদেরও তার কাছেপিঠে দেখা গেল। পাত্‌লা ধোঁয়ার মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মেরে সামনে দেখার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ওরা নয়, রানাই আগে দেখল প্রথম ট্রুপারকে। মনে হলো যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে মানুষটা। সদরউদ্দিনের কয়েক গজ দূরে বসে থাকা হেকমত আলির দিকে অস্ত্র তুলছে পিছন থেকে। দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে তার পায়ের কাঁচা ক্ষত থেকে নতুন করে রক্তপাত শুরু হয়েছে, ব্যান্ডেজ ভিজে উঠেছে।

সতর্ক করার সময় নেই, দ্রুত লাঞ্চার তুলেই ট্রিগার টিপে দিল রানা। থপ্ করে লোকটার বুকে আছড়ে পড়ল ফিন গ্রেনেড। ধাক্কার চোটে ঝাঁকি খেয়ে পিছনে হেলে পড়ল সে, কারবাইন ধরা হাত ইঞ্চিখানেক ওপরে উঠল, তারপর বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। চোখের সামনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল মানুষটা। চমকে উঠে ঘুরে তাকাল সবাই। পরিস্থিতি ভুলে চোখ বড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল হেকমত, জাহাঙ্গীরের ধমক খেয়ে বসে পড়ল।

মেশিনগান বিরতি দিয়েছে দেখে চেঁচিয়ে বলল রানা, 'কতজন নেমেছে?'

'পাঁচজনকে দেখেছি,' জাফর জবাব দিল।

'আরও চারজন আছে তাহলে। সাবধান!' বলেই গুলির আওয়াজ শুনে ঝপ্ করে মাথা নামিয়ে নিল, একই মুহূর্তে ঠক্ ঠক্ করে অসংখ্য বুলেট আছড়ে পড়ল গাছের গুঁড়িতে, ওর মাথার

বড়জোর তিন ইঞ্চি ওপরে। পর পর আরও দুটো গ্রেনেড পড়ল ওপর থেকে, দুলে উঠল গোটা বন। সামলে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, দেখতে পেল না কাউকে। তার মানে আড়াল নিয়েছে ট্রুপারি।

লঞ্চারে শেষ গ্রেনেড ভরে নিল ও ব্যস্ত হাতে, তারপর ওটা পাশে রেখে কাঁধ থেকে কারবাইন নামাল। গুলি যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে চোখ নেচে বেড়াচ্ছে। ওটাকে ঠাণ্ডা করা না গেলে বড়রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে।

চিনূকের মেশিনগান থেমে গেল। উঁকি দিল রানা, এবং দেখতে পেল ওটাকে। পিছিয়ে গিয়ে শ'দেড়েক গজ দূরে স্থির হয়ে ভাসছে। নিচ থেকে বাধা আসছে না দেখে ফলাফল বোঝার চেষ্টা করছে বোধহয়। পাইলটের পাশে এক যুবককে দেখতে পেল রানা, ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হাত নেড়ে কি যেন বলছে পাইলটকে। পর পর দুই গুলির শব্দে মনোযোগ ছুটে গেল রানার, নজর ডানে ঘোরাতে এক ট্রুপারের ওপর চোখ পড়ল। দুই হাতে রক্তে ভেসে যাওয়া বুক চেপে ধরে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে।

সদরউদ্দিনকে হাসতে দেখল রানা, তার মানে কাজটা ওরই। 'আমাকে কাভার দাও সবাই!' বলেই এঁকেবেঁকে, গাছের আড়ালে আড়ালে চিনূকের কাছে যাওয়ার জন্যে দৌড় শুরু করল ও। পিছনে ছয়টা হেকলার অ্যান্ড কচ কারবাইন থেমে থেমে গর্জে চলেছে বাকি তিন ট্রুপার যাতে মাথা তুলতে না পারে, সেই জন্যে।

এক হাতে কারবাইন, অন্য হাতে গ্রেনেড লাঞ্চার ঝুলিয়ে শিম্পাঞ্জির মত ছুটছে রানা। গ্রেনেড আর একটাই আছে, ওটা মিস্ করতে চায় না। বিনা বাধায় পঞ্চাশ গজমত এগিয়ে গেল ও,

লঞ্চার তুলল কারবাইন ফেলে। ট্রিগার টানতে যাবে, এই সময় আচমকা উঠে যেতে শুরু করল চিনূক।

বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় নাচানাচি বন্ধ হয়ে গেল গাছের, রানার দৃষ্টিপথ ঢাকা পড়ে গেল। লঞ্চার নামিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা ব্যাপার বুঝতে না পেরে। কিছুটা উঠেই সোজা দক্ষিণে দৌড় লাগিয়েছে তখন চিনূক।

ক্যাপ্টেন কামালের দিকে ঘুরে তাকাল সার্জেন্ট কবির। ক্যানালের এপারে, লোকালয় থেকে দূরের ছোট এক পাহাড়ের ওপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছে ওরা চারজন। থান্ডারবোল্ট টীমের দেরি দেখে প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন। রাত থাকতে পৌঁছার কথা ওদের, অথচ দুপুর হতে চলেছে এখনও দেখা নেই।

কামাল উপুড় হয়ে শুয়ে দূরবীন দিয়ে উত্তরের এক ঢালের দিকে তাকিয়ে আছে। জায়গাটা মাইল দুয়েক দূরে। এমনি এমনি নয়, একটু আগে মনে হলো যেন ওদিকে কিছু লোকের নড়াচড়া দেখেছে সে, তাই। ওদিকে খেত বা বাগান কিছু নেই, শুধুই পাহাড়ী বন। ওখানে ওরা তাহলে কারা? নাকি ভুল দেখেছে সে?

'স্যার, কয় ঘণ্টা ওভারডিউ হলো?' জানতে চাইল কবির।

'প্রায় চার ঘণ্টা।'

'তাহলে হয়তো বড় কোন বিপদে পড়েছে টীম,' বলে কোলের ওপর রাখা তেল চকচকে কারবাইনে হাত বোলাল সে। যেন ওতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

করপোরাল আহসান হাবিব পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'অথবা হয়তো গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, বা ট্রান্সমিটারে কোন সমস্যা...'

'প্রথমটা হতে পারে,' হাবিব বলল। 'পরেরটা অসম্ভব।

আলাল যেখানে আছে, সেখানে ট্রান্সমিশনের সমস্যা পয়দাই হতে পারে না।'

হঠাৎ করে লাফ দিয়ে উঠে বসার আয়োজন করল ক্যাপ্টেন। 'হোয়াও! একটা চপার!' উত্তেজনায় চোখের সাথে ঠেসে ধরেছে বিনকিউলার।

'অ্যাঁ, কোথায়?'

হাত তুলে জায়গাটা দেখাল সে। 'ওই যে, বনের মধ্যে...গড! সবুজ ধোঁয়া। তার মানে মাসুদ ভাইদের...'

অন্যদের দূরবীনের দরকার হলো না। জায়গাটা বেশি দূরে নয়, তাছাড়া ওরা উঁচুতে রয়েছে, কাজেই খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে।

কামাল ভাবছে একটু আগে তাহলে ওদেরকেই দেখেছে সে। নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু পায়ে হেঁটে কেন ওরা? পিঙ্ক প্যান্থার কোথায়? ক্যানালের তীরে পৌঁছে না ওগুলোর ব্যবস্থা করার কথা ছিল?

দূরবীন থেকে চোখ না সরিয়ে উঠে বসল সে। 'কঠিন সমস্যা হয়ে গেছে ওদিকে,' বলল সবার উদ্দেশে। 'মাসুদ ভাইদের কোণঠাসা করে ফেলেছে ব্যাটারা। গাড়ি নেই, হেঁটে আসছিল দল...' থেমে গেল। পরক্ষণে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'ট্রুপার! শালারা ট্রুপার নামাচ্ছে!'

কেউ কোন মন্তব্য করল না, প্রশ্নও না। কারণ ওরা সবই দেখতে পাচ্ছে। অ্যাবসেইল রোপ বেয়ে বড় গুবরে পোকার মত সাইজের সৈন্য নামছে কপ্টার থেকে। এখান থেকে দড়ি দেখা যাচ্ছে না অবশ্য, মনে হচ্ছে যেন বাতাস ধরে ধরে নামছে ব্যাটারা সরসর করে। নিচে সবুজ ধোঁয়ায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। রোটরের বাতাসে ক্রমে আরও ছড়াচ্ছে।

'ছয় ট্রুপার নেমেছে!' বলল কামাল। দ্রুত এদিক-ওদিক

তাকাল। ওদের ডানদিকে, দূরে একটা পাহাড়ী রাস্তা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে। ওদিকটা ফাঁকা। আর সবদিকও তাই, কোথাও মানুষের চিহ্নও নেই। পিছনে আছে, ক্যানালের দিকে। তবে ঝোপের আড়াল আছে বলে ওদিক থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওদের। এখানে থানা গেড়ে বসার সময়ও দেখেনি, কারণ তখনও যথেষ্ট আঁধার ছিল।

দ্রুত কিছু ভাবল ক্যাপ্টেন। থান্ডারবোল্টের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যদিও এমন কিছুর নির্দেশ নেই। কথা ছিল অন্ধকার থাকতে পৌঁছবে টীম, তখন প্রয়োজনে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কমান্ডোদের সরে পড়তে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু যে জন্যেই হোক, পরিস্থিতি এখন অন্যরকম।

গাড়ি নেই, ঘেরাওর মধ্যে পড়ে গেছে টীম। অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, এরকম জরুরী মুহূর্তে দূরে বসে তামাশা দেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাছাড়া সবকিছুই নির্দেশ মত চলতে হবে, এমন কোন নির্দেশও তো নেই। কাজেই উঠে পড়ল সে। 'কুইক! রেডি হও সবাই, আমরা যাচ্ছি ওদিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করতে লেগে পড়ল সঙ্গীরা। যে যার বোঝা কাঁধে ঝুলিয়ে এগোতে যাবে, এমনসময় উঠে পড়ল কপ্টার। হঠাৎ করে এদিকেই ছুটে আসতে শুরু করল।

'দাঁড়াও! ওটা এদিকে আসছে। জলদি কাভার নাও, জলদি!'

ঝোপের মধ্যে শুয়ে ওটাকে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখল সবাই। ওদের পাহাড় টপ্‌কে পাঁচ-ছয়শো গজ গিয়ে থেমে পড়ল শূন্যে। তোড়জোড় দেখে মনে হলো ওখানেও ট্রুপার ড্রপ্ করতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই! পিছনের স্লাইডিং ডোর খুলে গেল; সাপের মত দোল খেয়ে নেমে এল দীর্ঘ অ্যাবসেইল রোপ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো দেড় ডজন সৈন্য নামিয়ে ফের উত্তরে রওনা

হলো চিনূক।

বোকার মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল 'উদ্ধার' মিশনের চার সদস্য। ট্রুপাররা তখন নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিতে ব্যস্ত। বনের ফাঁদ থেকে শত্রু যদি কোনমতে পালিয়ে আসতে পারে, এখানে ঠেকানো হবে।

কি করা যায় ভাবছে কামাল, তখনই হঠাৎ খড়মড় করে উঠল তার পকেটফোনের ইয়ারপীস। কাছেই ক্ল্যানসম্যান রেডিও সেটের ওপর ছিল ওটা, তুলে নিল সে থাবা দিয়ে।

'থান্ডারবোল্ট টু স্যালভেজ, ডু ইউ রীড? ওভার।'

'মাসুদ ভাই?' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'আপনি?'

চাপা হাসি শোনা গেল ওর। 'কি হলো, ভয় পেলে নাকি? সরি। তোমার সেট অন্ রেখেছ বলে ধন্যবাদ। আমাদের দুটোই শেষ। তোমরা কতদূরে? ওভার।'

'আপনাদের খুব কাছে। এখান থেকে আপনাদের পজিশন দেখতে পাচ্ছি আমরা খালি চোখেই। ওভার।'

'কী আশ্চর্য! ওরা আমাদের ধরে ঝোলায় পোরার ব্যবস্থা করছে আর তোমরা বসে বসে তাই দেখছ?'

এরমধ্যেও মানুষটা ঠাট্টা করছে দেখে ভারি অবাক হলো ক্যাপ্টেন।

'তোমার গলা এত আস্তে শোনাচ্ছে কেন? ওভার।'

'এইমাত্র চপারটা এদিকে ট্রুপার ড্রপ করে গেছে, এই জন্যে। আপনাদের ওদিকেও তো ছয়জন নেমেছে। ওভার!'

'হ্যাঁ, তিনজন গেছে। বাকিগুলোকে খুঁজছি। ওদিকে কতজন নেমেছে? ওভার।'

'দেড় ডজন। ওভার।' চপার থামছে না, দেখল কামাল, বন ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে।

'পজিশন? ওভার।'

'ক্যানালের মাইলখানেক এপাশে। হাইগ্রাউন্ডে পজিশন নিচ্ছে, ঠিক আমাদের লাইন অভ অ্যাপ্রোচ বরাবর। ওভার।'

'মুশকিলে পড়া গেল!' নিজের মনে বলল রানা। 'একজন মেয়ে, দু'জন আহত, কি করে...'

'মাসুদ ভাই, দলের একজন কমে গেছে শুনেছি। কে সে? ওভার।'

'একজন ছিল, এখন দু'জন হয়েছে। সার্জেন্ট শহীদ আর করপোরাল ফয়েজ। ওভার।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ধাক্কাটা সামাল দিল ক্যাপ্টেন কামাল। 'শহীদ! ফয়েজ!! বিশ্বাস হয় না!' হেডসেটে পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনে সচকিত হলো। 'কি হলো, মাসুদ ভাই? ওভার।'

'আরেকটাকে নিয়েছে আলাল।' কাজের কথা পাড়ল রানা। ঠিক হলো, আফগানদের বেষ্টনীর বাইরে দিয়ে ঘুরে ক্যানালের দিকে এগোবে থান্ডারবোল্ট দল, রানা ও সদরউদ্দিন ছাড়া। ওরা কামাল বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে শত্রুকে জায়গায় বসে থাকতে বাধ্য করবে।

দলের অন্যরা ক্যানালে পৌঁছে গেছে বুঝলে রানা ও সদরউদ্দিন মরিয়া লড়াই করে পথ বের করে ভাগবে। তারপর বোট নিয়ে ক্যানাল ধরে সোজা পাকিস্তান।

'আপনার গুলির স্টক কেমন? ওভার।'

'খুব খারাপ,' রানা বলল। 'প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ওভার।'

'ঠিক আছে। আমাদের এখানে চলে আসুন বাকি দুটোকে শেষ করে। তারপর দেখা যাবে। ওভার।'

দুশ্চিন্তায় পড়েছে সার্জেন্ট শহীদ। পথে একবার এঞ্জিনের সমস্যা

মেটাতে, আরেকবার উত্তপ্ত হয়ে ওটা রেডিয়েটরকে পানি খাইয়ে শান্ত করতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। পিছিয়ে পড়েছে সে।

অন্ধকার থাকতে জায়গামত পৌঁছার কথা, হলো না। ওর ধারণা বহু আগেই পগার পার হয়ে গেছে থান্ডারবোল্ট। অর্থাৎ যেতে হলে এখন তাকে নিজের ব্যবস্থায় যেতে হবে। সেটা কি করে সম্ভব করবে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

ওদিকে নতুন 'রিক্রুটরা' কেউ কেউ সন্দেহ করতে শুরু করেছে সার্জেন্টকে। যুদ্ধের ডামাডোল বাজছে ইরানের সাথে, অথচ লোকটা এদের নিয়ে এসেছে পাকিস্তানের গায়ের ওপর, এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না ওরা। সে অবশ্য বলেছে এদিকে কোথাও একদল ইরানী গুপ্তচর আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর আছে তার কাছে। এই কারণেই এখনও মুখ বুজে আছে ছেলেরা।

এছাড়া হামিদা গুলিস্তানী নিজের তো বটেই, শহীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে খুব উদ্বিগ্ন। কি হয় কি হয় করে অস্থির।

পাহাড়ী রাস্তায় দোল খেতে খেতে ছুটে চলেছে লরি। আর দু'মাইল যেতে পারলেই ক্যানাল। একটা বাঁক ঘুরল শহীদ, সামনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ কুঁচকে উঠল দূরে একটা কপ্টার দেখে। কি ওটা! ভেতরে ভেতরে জোর এক ঝাঁকি খেল সে, চিনূক না? ট্রান্সপোর্ট চপার! কিন্তু ওটা কি করছে ক্যানালের কাছে? চমকে উঠল, স্লাইডিং ডোর খোলা কেন ওটার! ট্রুপার ড্রপ্ করে ফিরছে নাকি?

গ্যাস পেডালে চাপ বাড়িয়ে দিল সে আপনাআপনি। বুকের ভেতরে অদ্ভুত আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। মন বলছে ওটার উপস্থিতি আর স্লাইডিং ডোরের খোলা থাকার কারণ বুঝতে পেরেছে সে। আশায় মন দুলে উঠল।

*

কয়েক মাইল উত্তরের এক ফার্মহাউসে ল্যান্ড করল চিনূক। ভোরে এখানেই ওটাকে দেখেছে রানা। রোটর থামার অপেক্ষায় থাকার ধৈর্য নেই কর্নেল মুরাদের এইডের, তীব্র ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেই বেরিয়ে এল সে। নুয়ে পড়ে একদৌড়ে নিচু এক বার্নের দিকে এগোল।

ভেতরে চেয়ারে বসে চোখ বুজে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে কর্নেল, হাতে কেন্ট পুড়ছে। 'বলো।'

হড়বড় করে রিপোর্ট করতে শুরু করল যুবক। তার বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল মুরাদ। কাপে শেষ চুমুক দিল। 'অপেক্ষা করো। আমি যাব।'

নয়

সদরউদ্দিন শুরু করল ব্যাপারটা। দুটো গুলি করল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অন্য পক্ষ। প্রথমে একটা-দুটো কারবাইন সাড়া দিল, তারপর একযোগে সব কটা। এতগুলো অটোম্যাটিকের টানা হুঙ্কারে ভেঙে খান্ খান হয়ে গেল নিস্তব্ধ পরিবেশ। বুলেটের ধাক্কায় ধুলোবালি আর মাটির চাপড়া উড়তে লাগল এখানে-সেখানে।

আফগানদের বেশিরভাগ বুলেটই একদম আশেপাশে পড়ছে

ওদের। মাথার ওপর দিয়ে ক্ষিপ্ত বোলতার গুঞ্জন তুলে ছুটে যাচ্ছে। এক ট্রুপারকে ঝোপের ফাঁক থেকে উঁকি দিতে দেখে সই করে গুলি ছুঁড়ল রানা, কিন্তু লাগাতে ব্যর্থ হলো। হলিউডি স্টান্টম্যানদের মত দর্শনীয় এক ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

'বাহ্, দারুণ তো!' হেসে উঠল ক্যাপ্টেন কামাল। 'ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখা যেত ব্যাটার!'

পাল্টা রসিকতা করল না কেউ। এর মধ্যে আফগানদের গুলির বেগ আরও অনেকগুণ বেড়ে গেছে, মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। তা নিয়ে অবশ্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই রানার, বরং অগ্রগামী দলের ওপর থেকে যে লোকগুলোর দৃষ্টি সরিয়ে রাখা গেছে, তাতেই সন্তুষ্ট। দেড় ঘণ্টা আগে ঘুরপথে ক্যানালের দিকে রওনা হয়ে গেছে ওরা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে। এতক্ষণে নিশ্চই যথেষ্ট দূরে সরে গেছে। এদিকে বাকি তিন ট্রুপারের দুটোকে শেষ করতে পেরেছিল ওরা শেষ পর্যন্ত, অন্যটা বিপদ বুঝে পালিয়ে গেছে।

টানা দশ মিনিট পর ভাটা পড়ল গুলির তোড়ে। তারপর থেমে গেল। আড়াল ছেড়ে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল ওরা কাজ কতখানি হয়েছে বোঝার জন্যে। এ তরফের সাড়া নেই দেখে একজন-দু'জন বেরিয়ে এল, তবে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না। তিন সেকেন্ড ব্রাশ ফায়ার করে আবার ওদের শেল্টার নিতে বাধ্য করল রানা।

ফের শুরু হয়ে গেল। এবার আর থামাথামির লক্ষণ নেই, চলছে তো চলছেই।

'চলুক আরও কিছুক্ষণ,' বলল রানা। 'তারপর...!'

পনেরো মিনিট পর ওর মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে, এবার শুরু করা যেতে পারে। ইঙ্গিত দিল কামালকে। 'শুরু করো।'

নিজের ভারী ব্যাকপ্যাক থেকে খুদে লাইটওয়েট শোল্ডারবোর্ন মর্টার লঞ্চার বের করে তৈরি হয়ে নিল সে। ৬০ এমএম হচকিস-ব্র্যান্ডট কমান্ডো মর্টার ওটা, নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানতে অদ্বিতীয়। পরপর তিনটে ফসফরাস বোমা ছুঁড়ল ক্যাপ্টেন শত্রু অবস্থান সই করে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘন, দুর্ভেদ্য ধোঁয়ার দেয়াল মাথা তুলল দুই দলের মাঝখানে, পরস্পরের সম্পূর্ণ চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা। পরক্ষণে হাই-এক্সপ্লোসিভ বোমা ডিসচার্জ করল মর্টার।

তির্যক রেখা ধরে সোজা ধোঁয়ার ঠিক ওপাশে গিয়ে পড়ল ওগুলো, শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ, তার সাথে বিদ্যুৎ চমকের মত ঘন ঘন তীব্র লালচে ফ্ল্যাশ।

'চলো এবার।'

উঠে পড়ল সবাই, কোনাকুনি দৌড়ে নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। নিচে এসে ফের দুটো করে ফসফরাস ও এক্সপ্লোসিভ বোমা ছুঁড়ল কামাল, তারপর আবার দৌড়। ট্রুপারদের বাঁ দিক দিয়ে কেটে পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, কয়েক গজ সামনে তীব্র আলোর ঝল্‌কানির সাথে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ওরা। ধুলো গলায় ঢুকে যেতে কেশে উঠল সদরউদ্দিন।

রানা গুঙিয়ে উঠল কপাল চেপে ধরে। দরদর করে রক্ত ঝরছে কপাল থেকে, মাথা ঘুরছে। 'মর্টার ছুঁড়ছে ওরা!'

'তাই তো দেখছি,' শোয়া অবস্থাতেই ব্যস্ত হয়ে মর্টারে আরেকটা স্মোক শেল ভরল ক্যাপ্টেন। এক মুহূর্তও দেরি না করে ট্রিগার টানল। 'খুব লেগেছে, মাসুদ ভাই?'

'একটা স্প্লিন্টার বিঁধেছে কপালে,' সদরউদ্দিন বলল। টান মেরে তুলে এনেছে ওটা। 'মারাত্মক কিছু না।'

ওর বলা শেষ হতে না হতে পরপর আরও দুটো শেল বিস্ফোরিত হলো, এবার আগেরটার চাইতেও কাছে। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল মাটি-ধুলোবালি, মাটির বড় বড় টুকরো ছিট্‌কে উঠল শূন্যে।

'উঠে পড়ো জলদি!' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে বলল রানা। 'পরেরটা সোজা আমাদের ওপর ল্যান্ড করবে।'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল সবাই, কিন্তু ওই পর্যন্তই, আচমকা হেভি মেশিনগানের গম্ভীর হুঙ্কারে ফের শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। ওদের নাকের ফুট দুয়েক সামনে দিয়ে ঠিক যেন ড্রপ্ খেয়ে ছুটে গেল একসার বুলেট।

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সদরউদ্দিন। জানত কোন না কোন সময়ে এভাবেই শেষ হবে জীবন, আজ বুঝি সে সময় হয়েছে। মেশিনগানের জন্যে সরে যেতে পারছে না ওরা, এদিকে ধোঁয়া সরে গেলে আর অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রুর লাইন অভ ভিশন পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর একটা কি দুটো মর্টার, ফুরিয়ে যাবে অধ্যায়।

'উঠে পড়ো!' রানার চিৎকারে চোখ মেলল সে। 'উঠে পড়ো! এরমধ্যেই পালাতে হবে।'

কিছু সময়ের জন্যে বিরতি দিয়েছিল শত্রুর মেশিনগান, আবার শুরু করল বুলেট বৃষ্টি। একটু পর থেমে গেল হুঙ্কার, আর ঠিক তখনই শুরু হলো ব্যাপারটা। আফগানদের অবস্থানের পিছন থেকে একযোগে গর্জে উঠল অসংখ্য ফায়ার আর্মস।

চোখ কুঁচকে উঠল রানার—কারা ওরা? ওদিকে তো আফগানরা ছিল না! নাকি ধোঁয়ার আড়াল নিয়ে সরে নতুন অবস্থান নিয়েছে! দূরে একটা ট্রাক দেখে জীবনের আশা ছেড়ে দিল ও। নিঃসন্দেহে আরও আফগান ট্রুপার এসেছে ওটায়। তার মানে...

সদরউদ্দিন গুঙিয়ে উঠল, 'ওহ্, খোদা! আজ আর রেহাই

নেই। হারামজাদারা দলে অনেক ভারী হয়ে গেছে।'

রানার সেদিকে খেয়াল নেই। হতভম্বের মত প্রথম আফগান লাইনের দিকে তাকিয়ে ওদের মেশিনগান থেমে যাওয়ার কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। মর্টারও আর আসছে না, কেন?

'কি হলো?' প্রশ্নটা বের হলো কামালের মুখ থেকে। 'ওরা থেমে গেল কেন হঠাৎ করে?'

হাত দিয়ে সূর্য আড়াল করে কারণ বোঝার চেষ্টা করছিল রানা, আচমকা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসল। 'আরে!' চেঁচিয়ে বলল, 'পিছনের ওরা আমাদের গুলি করছে না! ওরা আফগানদের...!'

ধড়মড় করে উঠে পড়ল অন্যরা। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। প্রথমে দ্বিধার হাসি ফুটল রানার মুখে, তারপর আস্থার এবং স্বস্তির। ভুল দেখেনি ও, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজনের দলটা সত্যিই তাই করছে। পিছন থেকে আচমকা হামলা করে প্রায় অর্ধেক আফগান ট্রুপারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে এরইমধ্যে।

এ এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য! চিন্তাই করা যায় না। অথচ...! তাক্ লাগা চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা ভাষা হারিয়ে। মাথার ওপর স্মল ফায়ার আর্মস দোলাতে দোলাতে ছুটে আসছে লোকগুলো। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ছে, হতভম্ব ট্রুপারদের ওপর খানিক গুলিবৃষ্টি করে আবার এগোচ্ছে। দীর্ঘদেহী এক মোল্লা নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের। তার পাশে এক মেয়ে।

দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ট্রুপাররা। পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। দু'একজন নিতান্তই সৌভাগ্যবান ছাড়া অন্য সবাই মরল।

'ওরা বোধহয় মুজাহেদীন,' সদরউদ্দিন বলল।

মাথা দোলাল চিন্তিত রানা। 'হতে পারে।' কি ভেবে কামালের

দিকে হাত বাড়াল। 'তোমার গ্লাসটা দাও তো!'

ত্রিশ সেকেন্ড পর ভীষণ এক ঝাঁকি খেল ও। 'আরে!!! ওটা তো শহীদ, আমাদের সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ্!'

'কি বললেন!' একযোগে বলে উঠল সদরউদ্দিন ও কামাল। চোয়াল ঝুলে পড়েছে দু'জনেরই। 'কে?'

'শহীদ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। দেখায় যে ভুল হয়নি, তা ওদের নয়, নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে যেন। 'সার্জেন্ট শহীদ! হামিদা...হামিদা গুলিস্তানী!!'

'সে কি!' অনেক কষ্টে বলল করপোরাল।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েই আছে রানা। অবিশ্বাস্য, অলৌকিক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। ওরা দু'জন না হয় হলো, কিন্তু ওই লোকগুলো কারা? ওরা কেন নিজ দেশের সৈন্যদের ওপর হামলা চালাল?

বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে বাঁদরের মত এক লাফে উঠে পড়ল সদরউদ্দিন, খিঁচে দৌড় লাগাল ওদের দিকে।

লরিতে চেপে ক্যানালের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ওরা। দশমিনিটে জায়গামত পৌঁছে গেল। কৌতূহলী জনতার সামনে দিয়ে স্পীডবোটে উঠে পড়ল, দ্রুত বর্ডারের দিকে ছুটল। বিপদের আশঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি, এখনও বেশ কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে, কাজেই প্রত্যেকে সতর্ক।

যূথী-ডন ও শহীদ-হামিদাকে নিয়ে একটায় উঠেছে রানা। ক্যাপ্টেন কামাল ও সদরউদ্দিনও আছে সঙ্গে। ওদেরটা চলেছে আগে। পিছনেরটায় জাহাঙ্গীর, জাফর, আলাল ও হেকমত আলিসহ কামালের তিন সঙ্গী। প্রথমটা চালাচ্ছে সদরউদ্দিন, অন্যটা আলাল।

রানার সাথে চোখাচোখি হতে লাজুক হাসি দিল হামিদা গুলিস্তানী, শহীদের গা ঘেঁষে বসে ছিল, একটু সরে বসল। রানাও হাসল, পরক্ষণে চেহারা গম্ভীর করে সার্জেন্টের দিকে তাকাল। আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা। 'পরে সব ব্যাখ্যা করব, বস্!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে মন দিল ও। সীটের পাশে নামিয়ে রেখেছে শেষ ফিন গ্রেনেডসহ লঞ্চার,-হাতে কারবাইন।

পাশ থেকে সার্জেন্টের পাঁজরে খোঁচা লাগাল সদরউদ্দিন। 'তোমার প্রাইভেট আর্মির ব্যাপারটা কি? কোত্থেকে জোটালে ওদের?' তার সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে হেসে উঠল। 'বুঝলাম, কিন্তু আর্মির বিরুদ্ধে নামালে কি বলে?'

শ্রাগ করল শহীদ। 'সোজা। দূর থেকে কপ্টার দেখে সন্দেহ হলো তোমরা গ্যাঁড়াকলে ফেঁসেছ, তখনই ওদের সতর্ক করে দিলাম সামনে ইরানী ইনফিলট্রেটররা আছে, তৈরি হও তোমরা।'

'তারপর? আসার সময় ভাগালে কি বলে?'

হাসি ফুটল শহীদের ক্লান্ত মুখে। 'বলেছি আরও বড় এক শত্রু বাহিনীর সাথে লড়তে যাচ্ছি আমরা, তোমরা লুকিয়ে পড়ো। রাতে তোমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিয়ে আসছি আমি, তারপর...' হেসে উঠল শব্দ করে। 'উপায় ছিল না। রিইনফোর্সমেন্ট জানতে পেলে কচুকাটা করত ওদের, তাই ভাগিয়ে দিয়েছি যা-তা বলে।'

গলা খাদে নেমে গেল সদরউদ্দিনের। 'এ তোমার সঙ্গে কেন?' হামিদাকে ইঙ্গিত করল। 'কোত্থেকে জোটালে?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল সে আবার, কিন্তু সুযোগ হলো না। কামাল চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'চপার! চপার আসছে!'

দশ

ভয়ঙ্কর অশুভ চেহারার এক অপচ্ছায়ার মত ওদের মাথার ওপর দিয়ে খুব দ্রুত উড়ে গেল ওটা। অনেক নিচু দিয়ে। সেই একই চিনূক!

বোটের এঞ্জিনের জন্যে ওটার আওয়াজ প্রথমে কেউ শুনতেই পায়নি। ব্যাপার ঠিকমত বুঝে উঠতে পারার আগেই ওদের গায়ে বাতাস লাগিয়ে চলে গেল চিনূক। কামালের হাঁক শুনে মুখ তুলতেই পাইলটের পাশের লোকটার সাথে চোখাচোখি হলো রানার। আগেরজন নয়, বুঝল ও, এ অন্য। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মত বয়স, মুখটা ভারী। কে লোকটা?

'কর্নেল মুরাদ!' চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কিত সাংবাদিক। 'ওই সেই কর্নেল মুরাদ! এইবার আর রেহাই নেই!' কাঁদো কাঁদো অবস্থা হলো তার।

কেউ কথা বলল না, কাউকে কোন নির্দেশও দিতে হলো না রানার, থান্ডারবোল্ট আর স্যালভেজ মিশনের প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র তুলে তৈরি হয়ে নিল। মরতে যদি হয়ই, কর্নেলকে সঙ্গে নিয়ে মরবে। রানা থাবা দিয়ে ওর রকেট লঞ্চার তুলে নিল। অনেকটা সামনে গিয়ে ঘুরল চিনূক, তবে সোজা হলো না, কাত হয়ে থাকল। পিছনে হ্যাঁচকা টান খেয়ে খুলে গেল স্লাইডিং দরজা.

হেভি মেশিনগানের ভীতিকর ব্যারেল দেখা দিল।

এখনই শুরু হবে, ভাবছে রানা। হলোও তাই, তবে মেশিনগান নয়, অন্যকিছু। চপারের ভেতরে এক রাশ সাদা ধোঁয়া দেখা দিল, পরমুহূর্তে চোখ ধাঁধানো ঝলকের সাথে কি যেন ছুটে এসে হুশ্‌শ্‌! করে আছড়ে পড়ল দুই বোটের মাঝখানে। গোল পিলারের আকার নিয়ে খাড়া হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল পানি, তারপর বৃষ্টির মত ঝরঝর করে আছড়ে পড়ল ওদের মাথায়। গোসল করিয়ে দিল সবাইকে।

'মর্টার ছুঁড়ছে শালারা!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন।

মুহূর্তের বিরতি দিয়ে পরপর আরও দুটো শেল ছুটে এল। একটা বেরিয়ে গেল দু'নম্বর বোটের একদম পেট ঘেঁষে, অন্যটা ওদের বোটের ঠিক নাকের সামনে। ভার কম থাকলে নিঃসন্দেহে উল্টে যেত ওটা। তা হলো না বটে, তবে ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল দুই মেয়ে যাত্রী। কম গেল না সাংবাদিকও।

'এঁকেবেঁকে চলো!' দোল সামলে চিৎকার করে নির্দেশ দিল রানা। ফুল স্পীড, ফুল স্পীড!'

কর্নেল চালাকি করছে, বুঝতে পেরেছে ও, দুই বোটের গতির সাথে তাল রেখে পিছিয়ে চলেছে কপ্টার। কিন্তু ফিন গ্রেনেডের আওতায় পেতে হলে ওটাকে আরও কাছে চাই রানার। নইলে বেঘোরে মরণ আছে কপালে।

'তোমার কাছে স্মোক বম্ব আছে, কামাল?'

'একটা আছে, মাসুদ ভাই। এক্সপ্লোসিভ বম্বও আছে একটা।'

'রেডি হও! হারি আপ্‌, ম্যান!'

হেভি মেশিনগানের কান ফাটানো হুঙ্কারে ওর শেষদিকের কথা চাপা পড়ে গেল। গান ফ্ল্যাশের তীব্র ঝলক কড়া রোদের

আলোতেও পরিষ্কার দেখল ওরা। ক্যানালের উঁচু পাড়ে বাড়ি খেয়ে বিকট প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল আওয়াজটা। তবে লাগল না, সামনের পানির বুকে মালার মত অর্ধেক গোল হয়ে ঘুরে গেল প্রথম বুলেট বৃষ্টির তোড়। হুলস্থুল পড়ে গেল দুই বোটে।

প্রথম দফা বলে লক্ষ্য স্থির করে নিতে পারেনি গানার, তবে এবার পারবে, ভাবছে রানা। হয় এখনই ওদের ঠেকাতে হবে, নইলে এবারই শেষ। এক হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও, কোমরের কাছে ধরা গ্রেনেড লাঞ্চার, ওদিকে কামালও তৈরি। ফের গর্জে উঠল মেশিনগান। বো-র ওপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে রানার ডান বাহুতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগল যেন। অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

হাত থেকে লঞ্চার পড়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে ঠেকাল। গলার সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'ফায়ার নাউ!'

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে দিয়েছে ক্যাপ্টেন, শব্দ শুনতে পেল না ও, তবে কাজ দেখল। গুলির ফলাফল দেখতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিজের কাজ ভুলে গিয়েছিল বোধহয় পাইলট, বোটের সাথে তাল রেখে পিছিয়ে যাওয়ার কথা মনে ছিল না। এদিকে ওরাও ফুল স্পীড দেয়ায় মাঝের ব্যবধান বেশ খানিকটা কমে এসেছিল। সোজা পিছনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ফসফরাস বোমার শেল, পরক্ষণে ধোঁয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হলো যেন অদৃশ্য আগুন ছেঁকে ধরেছে চপারটাকে। মাতালের মত টলতে লাগল ওটা, কোনদিক যাবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন।

ভেতরে কি চলছে দেখার সুযোগ হলো না রানার, পাঁচ সেকেন্ড পর শেষ ফিন গ্রেনেডটা ছুঁড়ল ও। একই সাথে কামালও ছুঁড়ল তার শেষ এক্সপ্লোসিভ বম্ব। দেখার মত হলো দৃশ্যটা।

সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে পর পর দুটো বেদম ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল চিনূক, প্রকাণ্ড এক আগুনের গোলার মত বিস্ফোরিত হলো কান ফাটানো শব্দে। এক হাতে চোখ ঢাকল রানা আলো সহ্য করতে না পেরে, অন্য হাতে ধরা লঞ্চার ছেড়ে বসে পড়ল ধপ্ করে।

ধ্বংসস্তূপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যার যার বোটের নাক ঘুরিয়ে দিল দুই চালক। বেশ বড় জায়গা নিয়ে ঘুরে এসে আবার পাশাপাশি হলো। অনেক পিছনে, ক্যানালের দুই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা হতভম্ব আফগানদের চোখের সামনে দিয়ে ছুটে চলল।

পিছনে ঝপ্ ঝপ্ করে পানিতে পড়ছে চিনূক এবং তার আরোহীদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জ্বলছে সব দাউ দাউ করে।

ওর মধ্যে কোনটা কোনটা কর্নেল মুরাদের, বুঝতে পারল না মাসুদ রানা। গুলিবিদ্ধ ডান বাহু ধরে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে ও, চোখের সামনে দুলছে সবকিছু।

নিজেদের আর্মির টিউনিক দেখে আফগান গার্ডরা ওদের থামানোর কথা ভাবলও না পর্যন্ত। পাকিস্তানীরাও না। কারণ ওদের পোস্টের গার্ড-ইন-চার্জের সামনে বসা তখন হায়দার বালুচ। আফগানরা জানে ওগুলোয় তার 'মাল' আসছে পাচার হয়ে। জানে বটে, তবু বোট দুটোয় এত মানুষ দেখে মনে মনে চোখ কোঁচকাল ইন-চার্জ। ভাবল, ওরা কারা? 'মাল' কোথায় তাহলে?

অফিসারের জানার কথা নয়, হায়দার বালুচও মনে মনে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেদিকে। একই কথা ভাবছে সে-ও, কারা ওরা? কোন কুকর্ম ঘটিয়ে গেল আফগানিস্তানে?

বিএনএস আলমগীর।

আঁধার হয়ে আসছে দেখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় প্রায় আধমরা

অবস্থা হয়েছে কমান্ডার রেজাউল হকের। দুপুরের মধ্যে ক্যাপ্টেন কামালের যোগাযোগ করার কথা ছিল, অথচ এখনও পর্যন্ত তার সাড়া নেই। রেডিও একদম ডেড। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। দুপুরের পর থেকে সেই যে ফোরডেকে পায়চারি শুরু করেছে, এখনও চলছে তা।

অবশেষে আটটার দিকে থান্ডারবোল্টের আশা ছেড়ে দিল সে। সময় পেরিয়ে গেছে, আর দেরি করা যায় না। ঢাকাকে সতর্ক করতে হবে এখন তাকে। অপ্রিয় কাজ, কিন্তু কি করার আছে? দায়িত্ব তো পালন করতে হবে!

রেডিও রুমে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল কমান্ডার, এই সময় ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সেকেন্ড অফিসার। 'স্যার! স্যার!! ওরা...'

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল তার। 'কি হয়েছে! ওরা কি?'

'কন্ট্যাক্ট করেছে। বলেছে, "ইনকামিং"।'

লোকটাকে ধাক্কা মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিল কমান্ডার, ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ তুলে দৌড় লাগাল রেডিও রুমের উদ্দেশে। মুখে বিজয়ের হাসি।

রাত বারোটার দিকে পানিতে নামানো হলো দুই অ্যাসল্ট ক্র্যাফট। গদার রওনা হয়ে গেল ওগুলো। থান্ডারবোল্ট আর স্যালভেজ মিশনকে নিয়ে যখন ফিরল, তখন প্রায় ভোর।

সবাইকে তুলে নিয়ে আন্তর্জাতিক পানিসীমার দিকে এগোল বিএনএস আলমগীর, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পূর্ণগতিতে ছুটল বঙ্গোপসাগরের দিকে।

ভোরের আলোর আভাস সবে ফুটেছে তখন পুব আকাশে।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

তুরুপের তাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো চায় সোনার চিতাবাঘটা কিছুতেই যাতে সন্ত্রাসবাদী নিওনাজী নেতা রুডলফ ব্রিগলের হাতে না পড়ে। রুডলফ ব্রিগল চায় হিদেতোশি নাকাতার চাবির টুকরোটা।

রাহাত খান চান রানা চিতাবাঘের মূর্তিটা উদ্ধার করুক।

ব্যারোনেস জুলিগ্রাফ চায় পিতৃহত্যার বিচার।

এবং

মাসুদ রানা চায় বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ।

সুইটজারল্যান্ডের জেনেভায় পর্দা উঠল কাহিনীর।

দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।